বাহাউল্লা' ও নবযুগ

জে ই ইস্‌লেমণ্ট, এম্ বি, সি-এইচ্ বি,
এফ্ বি ই এ প্রণীত

মূল গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের জাতীয় বাহাই
আধ্যাত্মিক সভার অনুমত্যানুসারে—

আমিরুল ইসলাম কর্ত্তৃক

অনূদিত ও প্রকাশিত।

১৯৩৬

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক সভা কর্ত্তৃক
এই পুস্তকের সকল স্বত্ব রক্ষিত

মুদ্রাকর—
হার্ডিঞ্জ প্রেস, চট্টগ্রাম।

সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা		

আনন্দ-বার্ত্তা

ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা	...	১
পরিবর্ত্তমান জগৎ	...	৪
ন্যায়বিচার ও অনুকম্পার ভাস্বর সূর্য্য	...	৭
বাহাউল্লা'র দাবী	...	৯
ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্‌যাপন	...	১০
অবতারত্বের প্রমাণ	...	১৪
অনুসন্ধানে বাধা-বিপত্তি	...	১৬
এই পুস্তকের উদ্দেশ্য	...	১৭

আনন্দবার্ত্তাবাহক মহামানব বা'ব

শৈশব ও যৌবন	...	২২
ঘোষণা	...	২৪
বা'বী আন্দোলনের উন্নতি ও অগ্রগতি	...	২৫
বা'বের দাবী	...	২৬
নির্য্যাতনের আতিশয্য-বৃদ্ধি	...	২৯
বা'বের আত্মোৎসর্গ বা শাহাদৎ	...	৩০
কার্ম্মেল পর্ব্বতে সমাধি	...	৩২
বা'বের বাক্যাবলী	...	৩৩

বিষয়		পৃষ্ঠা
সেই মহামানব যাঁহাকে ঈশ্বর ‘প্রকাশ’ করিবেন	...	৩৫
পুনরুত্থান, স্বর্গ ও নরক	...	৩৫
সামাজিক ও নৈতিক উপদেশাবলী	...	৩৬
বা’বের কষ্টভোগ ও জয়লাভ	...	৩৭

বাহাউল্লা’

জন্ম ও জীবনের প্রথমাংশ	...	৪০
বা’বী বলিয়া কারাবরুদ্ধ	...	৪২
বগ্‌দাদে নির্ব্বাসন	...	৪৫
দুই বৎসর অরণ্য-বাস	...	৪৭
মোল্লাগণের বিরুদ্ধাচরণ	...	৪৯
বগ্‌দাদের নিকটে রিজ্‌ওয়ানে ঘোষণা	...	৫২
কনষ্টান্টিনোপ্‌ল্‌ ও আড্রিয়ানোপ্‌ল্‌	...	৫৩
রাজন্যবর্গের নিকট লিপি-প্রেরণ	...	৫৪
আক্কায় বন্দী-জীবন	...	৫৮
কঠোরতার উপশম	...	৬০
কারাগারের দ্বার উন্মোচন	...	৬১
বাহ্‌জীতে জীবন-যাত্রা	...	৬৭
বাহাউল্লা’র স্বর্গারোহণ	...	৭১
বাহাউল্লা’র অবতারত্ব	...	৭২
বাহাউল্লা’র আবির্ভাবের উদ্দেশ্য	...	৭৮
বাহাউল্লা’র ফলকলিপি ও পুস্তকাবলী	...	৮১
বাহাই ধর্ম্মের প্রভাব	...	৮৪

বিষয় — পৃষ্ঠা

আব্দুল্‌বাহা

বিষয়		পৃষ্ঠা
জন্ম ও বাল্যকাল	...	৮৭
যৌবন	...	৮৯
বিবাহ	...	৯২
অঙ্গীকারের কেন্দ্র	...	৯৪
পুনরায় কারাবরোধ	..	৯৬
তুর্কী অনুসন্ধান-সমিতি	...	১০১
পাশ্চাত্য-জগতে ভ্রমণ	...	১০৩
পুণ্যভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন	...	১০৬
মহাযুদ্ধের সময়ে হাইফা	...	১০৯
সার আব্দুল্‌বাহা আব্বাস্, কে বি ই	...	১১০
শেষ কয়েক বৎসর	...	১১১
আব্দুল্‌বাহার মহাপ্রস্থান	...	১১৩
আব্‌দুলবাহার লেখা ও বক্তৃতা	...	১১৫
আব্‌দুল্‌বাহার স্থান বা পদবী	...	১১৬
বাহাই জীবনের আদর্শ	...	১২০

বাহাই কাহাকে বলে?

বাহাই জীবন	...	১২২
ঈশ্বর আরাধনা	...	১২৪
সত্যান্বেষণ	...	১২৬
ঈশ্বর প্রেম	...	১২৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
বিযুক্ততা	...	১৩১
বাধ্যতা	...	১৩২
সেবা	...	১৩৪
প্রচারকার্য্য	...	১৩৬
সৌজন্য ও শ্রদ্ধা	...	১৩৮
পাপ-আচ্ছাদনকারী চক্ষু	...	১৪০
দীনতা	...	১৪২
বিশ্বস্ততা ও সাধুতা	...	১৪৪
আত্মোপলব্ধি	...	১৪৫

প্রার্থনা

ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন	...	১৪৮
অর্চ্চক-মনোভাব	...	১৫০
মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজনীয়তা	...	১৫২
"নমাজ" অর্থাৎ প্রার্থনা অবশ্য-কর্ত্তব্য	...	১৫৪
প্রার্থনা প্রেমের ভাষা	...	১৫৬
সঙ্ঘবদ্ধ প্রার্থনা	...	১৫৮
মন্বন্তর-সঙ্কট ও নানাবিধ বিপত্তি হইতে পরিত্রাণ	..	১৫৯
প্রার্থনা ও প্রাকৃতিক বিধান		১৬২
বাহাই প্রার্থনা	...	১৬৫

স্বাস্থ্য এবং রোগমুক্তি

দেহ এবং আত্মা	...	১৬৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
সর্ব্ব-প্রকার জীবনের একত্ব বা সংযোগ	...	১৭০
সহজ, সরল জীবন-যাপন	...	১৭০
মদ্য এবং অন্যান্য নিদ্রাকর্ষক বস্তু	...	১৭১
আমোদ-প্রমোদ	...	১৭২
শুচিতা	...	১৭৩
অবতারের আদেশ মান্য করিলে যে ফল হয়	...	১৭৪
চিকিৎসকরূপে অবতারগণ	...	১৭৬
পার্থিব উপায়ে স্বাস্থ্য-লাভ	...	১৭৭
অপার্থিব উপায়ে রোগমুক্তি	...	১৮০
পবিত্র পরমাত্মার শক্তি	...	১৮২
রোগীর মনোভাব	...	১৮৩
চিকিৎসক	...	১৮৬
সর্ব্ব-সাধারণ কি উপায়ে রোগমুক্তির সহায়ক হইতে পারে		১৮৮
স্বর্ণ-যুগ বা সত্য-যুগ	...	১৯০
স্বাস্থ্যের উচিত ব্যবহার	...	১৯০

ধর্ম্মসমূহের একত্ব

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িকতা	...	১৯২
বাহাউল্লা'র প্রত্যাদেশবার্ত্তা	...	১৯৪
মানব-প্রকৃতি কি পরিবর্ত্তনীয় ?	...	১৯৬
ঐক্যের প্রথম সোপান	...	১৯৮
প্রধানত্বের সমস্যা	...	২০০
ক্রমশঃ প্রকাশমান্ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশবার্ত্তা	...	২০২

বিষয়		পৃষ্ঠা
অবতারগণের ভ্রমাতীত্যতা	...	২০৫
ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার	...	২০৭
জাগতিক অবস্থার নবরূপ-ধারণ	...	২০৯
বাহাই ধর্ম্মের সম্পূর্ণতা	...	২১০
বাহাই অঙ্গীকার	...	২১২
পুরোহিত-তন্ত্রের অভাব বা অনস্তিত্ব	...	২১৫

প্রকৃত সভ্যতা

ধর্ম্মই সভ্যতার ভিত্তি	...	২১৮
ন্যায়-বিচার	...	২১৯
রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি	...	২২১
রাষ্ট্র-নৈতিক স্বাধীনতা	...	২২৪
শাসক এবং শাসিত	...	২২৬
কর্ম্মে নিয়োগ এবং কর্ম্মে উন্নতি	...	২২৭
অর্থনৈতিক সমস্যা	...	২২৮
সাধারণের কোষাগার	...	২৩০
স্বেচ্ছাক্রমে ধন-বিভাগ	...	২৩১
সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইবে	...	২৩২
অর্থ সম্বন্ধীয় নৈতিক নিয়মাবলী	...	২৩৩
ব্যবসায়গত দাসত্বের উচ্ছেদ	...	২৩৪
মৃতের "উইল" ও তাহার সম্পত্তির ব্যবস্থা	...	২৩৭
নর-নারীর সাম্য ও সমানাধিকারবাদ	...	২৩৮
নারীগণ ও নবযুগ	...	২৪৩

বিষয়		পৃষ্ঠা
আকস্মিকতার পন্থা বর্জ্জিত হইয়াছে	...	২৪৪
শিক্ষা		২৪৫
প্রকৃতিগত বিভেদ ও তারতম্য	...	২৪৭
চরিত্র-গঠন	...	২৪৮
সুকুমার কলা, বিজ্ঞান ও শিল্প	...	২৪৯
দণ্ডিত, অপরাধী ব্যক্তির প্রতি আচরণ	...	২৫০
মুদ্রা-যন্ত্রের প্রভাব	...	২৫৩

শান্তির পথে

বিরোধ এবং বিরোধ-শান্তি	...	২৫৫
সর্ব্বব্যাপী মহান্‌শান্তি	...	২৫৭
ধর্ম্মগত বিদ্বেষ ও কুসংস্কার	...	২৫৮
জাতীয় বিদ্বেষ ও দেশাত্মবোধজনিত কুসংস্কার	..	২৬১
রাষ্ট্রীয় লোভ, প্রলোভন	...	২৬৩
সার্ব্বজনীন ভাষা	...	২৬৬
আন্তর্জাতিক মহাসভা	...	২৭১
আন্তর্জাতিক বিচারালয়	...	২৭৪
অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণের হ্রাস-সাধন	..	২৭৬
অপ্রতিরোধ-নীতি	...	২৭৭
মানবের মঙ্গলার্থে সংগ্রাম	...	২৮০
প্রাচী-প্রতীচী-সম্মেলন	...	২৮২

বিষয় | পৃষ্ঠা

নানাবিধ বিধি-নিষেধ ও উপদেশ

মঠ-মন্দিরে সন্ন্যাস-বৃত্তি ... ২৮৫
বিবাহ ... ২৮৭
বিবাহ-বিচ্ছেদ ... ২৮৯
বাহাই পঞ্জিকা ... ২৯০
আধ্যাত্মিক সভা ... ২৯৩
মহোৎসব ... ২৯৬
উপবাস বা "রোজা" ... ২৯৮
সভা-সম্মেলন ... ৩০০
মশ্‌রিকুল্‌-আজ্‌কার্‌ ... ৩০২
মৃত্যুর পরে জীবন-প্রবাহ ... ৩০৬
স্বর্গ ও নরক ... ৩০৮
দ্বিবিধ জগতের মূলীভূত ঐক্য .. ৩১১
অকল্যাণের অনস্তিত্ব ... ৩১৬

ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান

ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানে বিরোধিতার মূলকারণ ভ্রান্তি ... ৩১৯
ঈশ্বরের অবতার ও মহামানবগণের প্রতি অত্যাচার ... ৩২১
সমন্বয়ের যুগ-প্রভাত ... ৩২৩
সত্যান্বেষণ ... ৩২৬
ঈশিত্বের তাৎপর্য্য ... ৩২৭
ঈশ্বরের স্বরূপের উপলব্ধি ... ৩২৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
ঈশ্বরের প্রকাশগণ	...	৩৩০
বিশ্ব-সৃষ্টি		৩৩২
মানবের ক্রমবিবর্ত্তন	...	৩৩৪
দেহ এবং আত্মা	...	৩৩৭
মানবজাতির একত্ব	..	৩৩৯
একতার যুগাগমন	...	৩৪০

বাহাই প্রকাশ কর্ত্তৃক ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্‌যাপন

ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা	...	৩৪২
ঈশ্বরের আগমন	...	৩৪৪
যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী	...	৩৪৫
বা'ব এবং বাহাউল্লা' সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী	...	৩৪৭
ঈশ্বরের প্রভা	...	৩৫০
ঈশ্বরের দিন	...	৩৫১
আব্‌দুল্‌বাহা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী	...	৩৫২
কেয়ামৎ বা পরম-বিচারের দিন	..	৩৫৫
হাসর্ বা পুনরুত্থান.	...	৩৫৭
যীশুখৃষ্টের প্রত্যাবর্ত্তন	...	৩৬০
শেষের সময়	...	৩৬৩
স্বর্গ-মর্ত্ত্যে লক্ষণসমূহের প্রকাশ	...	৩৬৬
প্রতিশ্রুত মহামানবের আগমন-পদ্ধতি	...	৩৭০

বাহাউল্লা' এবং আব্‌দুল্‌বাহার ভবিষ্যদ্বাণী

ঈশ্বরের বাক্যের সৃজন-শক্তি	...	৩৭৬

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় নেপোলিয়ান ... ৩৮০

জার্ম্মানী .. ৩৮১

পারস্য ... ৩৮৩

তুরস্ক . ৩৮৪

আমেরিকা ... ৩৮৭

মহাসমর .. ৩৮৯

মহাযুদ্ধের পরে নানাবিধ বিপর্য্যয়-সৃষ্টি ... ৩৯০

ঈশ্বরের রাজত্বের প্রতিষ্ঠা ... ৩৯৩

আক্কা এবং হাইফা .. ৩৯৬

গতানুদর্শন ও ভবিষ্য-সূচনা

বাহাই ধর্ম্মের প্রসার ও অগ্রগতি ... ৩৯৯

বা'ব এবং বাহাউল্লা'র অবতারত্বের প্রমাণ .. ৪০৩

বিপুল গৌরবময় ভবিষ্যৎ .. ৪০৫

ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ... ৪০৭

নব প্রকাশের আবশ্যকতা ... ৪০৮

সত্য সকলেরই জন্য ... ৪০৮

আব্‌দুল্‌বাহার "শেষ বাণী" ... ৪১০

ঈশ্বরের ধর্ম্মের অভিভাবক ৪১০

ঈশ্বরের ধর্ম্মের হস্তগণ ... ৪১২

বাহাই আধ্যাত্মিক সভা-সমিতি ... ৪১৩

আব্‌দুল্‌বাহার "শেষ বাণী" হইতে উদ্ধৃত আরও ... ৪১৬

কিশোর, শাশুন-মৌচী, ঢাকা
নং ৩১৫২

উপক্রমণিকা

ডিসেম্বর, ১৯১৪ আমার পক্ষে বিশেষ স্মরণীয় কাল, কেননা এই সময়েই আমি আব্দুল্‌বাহার দর্শন-প্রাপ্ত আমার বন্ধুগণের সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে এবং ইঁহাদের হইতে ঋণ-প্রাপ্ত কয়েকটি পুস্তিকা পাঠে বাহাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে জ্ঞানলাভ করি, এবং এই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, শক্তি এবং সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। ইহা হইতে আমার এই ধারণাও জন্মে যে, বর্ত্তমান জগতের সমুদয় অভাব পূর্ণ করিবার জন্য বাহাই উপদেশাবলী ধর্ম্মকে যেভাবে উপস্থিত করিতেছে, অপর কোনো ধর্ম্ম তদ্রূপ করিতেছে না। আমি যতই এই ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম, আমার এই ধারণা ততই অধিক দৃঢ় ও গভীরতর হইতে লাগিল।

এই ধর্ম্মের অধিক জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহ করিতে আমাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই কারণে যাহা আমি জানিতে পারিলাম, শীঘ্রই তাহার সংক্ষিপ্ত-সার পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার সংকল্প স্থির করিলাম—যাহাতে এই ধর্ম্মের জ্ঞান অপরের নিকট সহজলভ্য হইতে পারে।

মহাযুদ্ধের অবসান হইলে প্যালেষ্টাইনের সঙ্গে সংবাদ-বিনিময় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল; আমি আব্দুল্‌বাহার নিকট এক পত্র লিখিলাম এবং এ পত্রের সঙ্গে এই পুস্তকের প্রথম নয় অধ্যায়ের এক প্রস্থ নকলও পাঠাইলাম, যাহা খসড়া হিসাবে সে সময় প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার নিকট হইতে প্রেম ও উৎসাহপূর্ণ উত্তর পাইলাম, এবং এই

পুস্তকের সমগ্র পাণ্ডুলিপি সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত হাইফাতে সাক্ষাৎ করিবার জন্য এক স্নেহমাখা আমন্ত্রণও প্রাপ্ত হইলাম। আনন্দের সহিত এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম; ১৯১৯-২০ সালের শীত ঋতুতে আড়াই মাস কাল যাবৎ আব্‌দুল্‌বাহার অতিথি হইবার আমার পরম সৌভাগ্য লাভ হইল। এই সাক্ষাৎকারের বিবিধ সময়ে আব্‌দুল্‌বাহা আমার সহিত এই পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছিলেন, এবং ইহার উন্নতি-বিধানার্থে আমাকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে আমি এই পাণ্ডুলিপির পুনঃ পরীক্ষা শেষ করিলে পর, তিনি ইহার সমস্তই পারস্য ভাষায় অনুবাদ করাইয়া লইবেন, যাহাতে তিনি স্বয়ং ইহা পাঠ করিয়া আবশ্যক সংশোধন করিতে পারেন। তাঁহার আদেশ অনুযায়ী ইহার পুনঃপরীক্ষা ও অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি তাঁহার তিরোধানের পূর্ব্বে এই পুস্তকের সাড়ে তিন অধ্যায় (১ম, ২য়, ৫ম এবং তৃতীয় অধ্যায়ের কতকাংশ) সংশোধন করিয়াছিলেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আব্‌দুল্‌বাহা এই পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ সংশোধন-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই; যদি পারিতেন, তাহা হইলে এই পুস্তকের মূল্য অত্যধিক বর্দ্ধিত হইত। সে যাহা হউক, ইংলণ্ডের জাতীয় বাহাই এসেম্ব্লীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি অতি সতর্কতার সহিত এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়াছেন, এবং এই বাহাই এসেম্ব্লী কর্ত্তৃক ইহার প্রকাশ-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

আব্‌দুল্‌বাহার দৌহিত্র শোঘি এফেন্দি (যিনি বর্ত্তমান সময়ে বাহাই ধর্ম্মের অভিভাবক) সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি স্বয়ং পাঠ করিয়া আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও তিনি এই পুস্তকের উদ্ধৃত বাক্যাবলীর অনুবাদ মূলগ্রন্থের সহিত মিলাইয়া সংশোধন করিতে পারেন নাই,

তথাপি ইহাঁর অনেক স্থানে উন্নত অনুবাদের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, যাহা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করিয়াছি।

মিস্ ই জে রোজেনবার্গ, মিসেস্ ক্লডিয়া এস্ কোল্জ, মীর্জ্জা লোৎফুল্লা' এস্ হাকিম, মেসার্স র'য় উইল্হেল্ম ও মাউন্টফোর্ড মিল্স এবং আরও অনেক সহৃদয় বন্ধু, যাঁহারা আমাকে এই পুস্তক প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি সবিশেষ ঋণী।

আরবী এবং পারস্য নাম ও শব্দাবলী অক্ষরান্তরিত করিবার যে পদ্ধতি শোঘি এফেন্দি সমগ্র বাহাই জগতের ব্যবহারের জন্য ইদানীং অনুমোদন করিয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে অবলম্বন করা হইয়াছে।

ফেয়ার ফোর্ড, কাণ্টস,
এবারডীন।

জে ই ইসলেমণ্ট

বাহাউল্লা' ও নবযুগ

প্রথম অধ্যায়

আনন্দবার্ত্তা

"পৃথিবীর সমস্ত জাতিগণের 'প্রতিশ্রুত পুরুষ' আবির্ভূত হইয়াছেন। সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায় ঈশ্বরের পরম প্রকাশের আগমন প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, এবং তিনি, বাহাউল্লা', সকল মানবজাতির সর্ব্বপ্রধান শিক্ষক ও অভিভাবক।"— (আব্দুল্‌বাহা)

ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা

মানবজাতির ক্রমোন্নতির যে কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি, মানব-সভ্যতা-বিকাশের বিশিষ্ট উপাদান হইতেছে, সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণের আবির্ভাব; যুগে যুগে এমন কতকগুলি অভ্রভেদী-চরিত্র-গৌরব-সম্পন্ন ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া থাকেন, যাঁহারা তাঁহাদের সম-সাময়িক যুগের সাধারণ চিন্তাধারা অতিক্রম করিয়া তৎকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞাত এবং অচিন্তিত-পূর্ব্ব সত্যসমূহ আবিষ্কার ও মানব-সমাজে ঘোষণা করেন। যুগান্তর নির্ভর করে প্রধানতঃ এই সমস্ত পথস্রষ্টা, আবিষ্কর্ত্তা, প্রতিভা-দীপ্ত মনস্বী, সত্য-প্রকাশক অবতার মহাপুরুষগণের উপর। বিখ্যাত মনীষী কার্লাইল এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"আমাদের মনে হয়, সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট, স্বচ্ছ সত্য এই যে, যে

ব্যক্তির অন্তঃকরণে অন্তর্নিহিত কোনো উচ্চতর স্তরের জ্ঞানের বা অজ্ঞাত আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতিষ্ঠা আছে, তিনি দশটি বা দশ সহস্র সাধারণ ব্যক্তি যাহাদের সেই জ্ঞান নাই, শুধু যে তাহাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী এমন নহে, বরং অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তি, যাহাদের সেই জ্ঞান বা সত্যের উপলব্ধি নাই তাহাদের অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। অপার্থিব, স্বর্গীয় শৌর্য্যে দেদীপ্যমান হইয়া তিনি তাহাদের মধ্যে অবস্থান করেন, মনে হয় যেন তিনি স্বর্গের অস্ত্রশালা হইতে সংগৃহীত স্বর্গীয় তরবারির সাহায্যে সশস্ত্র, তিনি দুর্নিবার, কাংস্য-দুর্গ বা চর্ম্ম-বর্ম্ম, কিছুই তাঁহার গতি প্রতিহত করিতে শেষ পর্য্যন্ত সক্ষম হইবে না।"—(যুগ-লক্ষণ)

বিজ্ঞান, শিল্প এবং সঙ্গীতের ইতিহাসে এই সত্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ধর্ম্মজগতে মহাপুরুষগণের আবির্ভাবের যেমন ভঙি বিশেষ, অতি সুস্পষ্ট মূল্য আছে, অন্য কোনো বিভাগে তেমন নাই। যুগে যুগে মানবের আধ্যাত্মিক জীবন যখন কলুষগ্রস্ত হইয়া নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িয়াছে, যখন তাহাদের জীবন দুর্নীতিপূর্ণ হওয়ায় তাহাদের মানসিক অধোগতি ঘটিয়াছে, তখনই দেখিতে পাওয়া যায়, একজন বিস্ময়কর ও দুর্জ্ঞেয় মহাপুরুষ ঈশ্বরের অবতার পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। পৃথিবীর ঘনীভূত অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে তিনি একাকী দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন, নিঃসঙ্গত্ব, একাকীত্ব তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না; তিনি স্বয়ং সিদ্ধ অবস্থায় জীবন-পথে প্রযুক্ত হইয়া বিচরণ করেন; তাঁহাকে শিক্ষা দিতে বা তাঁহাকে পরিচালিত করিতে সমর্থ কোনো ব্যক্তি ত তাঁহার সম-সাময়িক যুগে থাকেই না, এমন কি, এমন একটি ব্যক্তিও থাকেনা, যে সেই মহাপুরুষের বাণী সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে। অন্ধ জন-সমাজে একমাত্র চক্ষুষ্মান ব্যক্তির

ন্যায়, একাকী সেই মহাপুরুষ এই পাপ-কলুষিত পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার বাণী ঘোষণা করেন।

অবতারগণের মধ্যে বিশেষ শ্রেষ্ঠতা-সম্পন্ন কয়েকজনের নাম স্মরণ করা যাইতে পারে। কয়েক শতাব্দী পরে পরেই একজন মহান্ স্বর্গীয় প্রকাশ, ঈশ্বরের অবতার প্রাচীদেশে আধ্যাত্মিক সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়াছেন, যেমন, কৃষ্ণ, জোরোয়াষ্টার, মুসা, যীশু ও মোহাম্মদ। সূর্য্যের ন্যায় ইঁহারা তমসাচ্ছন্ন মানবমন জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন এবং তাহাদের সুপ্ত আত্মাকে চৈতন্য দান করিয়াছেন। এই সমস্ত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের মধ্যে তুলনা করিয়া পরস্পরের মহত্ব সম্বন্ধে আমাদের অভিমত যাহাই হউক না কেন, ইহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে তাঁহারা সকলেই মানবের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও চিত্তোন্নতির পক্ষে সমধিক প্রভাবশালী সহায়ক ছিলেন। এই অবতার-গণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, যে বাণী তাঁহারা উচ্চারণ করিতেছেন, তাহা তাঁহাদের নিজস্ব কথা নহে, তাহা দৈববাণী, তাহা স্বর্গীয়-বার্ত্তা,—তাঁহারা তাহার বাহক মাত্র। এই সমস্ত অবতারগণের যে সমস্ত বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া রক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে বহুবার ইঙ্গিত, আভাস এবং প্রতিশ্রুতি দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে "কালপূর্ণ হইলে" এক জন অতি মহান্ বিশ্ব-শিক্ষক আবির্ভূত হইবেন, যিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী-গণের আরব্ধ কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিবেন এবং তাহার পরিপূর্ণ পরিণতি সম্পাদন করিবেন। তিনি পৃথিবীতে শান্তি এবং ন্যায়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্ম, জাতি ও শ্রেণীর সকল মানবকেই এক পরিবারের অন্তর্গত করিবেন, যেন "মাত্র এক মেষপাল এবং তাহার রক্ষকও এক হয়" এবং মানবকুলের ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম সকলেই ঈশ্বরকে চিনিতে ও তাঁহাকে ভালবাসিতে সক্ষম হয়।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মানবজাতির ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে, এই পরবর্ত্তীকালের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের, এই বিশ্ব-শিক্ষকের আবির্ভাব। এবং "বাহাই"গণ পৃথিবীতে এই আনন্দ-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন যে এই বিশ্ব-শিক্ষক বাস্তবিকই আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার প্রত্যাদিষ্ট স্বর্গীয়-বাণী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং প্রত্যেক প্রকৃত সত্যান্বেষীই তাহা অধ্যয়ন করিতে পারেন, "পরম প্রভুর দিন"এর প্রভাত হইয়াছে, এবং "ন্যায়পরায়ণতার সূর্য্য" সমুদিত হইয়াছেন। এই পর্য্যন্ত মাত্র কয়েকজন পর্ব্বত-শৃঙ্গারূঢ় পুণ্যাত্মা ব্যক্তি সেই পরম জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলের দর্শন লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কিরণ-সম্পাতে সমগ্র অন্তরীক্ষ, স্বর্গ এবং পৃথিবী দ্রুত উদ্ভাসিত, প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। শীঘ্রই এই সূর্য্য পর্ব্বতোপরি সমুদিত হইবেন, এবং ক্ষেত্র, প্রান্তর, অধিত্যকা সর্ব্বত্রই আলোক প্রদান করিবেন, এবং সকলকে পরম পথে এবং জীবনে অনুপ্রাণিত করিবেন।

পরিবর্ত্তমান জগৎ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পৃথিবী, প্রাচীন যুগের মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং নবযুগের জন্ম-যন্ত্রণা, এই দ্বিবিধ প্রাণান্তকারী বিপ্লবের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতেছিল। একথা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। জড়তান্ত্রিকতা এবং ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ, প্রাচীনকালের আচরণ-নির্দ্দেশক এই দুই নীতি এবং প্রাচীনকাল হইতে প্রাপ্ত যে সমস্ত শ্রেণীবিভেদ ও জাতিবিভেদ অশেষবিধ কলহ-বিদ্বেষ-বিসম্বাদাদি উৎপন্ন করিত, স্বরচিত ধ্বংসস্তূপের আবর্ত্তের মধ্যে এই সমস্ত সঙ্কীর্ণতম নীতি এবং প্রতিষ্ঠান পরাজিত, পরিশেষে পরিত্যক্ত হইয়া শেষ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। এবং সর্ব্বদেশেই নূতন প্রেরণা এবং নূতন ভাবের আভাস পাওয়া

যাইতেছে। এই নূতন ভাবসমষ্টির মর্ম্মবাণী এবং লক্ষণ হইতেছে, অখণ্ড বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ব এবং আন্তর্জাতীয়তা। পুরাতনের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, পুরাতনের বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া এই নবভাব সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। মানব-জীবনের প্রত্যেক বিভাগে যে সমস্ত অতি বৃহৎ বিপ্লব এবং যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তাহার তুলনা পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস হইতে মিলিবে না। প্রাচীন যুগ অন্তিম শয্যায় শয়ান হইলেও এখনও মরে নাই। নবীনযুগের সঙ্গে প্রাচীন যুগের জীবন-মরণ-সংগ্রাম এখনও চলিতেছে। বিপুলায়তন, দুর্জ্জয় কলুষরাশি এখনও পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সত্য; কিন্তু নূতন আশা, উৎসাহ এবং তৎপরতার সহিত তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইতেছে, তাহাদিগকে আক্রমণ করা হইতেছে এবং তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। রাশি-রাশি ভয়াবহ, কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আকাশ পরিব্যাপ্ত হইলেও, ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়া আলোক-কিরণ আসিয়া পড়িতেছে, তাহাতে অগ্রগতির পথ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং পথে যে সমস্ত বাধা, বিপত্তি আছে, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অবস্থা অন্যরূপ ছিল। তখন যে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক অন্ধকারে পৃথিবী নিমগ্ন ছিল, সে তমোরাশির মধ্যে একটিও আলোক-কিরণ দেখা যাইত কিনা, সন্দেহ। প্রভাতের অব্যবহিত-পূর্ব্ব-ক্ষণ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা গভীর অন্ধকারময় এবং নিকষ-কৃষ্ণ, সেইরূপ সে যুগও ছিল সর্ব্বাপেক্ষা তামসিক। যে কয়েকটি প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা এবং দীপ-শিখা ক্ষীণ আলোক-রশ্মি বিতরণ করিতেছিল, তাহাতে কেবলমাত্র সেই যুগের তামসিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা অধিকতর ভয়াবহ-রূপে দৃষ্টি-পথে পতিত হইতেছিল, অন্ধকার বিদূরিত করিবার মতো জ্যোতিঃ সে আলোকের ছিল না। কার্লাইল তাঁহার "ফ্রেডারিক দি

গ্রেট" নামক গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"এ শতাব্দীর ইতিহাস নাই, থাকা সম্ভবও নহে। পুঞ্জীভূত মিথ্যাচারে সমৃদ্ধ এই শতাব্দী! পূর্ব্বে কোনো শতাব্দীই এত মিথ্যা এবং দুর্নীতিপূর্ণ ছিল না। মিথ্যাচার এতই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে সত্য এবং মিথ্যা, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং মিথ্যা সম্বন্ধে সচেতনতা আদৌ ছিল না। অস্থি, মজ্জা পর্য্যন্ত মিথ্যার অবাধ প্রভাবে দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল, পৃথিবী মিথ্যার মধ্যে ডুবিয়াছিল। পাপের মাত্রা পরিশেষে পূর্ণ হইলে ফরাসী বিপ্লব সমস্ত ধ্বংস করিয়া দিল। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে মনে করি, এই পাপপরিপূর্ণ শতাব্দীর অন্ত এইরূপই হওয়া উচিত ছিল এবং উপযুক্তই হইয়াছিল। কারণ, মানবজাতিকে যদি বানরের অবস্থায় নামিয়া যাইতে না হয়, তাহা হইলে, এই অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তঃসারশূন্য, বিলাস-ব্যসনে চিরাভ্যস্ত, জড়বুদ্ধি নরনারীগণের জন্য আর একবার ঈশ্বর-অবতারের প্রয়োজন ছিল।"—("ফ্রেডারিক দি গ্রেট", প্রথম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়)

অন্ধকার রাত্রির পর প্রভাত হয়, নিদারুণ শীত-ঋতুর পর বসন্ত সমাগত হয়; তুলনা করিলে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর পর বর্ত্তমান সময়ও সেইরূপ, উভয়বিধ বস্তুর মধ্যে একই সম্বন্ধ। পৃথিবী নব-জীবনের অভিব্যক্তিতে চঞ্চল, নব-আদর্শ এবং নব-আশা সঞ্চারে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও যে সমস্ত বিষয় স্বপ্নের ন্যায় অসম্ভব বলিয়া মনে হইত, তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। অন্য যে সমস্ত কথা সুদূর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বলিয়া মনে হইত, তাহা বর্ত্তমান তথ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। আমরা পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড্ডীয়মান হইতে পারি, আবার সমুদ্রে জলের নিম্ন দিয়া ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমরা বিদ্যুৎগতিতে সমস্ত পৃথিবীময় সংবাদ ছড়াইতে পারি। গত

কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি, পৃথিবীর সামরিক একতান্ত্রিক রাজত্বগুলি অধোগমন করিয়াছে, নারীগণ সর্ব্বপ্রকারের ব্যবসা এবং কর্ম্মে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, পূর্ব্বে তাহাদের যে সমস্ত কর্ম্মে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, সেগুলির প্রবেশ-পথও তাহাদের নিকটে উন্মুক্ত, অবারিত হইয়াছে, একটি বিরাট মহাদেশবাসী সমস্ত নর-নারী মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছে, "আন্তর্জাতিক মহাসভা" জন্মলাভ করিয়াছে এবং পৃথিবী হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ বিদুরিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর এবং কিঞ্চিৎ সফলকাম হইয়াছে। আরও অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে; বাহুল্য ভয়ে তাহার তালিকা দেওয়া হইল না।

ন্যায়বিচার ও অনুকম্পার ভাস্বর সূর্য্য

পৃথিবী জুড়িয়া এই যে অপ্রত্যাশিত জাগরণের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, ইহার কারণ কি? বাহাইগণ বিশ্বাস করেন, যে এই জগদ্ব্যাপী উদ্বোধনের কারণ, বাহাউল্লা'র মাঝ দিয়া পরম পবিত্রাত্মার অজস্র-বর্ষণ। এই মহীয়ান্ অবতার ঠিক এক শতাব্দী পূর্ব্বে পারস্য দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পবিত্রভূমি (প্যালেষ্টাইন)এ দেহত্যাগ করেন।

বাহাউল্লা' জগজ্জনকে শিখাইলেন, সূর্য্য যেমন প্রাকৃতিক জগতে আলোক দান করেন, তেমনই পুণ্য অবতার, "ঈশ্বরের প্রকাশ" আধ্যাত্মিক জগতে আলোক বিতরণ করেন। প্রাকৃতিক সূর্য্য যেমন পৃথিবীর উপর কিরণ বর্ষণ করিয়া প্রাকৃতিক জৈব জগতে জীবগণের জন্ম-বৃদ্ধির কারণ স্বরূপ হইয়া থাকেন, তেমনই "ঈশ্বরের প্রকাশ", সত্য-সূর্য্য, হৃদয় ও আত্মা

জগতে সমুদিত হইয়া মানবের চরিত্র, নীতি এবং চিন্তাধারার উন্নতি বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এবং প্রাকৃতিক সূর্য্যের কিরণ যেমন পৃথিবীর নিভৃততম অন্ধকার কোণেও স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে এবং যে সমস্ত জীব কখনো আলোকের সংস্পর্শে আসে না, তাহাদিগকেও জীবনী শক্তি, চৈতন্য এবং উষ্ণতা প্রদান করিয়া থাকে, তেমনই "ঈশ্বরের প্রকাশ" এর মাঝ দিয়া পবিত্র পরমাত্মার করুণার প্লাবন মানব মাত্রেরই জীবন প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে এবং যে সমস্ত ব্যক্তিগণের নিকট এবং যে-সমস্ত অন্তরালস্থিত স্থানে যুগাবতারের নামও অজ্ঞাত, তাহাদের মধ্যেও শিশিক্ষু ব্যক্তিদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে এবং সেই সমস্ত স্থানে স্বীয় মহিমা বিঘোষিত করে। অবতারের আগমন বসন্তের আগমনের ন্যায় নব জীবন-সঞ্চারকারী। ইহাই "পুনরুত্থানের দিন," যেই সময় আধ্যাত্মিক জগতে মৃত মানবগণ পুনর্জ্জীবিত হয়, যেই সময় ঐশ্বরিক ধর্ম্মসমূহের সত্যতা পুনঃ প্রবর্ত্তিত ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং যেই সময় পৃথিবী ও স্বর্গ, উভয়ই নব কলেবর ধারণ করে।

প্রাকৃতিক জগতে, বসন্তঋতু কেবলমাত্র যে নব জীবনের জন্ম বৃদ্ধি সূচিত করে, তাহা নহে, পুরাতনের ধ্বংস এবং জরাগ্রস্তের অপসারণও বসন্ত ঋতুর স্বধর্ম্ম। উষ্ণ-রশ্মি দিবাকর কেবলমাত্র যে কুসুমকুলকে প্রস্ফুটিত করেন এবং বৃক্ষ-শাখা মঞ্জরিত করিয়া তোলেন, তাহা নহে, মৃতের, পরিত্যক্তের, আবর্জ্জনার জঞ্জাল ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করাও তাঁহার অন্যতম প্রভাবের ফল। সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে শীত-ঋতুর তুষার গলিয়া বারিরাশিতে পরিণত হয়, উন্মুক্ত বারিরাশি পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া পড়ে, পরিশেষে বন্যা এবং প্রভঞ্জনের সাহায্যে পৃথিবীর সমস্ত পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল ফুৎকারে উড়াইয়া দেয়, পৃথিবী শুচি এবং নির্ম্মলরূপ ধারণ করে। আধ্যাত্মিক জগতেও এইরূপ। আধ্যাত্মিক

সূর্য্যও অনুরূপ বিপ্লব এবং পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া থাকেন। এই হেতু "পুনরুত্থানের দিন"কে পরম বিচারের দিনও বলা হয়, যেই সময় অনাচার, কদাচারসমূহ, সত্যের মিথ্যা অনুকৃতি, প্রাচীন বিশ্বাস এবং প্রথাসমূহ পরিত্যক্ত, এবং বিনষ্ট হয়। শীতঋতুতে যে সমস্ত কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বরফ ও তুষাররাশি পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহা গলিয়া রূপান্তরিত হয়, অশ্মীভূত শক্তি পুনরায় কর্ম্মপথে পরিচালিত হয়, কর্ম্মের প্লাবনে পৃথিবী নূতন করিয়া গঠিত এবং ভাবে যুগান্তর উপস্থিত হয়।

বাহাউল্লা'র দাবী

সুস্পষ্ট ভাষায়, বারম্বার বাহাউল্লা' ঘোষণা করিয়াছেন, তিনিই সেই মহামানব যাঁহার আবির্ভাব মানবকুল আশাপূর্ণ হৃদয়ে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতেছিল, তিনিই সেই অভিভাবক, সমগ্র মানবজাতির শিক্ষক। তিনি সেই পরম-করুণা বিতরিত হইবার একমাত্র প্রণালী, তাঁহার মাঝ দিয়া পরম স্নেহধারা অতীতকালের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্ষিত হইবে, যাহার মধ্যে সমস্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্ম, সাগরে যেরূপ সমস্ত নদী মিশিয়া যায় সেরূপভাবে বিলীন হইবে। তিনি পৃথিবীতে শান্তি ও মানবমিত্রতার সেই মহান্ গৌরবময় যুগ-প্রবর্ত্তনের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন, যে-যুগের কথা পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারগণ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, এবং কবিগণ কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

সত্যান্বেষণ, মানবপ্রীতির মূলীভূত ঐক্য, সর্ব্ব-ধর্ম্ম সমন্বয়, সর্ব্ব-জাতি মৈত্রী, প্রাচী-প্রতীচি সম্মেলন, বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মের সমন্বয়, কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাসের অপনোদন, নরনারীর অধিকারগত সমতা, ন্যায় এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতিষ্ঠা, সর্ব্বোচ্চ আন্তর্জাতীয় বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন ভাষাসমূহের একীকরণ, সার্ব্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা

ও জ্ঞানের প্রচার—এই সমস্ত এবং আরও তদ্রূপ অনেক উপদেশবাণী বাহাউল্লা'র লেখনীমুখে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি যে অসংখ্য গ্রন্থ এবং পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্য দিয়া; এই সমস্ত পত্রের অনেকগুলি পৃথিবীর রাজন্যকুল এবং রাষ্ট্রশাসকগণের নিকট লিখিত হইয়াছিল।

তিনি যে বাণী জন-সমাজে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা ব্যাপকত্বে এবং উদারতায় অনবদ্য। যুগোপযোগিত্ব এবং সমসাময়িক জন-সমাজে ইহার অনুসৃত হইবার যোগ্যতা বাস্তবিকই অসাধারণ। বর্ত্তমান সময়ে মানব-সমাজের সমস্যাগুলি যেরূপ দুরূহ এবং প্রবলরূপে দেখা দিয়াছে, পূর্ব্বে কখনো সেরূপ হয় নাই। বর্ত্তমান যুগের প্রস্তাবিত সমস্যাগুলি যত অধিক সংখ্যক এবং পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন, সেরূপ কোনো কালে ছিল না। বিশ্ব-শিক্ষকের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান যুগে যত অধিক পরিমাণে অনুভূত হইতেছে, পূর্ব্বে কখনো সেরূপ হয় নাই, এবং এইরূপ বিশ্ব-শিক্ষকের আবির্ভাব সম্বন্ধে মানব-মনে নিঃসন্দেহতা এবং নিশ্চয়তা বর্ত্তমান যুগে যত অধিক, বিগত কোনো যুগে সম্ভবতঃ সেরূপ ছিল না।

ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্‌যাপন

আব্দুল্‌বাহা লিখিয়াছেন :—

"বিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন যীশুখৃষ্ট আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন য়িহুদীগণ তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং প্রত্যহ সাশ্রু-লোচনে প্রার্থনা করিত, বলিত "হে ঈশ্বর, 'মসীহের প্রকাশ' ত্বরা কর"। তথাপি যখন 'সত্যের সূর্য্য' সমুদিত হইলেন, য়িহুদীগণ তাঁহাকে অস্বীকার

করিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল, এবং অবশেষে তাহারা এতই শত্রুভাবাপন্ন হইল যে তাহারা সেই পবিত্রাত্মা, 'ঈশ্বরের বাক্য'কে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া বলি দিল, এবং তাহারাই তাঁহাকে শয়তানানুচর 'বি'লজেবুব্' আখ্যা দিল—এই কথা গস্‌পেল গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এইরূপ আচরণের কারণ এই যে, তাহারা মনে করিত এবং বলিত:—'তোরা (তৌরিত) নামক পবিত্র গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে যে, ক্রাইষ্টের আবির্ভাব কয়েকটি লক্ষণ দ্বারা সূচিত হইবে, এই লক্ষণগুলি যতদিন পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত না হইবে, ততদিন যে ব্যক্তি নিজকে 'মসীহ' বলিয়া দাবী করিবে, সে প্রবঞ্চক ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। এই লক্ষণগুলির একটি এই যে, 'মসীহ' কোনো অজ্ঞাত স্থান হইতে আবির্ভূত হইবেন, অথচ আমরা সকলেই জানি, এই ব্যক্তির আবাস নাজেরাথে; নাজেরাথ হইতে কখনো কিছু ভাল উদ্ভূত হইতে পারে কি? দ্বিতীয় লক্ষণ হইতেছে এই যে, প্রকৃত পক্ষে যিনি 'মসীহ' হইবেন, তিনি লৌহদণ্ড দ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন অর্থাৎ তরবারি সহযোগে কার্য্য করিবেন; কিন্তু এই মসীহের, তরবারি দূরে থাকুক, সামান্য একটি কাষ্ঠ যষ্টিও নাই। আর একটি লক্ষণ এইরূপ:—তিনি দাউদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া দাউদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সিংহাসনারূঢ় হওয়া দূরের কথা, এই ব্যক্তির উপবেশন করিবার মত একটি মাদুরও সম্বল নাই। আর একটি লক্ষণ:—'তোরা'-বর্ণিত সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন; কিন্তু এই ব্যক্তি তাহা সমস্তই রহিত করিয়াছে, এমন কি, "স্যাবাাথ"ও ভঙ্গ করিয়াছে অর্থাৎ সপ্তাহকাল মধ্যে এক দিবস পুণ্য-দিবস বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে, এ বিধান পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিয়াছে। 'তোরা'য় স্পষ্ট বলা হইয়াছে, যে-ব্যক্তি অবতারত্বের দাবী করে এবং আশ্চর্য্য অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করে কিন্তু

"স্যাব্যাথ" ভঙ্গ করে, তাহাকে বধ করিতে হইবে। আর একটি লক্ষণ এইরূপ:—মসীহের রাজত্বে ন্যায়পরতা এতই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে যে মানব-সমাজ হইতে মানবেতর-জীব-সমাজে হিতৈষণা-বৃত্তি এবং ধার্ম্মিকতা ছড়াইয়া পড়িবে, সর্প এবং মূষিক একই গর্ত্তের অংশী হইয়া বাস করিবে, ঈগল এবং পারাবত একই নীড়ে বাসা বাঁধিয়া থাকিবে, সিংহ এবং হরিণ একই বনখণ্ডে বিচরণ করিবে, বৃক এবং ছাগ-শিশু একই নির্ঝর হইতে জলপান করিয়া পিপাসা মিটাইবে। কিন্তু, এই ব্যক্তির সময়ে অন্যায়-অত্যাচার এত অধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে যে তাহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া নিহত করা হইয়াছে। আর একটি লক্ষণ এই যে, মসীহের যুগে য়িহুদীগণ পৃথিবীর সমস্ত জাতিগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবে এবং বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হইবে; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে তাহারা রোমক সাম্রাজ্যের অধীনে যতদূর সম্ভব ঘৃণিত, হীন অবস্থায় কাল অতিবাহিত করিতেছে। এখন, কিরূপে এ ব্যক্তি 'তোরা'-প্রতিশ্রুত মসীহ হইতে পারে?'

"এরূপে তাহারা 'সত্য-সূর্য্য'কে অস্বীকার করিল, যদিও তিনি 'তোরা'-প্রতিশ্রুত সেই মহাপুরুষ বই আর কেহই নহেন। য়িহুদীগণ এই সমস্ত লক্ষণের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিল না, সুতরাং তাহারা "ঈশ্বরের বাক্য" যীশুখৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করিল। এক্ষণে, বাহাইগণ মনে করেন যে 'তোরা'-বর্ণিত লক্ষণগুলি সমস্তই ঘটিয়াছিল, কিন্তু য়িহুদীগণ যে অর্থে বুঝিয়াছিল, তদ্রূপ অর্থে নহে, কারণ 'তোরা'র লক্ষণ-বর্ণনা রূপকাত্মক। উদাহরণ স্বরূপ, রাজত্ব সম্বন্ধীয় লক্ষণটির কথা বিচার করা যাউক। বাহাইগণ বলেন যে, যীশুখৃষ্টের রাজত্ব স্বর্গীয়, অপার্থিব এবং চিরস্থায়ী ও শাশ্বত, নেপোলিয়নের রাজত্বের মত ক্ষণস্থায়ী নহে। বাস্তবেও দেখা যাইতেছে প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইল ক্রাইষ্টের রাজত্ব

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অদ্যাপিও বিরাজ করিতেছে; এবং অনন্তকাল ধরিয়া সেই 'পবিত্র পুরুষ' চিরস্থায়ী সিংহাসনে আরূঢ় থাকিবেন।'

"এইরূপে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে যে, 'তোরা'-বর্ণিত অন্য সমস্ত লক্ষণও যথাযথরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু য়িহুদীগণ তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। যদিও যীশুখৃষ্ট স্বর্গীয় সুষমা-মণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বিংশ শতাব্দীর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইতেছে, অথচ য়িহুদীগণ এখনও উন্মুখ হইয়া মসীহের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং তাহাদের নিজকে মনে করিতেছে, সত্য এবং ক্রাইষ্টকে মনে করিতেছে, মিথ্যা।"—(আবদুল্‌বাহা কর্ত্তৃক এই অধ্যায়ের জন্য লিখিত)

য়িহুদীগণ যদি যীশুখৃষ্টকে জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে তিনি নিজের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু তাহারা তাহা করে নাই। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য, য়িহুদীগণের অবস্থা হইতে শিক্ষা লাভ করা; প্রতিশ্রুত বিশ্ব-শিক্ষকের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সম্পন্ন হয় নাই, এইরূপ সিদ্ধান্তে সহসা উপস্থিত না হইয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য, বাহাউল্লা' স্বয়ং তাহাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া; কারণ, অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণীই দুর্ব্বোধ্য, 'গালা-মোহরাঙ্কিত', এবং প্রকৃত শিক্ষক ঈশ্বরের অবতার স্বয়ংই সেই মোহর ভাঙ্গিয়া সেই বাক্য-ভাণ্ডারে নিহিত মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিতে পারেন।

বাহাউল্লা' প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সর্ব্বজন-বোধ-কল্পে অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অবতারত্বের প্রমাণের জন্য তিনি এই সমস্তের উপর নির্ভর করেন নাই। যখন সূর্য্য উদিত হয়, অনুভব-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারে। সূর্য্য নিজেই

নিজের প্রমাণ, সূর্য্যোদয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী অন্বেষণ করিতে হয় না। ঈশ্বরের অবতার যখন আবির্ভূত হয়েন, তখনও তদ্রূপ। প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ যদি সমস্তই বিলুপ্ত, বিস্মৃত হইয়াও যায়, তাহা হইলেও যাঁহাদের আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় বিকশিত, তাঁহাদের পক্ষে তখনও তিনি নিজেই নিজের যথেষ্ট ও প্রচুর প্রমাণ।

অবতারত্বের প্রমাণ

যুক্তিহীন, অন্ধভাবে তাঁহার বাণী গ্রহণ করিতে বা তাঁহার অভিজ্ঞান বিশ্বাস করিতে বাহাউল্লা' কাহাকেও বলেন নাই। বরঞ্চ, তাঁহার উপদেশের পুরোভাগে তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তির বিরুদ্ধে তীব্র সাবধান-বাণী। তিনি আগ্রহ সহকারে সকলকেই বলিতেন, তাহাদের চক্ষুকর্ণ উন্মুক্ত রাখিয়া স্বকীয় বিচার-বুদ্ধি স্বাধীন ও নির্ভীক-ভাবে সত্যান্বেষণে প্রযুক্ত করিতে। তিনি সকলকে সত্যের পূর্ণ তত্ত্বানুসন্ধান করিতে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন; তিনি নিজকে কোনো দিন লুক্কায়িত রাখেন নাই। তাঁহার অবতারত্বের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রমাণ স্বরূপ তিনি উপস্থিত করিতেন, তাঁহার বাণী, ও তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলী; এবং তাঁহার বাণী ও কর্ম্ম, মানব-মন, মানব-চরিত্র ও মানব-জীবন রূপান্তরিত করিবার পক্ষে কিরূপ সহায়ক, এবং কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাহাই তিনি সর্ব্ব-সমক্ষে উপস্থিত করিতেন, তাঁহার অবতারত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে। তিনি যে পরীক্ষা প্রস্তাব করিতেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বগামী মহান্ অবতারগণের ন্যায় একই ধরণের। মুসা বলিয়াছিলেন :—

"যদি কোনো ভবিষ্যদ্বাদী ঈশ্বরের নাম করিয়া কোনো বিষয়ে কথা বলেন, আর যদি সেই কথা মতে ঘটনা না ঘটে বা তাহার ফল উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই বাক্য ঈশ্বর বলেন

নাই, উহা সেই ভবিষ্যদ্বাদী পুরুষ কর্ত্তৃক ব্যক্তিগত, উদ্ধতভাবে বলা হইয়াছিল, তুমি তাহার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হইওনা।"—(ডিউটের'নমি, ১৮,২২)।

যীশুখৃষ্ট তাঁহার নিজ দাবীর প্রমাণ সম্বন্ধে তুল্য একটি প্রাঞ্জল প্রস্তাব নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ—

"নকল অবতারগণ হইতে সাবধান, তাহারা মেষ-চর্ম্মাচ্ছাদিত হইয়া আসে বটে, কিন্তু অন্তরে তাহারা অতি ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত। তাহাদের কার্য্যাবলীর ফলাফল দেখিয়াই তোমরা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। কণ্টকগুল্ম হইতে কেহ কী কখনো দ্রাক্ষাফল আহরণ করিয়াছে? কেহ কী কখনো কণ্টকদ্রুম হইতে ডুম্বুর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে? তদ্রূপ, প্রত্যেক সুফলদায়ী বৃক্ষে সুফলই ফলিয়া থাকে, এবং কুফলদায়ী বৃক্ষে কুফলই ফলিয়া থাকে। * * * সুতরাং তোমরা ফল দেখিয়াই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে।"—(মথি, ৭, ১৫-২০)

পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, এই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া বাহাউল্লা'র অবতারত্বের দাবী কতদূর প্রতিষ্ঠিত হয়; আমরা দেখিব, বাহাউল্লা' যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা কতদূর সফল হইয়াছে; তাঁহার প্রসূত ফল সু হইয়াছে, কি কু হইয়াছে; তিনি যে সমস্ত ঘটনা ঘটিবে বলিয়াছিলেন, তাহা ঘটিয়াছে কিনা; তিনি যে সমস্ত বিধিনিষেধমূলক আজ্ঞা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা এবং তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলী মানবজাতির নৈতিক ও চারিত্রিক সুশিক্ষা ও উন্নতিকল্পে সহায়ক হইয়াছে, কি তাহার বিপরীত ফল ফলিয়াছে।

অনুসন্ধানে বাধা-বিপত্তি

অবশ্য, এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যানুসন্ধিৎসু শিশিক্ষুর শিক্ষালাভের পথে অনেক বাঁধা-বিঘ্ন আছে, পথ নিতান্ত সহজ নহে। সমস্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনের ন্যায় বাহাই ধর্ম্মের আন্দোলনও মিথ্যা ও নিন্দাবাদ দ্বারা জনসমাজে অপ্রকৃতরূপে পরিচিত হইয়াছে; বাহাই ধর্ম্মের উপর ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে। বাহাউল্লা' এবং তাঁহার অনুগামীগণ যে ভীষণ-ভাবে নির্য্যাতিত ও নিপীড়িত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে অবশ্য শত্রু-মিত্র সকলেই একমত। কিন্তু এই আন্দোলনের তাৎপর্য্য এবং আধ্যাত্মিক মূল্য-নির্ণয় লইয়া এবং এই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব লইয়া মতদ্বৈধের অন্ত নাই; বিশ্বাসীগণ একরূপ বলিয়া থাকেন, যাঁহারা অস্বীকার করেন, তাঁহারা অন্যরূপ বলেন। যীশুখৃষ্টের সময়েও এইরূপ হইয়াছিল। ক্রাইষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া প্রাণে বধ করা এবং তাঁহার অনুগামীগণকে উৎপীড়ন, নির্য্যাতন ও হত্যা করা সম্বন্ধে খৃষ্টীয়ানগণ এবং য়িহুদীগণ সকলেই একমত, উভয় পক্ষীয় ঐতিহাসিকগণ একই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্টীয়ানগণ বলেন, ক্রাইষ্ট তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবতার মূসা এবং অন্যান্য সমস্ত অবতারগণের শিক্ষা এবং উপদেশাবলী সম্পূর্ণ করিলেন; এবং যাঁহারা যীশুখৃষ্টকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন, তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সমাজ-শৃঙ্খলাতে আঘাত করিবার অপরাধে অপরাধী, মৃত্যু তাঁহার উপযুক্ত শাস্তি।

যেমন বিজ্ঞানে, তেমনই ধর্ম্মে, সত্যের নিগূঢ়তম তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে মাত্র তাহারই নিকট, যে নিতান্ত দীনভাবে, অখণ্ড ভক্তি সহকারে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, যে সর্ব্বপ্রকার অন্ধ, যুক্তিহীন ধারণা

এবং কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, যে 'এই বহুমূল্যের একটি রত্ন' ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প। বাহাই আন্দোলনের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে অকপটচিত্তে, সত্যান্বেষণের পথে, সেই একটি মাত্র আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, সর্ব্বপ্রকার আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়া অধ্যবসায় সহকারে, ঈশ্বরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বাহাউল্লা'র ফলক-লিপিতে এবং অন্যান্য গ্রন্থে আমরা পথ নির্দ্দেশক ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইব, এই মহান্ আধ্যাত্মিক জাগরণের রহস্য উদ্ঘাটিত করিবার কৌশল সেখানেই লিপিবদ্ধ আছে এবং তাহা পাঠ করিয়াই আমরা বুঝিতে পারিব, ইহার মূল্য-নিরূপণ করিবার মানদণ্ড কি। কিন্তু এবিষয়েও একটি বিপত্তি এই যে, এই উপদেশাবলী আরবী এবং পারস্য ভাষাতে লিখিত এবং যে ব্যক্তি এই দুই ভাষা জানেন না, তাঁহার পক্ষে ঘোরতর অসুবিধা। এই গ্রন্থাবলীর অতি অল্প পরিমাণই ইংরাজিতে অনূদিত হইয়াছে, যাহা অনূদিত হইয়াছে, তাহারও অনুবাদ সম্বন্ধে নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা করিতে পারা যায় না, কারণ, ভাষা এবং যথাযথতা এই দুই দিক দিয়াই অনুবাদের যথেষ্ট অসঙ্গতি আছে। কিন্তু সে যাহাই হউক না কেন, সহস্র প্রকারের অসম্পূর্ণতা, ঐতিহাসিক বর্ণনার অযথাযথতা এবং অনুবাদের সহস্র দোষ সত্ত্বেও, ইহা বলিতে হইবে যে, এই ধর্ম্মের মূল সত্যগুলি বিরাট, দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত, এবং অনিশ্চয়তার ধূমরাশি ভেদ করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় দৃশ্যমান।

এই পুস্তকের উদ্দেশ্য

পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে নিন্দা-প্রশংসা-বর্জ্জিত নিরপেক্ষভাবে বাহাই ধর্ম্মের ইতিহাসের আবশ্যকীয় ঘটনাবলী এবং

বাহাই ধর্ম্মের উপদেশাবলী পাঠকবর্গের সম্মুখে এমন করিয়া উপস্থিত করিতে, যাহাতে তাঁহারা উহার গুরুত্ব সম্বন্ধে স্বকায় বিচার-বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করিতে পারেন্ এবং যাহাতে তাঁহারা নিজেদের জন্য গভীরতর-ভাবে সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

কিন্তু সত্যান্বেষণ যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন, ইহা মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইতে পারে না। সত্য-বস্তু প্রাণহীন নহে, যাহাকে আমরা প্রাপ্ত হইয়া যাদুঘরে লইয়া যাইতে পারি, এবং সেখানে যথারীতি তালিকাভুক্ত করিয়া, চিরকুট দিয়া শ্রেণী বিভাগ করিয়া দর্শককে দেখানের জন্য রাখিতে পারি,—যাহা অকেজো অনর্থক সেখানে পড়িয়া থাকিবে। ইহা জীবন্ত, প্রাণবান। মানব-চিত্ত-ক্ষেত্রে ইহা শিকড় বিস্তার করিয়া থাকে এবং মানবের সত্যান্বেষণের চরমতম পুরস্কার লাভের পূর্ব্বেই ইহজীবনে ফলবান হইয়া থাকে।

সুতরাং কোনো অবতারের প্রত্যাদেশবাণীর জ্ঞান প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে যে, যাঁহারা ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন তাঁহারা ইহার নীতি অবলম্বন করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইবেন এবং এই আনন্দ-বার্ত্তা সর্ব্বত্র ছড়াইবেন, যেন ঈশ্বরের অভিপ্রায় স্বর্গে যেমন উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে, তেমনই মর্ত্ত্যধামে উদ্‌যাপিত হইবার সেই শুভদিন শীঘ্রই সমাগত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আনন্দবার্ত্তাবাহক মহামানব বা'ব

"বল, সেই অত্যাচারী ব্যক্তি বিশ্ব-প্রিয়কে নিহত করিয়াছে, যেন সে এই প্রকারে ঈশ্বরের দিব্যালোক জন-সমাজে নির্ব্বাপিত করিতে পারে, যেন মানবকুলকে সর্ব্বশক্তিমান, করুণা-সাগর ঈশ্বরের দিনে স্বর্গীয় জীবন-প্রবাহ হইতে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হয়।"—(প্রধান মন্ত্রীর প্রতি বাহাউল্লা'র ফলকলিপি)

'বাহাই' ধর্ম্মের জন্মস্থান পারস্য পৃথিবীর ইতিহাসে আবহমান কাল ধরিয়া একটি অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পারস্য তাহার অতীত মহত্বের যুগে সমসাময়িক জাতি-সমাজের রাজ্ঞী ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কারণ, সভ্যতা, প্রতিপত্তি এবং বিভব, সর্ব্ব-বিষয়েই পারস্য অতুলনীয় ছিল। পারস্য পৃথিবীকে দিয়াছে রাজা ও রাজনৈতিক, কবি ও অবতার, দার্শনিক ও শিল্পী। জোরোয়াষ্টার, সাইরাস, দরিয়ুস, হাফিজ, ফিরদৌসী, সা'দি, ওমর খৈয়াম,—পারস্যের কয়েকটি মাত্র বিখ্যাত সন্তানের নাম এখানে করা হইল, এরূপ বহু নাম করা যাইতে পারে। পারস্যের কারিকরগণের শিল্প-নৈপুণ্য অনতিক্রম্য ছিল; পারস্যের কার্পেটের তুলনা ছিলনা; পারস্যের তরবারি অপরাজেয় ছিল এবং পারস্যের মৃৎপাত্রের কাজ জগদ্বিখ্যাত ছিল। সমগ্র প্রাচ্য-ভূখণ্ডে, পারস্যের অতীত মহত্বের নিদর্শন অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে।

কিন্তু অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে পারস্য শোচনীয় দুর্দ্দশার সর্ব্বনিম্নস্তরে পতিত হইয়াছিল। গৌরব চিরতরে অস্ত গিয়াছে, আর

ফিরিবে না, তদানীন্তনকালের অবস্থা দেখিয়া এইরূপই মনে হইত। শাসনতন্ত্র অশেষ দোষদুষ্ট, দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং রাজ-কোষ অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। পারস্যের শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন দুর্ব্বল, ব্যক্তিত্বহীন এবং অন্য কয়েকজন ছিলেন নিষ্ঠুর রাক্ষস-বিশেষ। ধর্ম্ম-যাজক পুরোহিত সম্প্রদায় কুসংস্কারান্ধ, এবং অতিশয় রক্ষণশীল ছিল; অন্য ধর্ম্ম-মতের প্রতি অতি মাত্রায় অসহিষ্ণুতাই ছিল তাহাদের বৈশিষ্ট। এক দিকে যেমন পুরোহিতগণ ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণচেতা ও অনুদার, সেইরূপ অন্যদিকে জন সাধারণ ছিল অজ্ঞ, মূর্খ ও দুর্নীতিগ্রস্ত। তাহারা অধিকাংশই "শিয়া"* সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান, কিন্তু জোরোয়াষ্ট্রীয়াণ, য়িহুদী, খৃষ্টীয়াণ প্রভৃতি নানা পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম ও মতাবলম্বী ব্যক্তিগণেরও দেশে অভাব ছিল না। সকলেই মৌখিক পরিচয়ে একেশ্বরবাদী ছিল বটে, সকলেই প্রকাশ করিত, তাহারা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদের উপদেশ মত জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া সাম্য, সমন্বয় ও মৈত্রীমূলক সামাজিক আচরণ করিয়া মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে চায়, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইত, তাহারা পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত ঘৃণা করে, পরস্পরের সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া চলে, প্রত্যেক মতাবলম্বীগণই অন্যমতের অনুসরণকারীদিগকে বলে 'অস্পৃশ্য', সারমেয় তুল্য বা নিরীশ্বরবাদী। পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ দেওয়া এবং পরস্পরকে 'শাপান্ত' বলারূপ চরিতার্থতা একান্ত অতিশয়ে পৌছিয়া

---

* মোহাম্মদের মৃত্যুর পর কিছু দিনের মধ্যেই ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীগণ দুইটি প্রধান দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহাদের নাম, 'শিয়া' ও 'সুন্নি' সম্প্রদায়। 'শিয়া' সম্প্রদায় বলিয়া থাকে, মোহাম্মদের জামাতা 'আলীই' ন্যায়ধর্ম্মতঃ মোহাম্মদের প্রথম উত্তরাধিকারী, এবং তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণই খলিফা পদের একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী।

ছিল। বৃষ্টির দিনে য়িহুদী কি জোরোয়াষ্ট্রীয়াণের পক্ষে পথ চলা অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল ছিল, কারণ, তাহার ভিজা পোষাকের কোনো অংশ কোনো মুসলমানের গায়ে লাগিলে, মুসলমান অপবিত্র হইয়াছে বলিয়া মনে করিত এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত অপরকে জীবন দান করিয়া করাও হয়ত বিচিত্র ছিল না। য়িহুদী কি জোরোয়াষ্ট্রীয়াণ, কি খৃষ্টিয়াণের নিকট হইতে কোনো মুসলমান টাকা লইলে, সে তাহা জল দিয়া শোধন না করিয়া পকেটে পূরিত না। যদি কোনো য়িহুদী দেখিত, তাহার পুত্র কোনো তৃষ্ণার্ত্ত মুসলমান ভিক্ষুককে এক গ্লাস জল দিতেছে, সে তাহা বালকের হাত হইতে লইয়া নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিত, কারণ, বিধর্ম্মী মুসলমানের অদৃষ্টে য়িহুদীর নিকট হইতে অভিশাপ ব্যতীত অন্য কিছু জুটিলে য়িহুদী প্রত্যবায়-ভাগী হইবে এইরূপ সংস্কার বদ্ধমূল ছিল। মুসলমানদের মধ্যেও নানা দল, ও নানা মতবাদ প্রচলিত ছিল; তাহাদের মধ্যে কলহ, বাদ-বিসম্বাদ প্রভৃতি অতি ভয়াবহ, হিংস্ররূপ অনেক সময়েই ধারণ করিত। জোরোয়াষ্ট্রীয়াণগণ এই সমস্ত কলহে যোগ দিত না বটে, কিন্তু তাহারা তাহাদের সাম্প্রদায়িক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অন্য কাহারও সহিত মিশিত না এবং অন্য মতাবলম্বী স্বদেশবাসিগণ হইতে পৃথক হইয়া দূরে অবস্থান করিত।

সমাজ এবং ধর্ম্ম, উভয় বিষয়েই রীতি-নীতি এতদূর কলঙ্কপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, যে তাহাতে কেবল মাত্র অপরিসীম নৈরাশ্যেরই উদ্রেক হইত। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সর্ব্বসাধারণের ঔদাসীন্য থাকায়, তাহার অবনতি ঘটিয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং শিল্পের প্রতি সাধারণ্যের মনোভাব ছিল এই যে তাহা প্রকৃত ধর্ম্মের পরিপন্থী এবং অস্পৃশ্য। ন্যায়পরতা এবং সদাচারকে উপহাস করা হইত প্রকাশ্যে, রাজশাসন বা সমাজ-শাসনে, কুত্রাপি ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় মিলিত না। দেশের

আভ্যন্তরীণ অবস্থা অশান্তিময় ছিল, দস্যুগণের উপদ্রব সাধারণ ঘটনার মধ্যেই পরিগণিত হইত, প্রাত্যহিক ব্যাপারে যেমন কেহ বিস্মিত হয় না, তেমনই দস্যুগণের বর্ব্বরতা ও উপদ্রবের কাহিনীও এত সাধারণ হইয়া গিয়াছিল, যে তাহাতে কেহ বিস্মিত হইত না। রাজপথের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় এবং তাহাতে ভ্রমণ করা ভ্রাম্যমানের পক্ষে ছিল বিপজ্জনক। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ছিল অজস্রদোষে পরিপূর্ণ এবং ভয়াবহ। দেশের এইরূপ অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও পারস্যে আধ্যাত্মিক জীবনের ধারা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই; চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত পার্থিবতা ও কুসংস্কারের মধ্যেও ইতস্ততঃ দুই, একটি সাধু মহাপুরুষ মিলিত, দু'টি একটি মানুষের মনে হয়ত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার আগ্রহ লুক্কায়িত, কিন্তু জাগ্রত, তখনও ছিল। যীশুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে যেমন এন্না এবং সাইমিয়নের হৃদয়ে মহাপুরুষের আবির্ভাবের পূর্ব্বপ্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছিল, সেইরূপ পারস্যেও হয়ত কোনো কোনো ব্যক্তির মনে মহাপুরুষের আগমন-বার্ত্তার আভাস ধরা পড়িয়াছিল। অনেকেই ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনের আশায় নিঃসংশয়মনে প্রতীক্ষা করিতেছিল; তাহাদের বিশ্বাস ছিল, মহামানবের সমাগম-ক্ষণ আসন্ন হইয়াছে। পারস্য-দেশের অবস্থা এইরূপ, এমন সময় নবযুগের বাণী বিঘোষিত করিয়া হজরত বা'ব আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহার মন্ত্রে সমস্ত দেশে একটি নূতন সাড়া, একটি নূতন অনুভূতির চঞ্চল স্পন্দন জাগাইয়া তুলিলেন।

শৈশব ও যৌবন

আলী মোহাম্মদ, যিনি পরে 'বা'ব' (অর্থাৎ, প্রবেশ-পথ) উপাধি গ্রহণ করেন, দক্ষিণ পারস্যের সিরাজ নগরীতে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের

২০শে অক্টোবর, অর্থাৎ ১২৩৫ হিজরীর মোহরম মাসের পহেলা তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সৈয়দ কুলোদ্ভূত ছিলেন, অর্থাৎ পয়গাম্বর হজরত মোহাম্মদের বংশধর ছিলেন। তাঁহার পিতা, একজন সঙ্গতিপন্ন, সর্ব্বজন-পরিচিত সওদাগর, তাঁহার জন্মের কিছুকাল পরেই দেহত্যাগ করেন। তিনি তখন তাঁহার মাতুলের যত্নে লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন; তাঁহার মাতুলও একজন সওদাগর ছিলেন। শৈশবে তিনি লিখন-পঠন শিক্ষা করেন এবং সুকুমারমতি বালকদের উপযোগী দেশ-প্রথা অনুযায়ী বিদ্যা অভ্যাস করেন। তাঁহার বয়স যখন পঞ্চদশ বৎসর তখন তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন; ব্যবসায় ক্ষেত্রে, প্রথমে তাঁহার সেই মাতুল যাঁহার যত্নে তিনি লালিত পালিত হইয়াছিলেন, পরে তাঁহার অপর একজন মাতুল যিনি পারস্যোপসাগরের তীরে বুশায়ার নগরে বাস করিতেন, তাঁহার পরিচালক ছিলেন।

যৌবনে তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য সকলেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকৃষ্ট করিত এবং তাঁহার মধুর আচরণে এবং অনন্য-সাধারণ চরিত্র-মাহাত্ম্যে এবং ধর্ম্ম-পরায়ণতায় তাঁহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। প্রার্থনা, উপবাস প্রভৃতি মুসলমান ধর্ম্মের বিধিবদ্ধ নিয়মের যথাযথভাবে পালনকার্য্যে তাঁহার কখনও ঔদাসীন্য ছিল না; তিনি পয়গাম্বর হজরত মোহাম্মদের বাণীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারে জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিতেন, শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার জন্য সততই যত্নবান্ থাকিতেন। যখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর, তখন তিনি বিবাহ করিলেন। এই বিবাহের ফলে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু বা'বের ধর্ম্মযাজকতার প্রথম বৎসরে, নিতান্ত শৈশবেই, এই শিশু-পুত্রটি মারা যায়।

ঘোষণা

পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে, তিনি ঈশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে ঘোষণা করিলেন যে "মহতো মহীয়ান্ জগদীশ্বর তাঁহাকে 'বাবত্ব' পদবীতে উন্নীত করিয়াছেন।" "পথিকের কাহিনী" নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৩) আমরা নিম্নলিখিত কথাগুলি পাই ঃ—

" 'বা'ব' পদবী দ্বারা তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন এই, যে, তিনি একজন মহান্ত পুরুষের প্রবহমান করুণার পথ বা প্রণালীবিশেষ, যিনি এখনও প্রভামণ্ডলের যবনিকা অন্তরালে লুক্কায়িত, যিনি অপ্রমেয় এবং অপরিমিত বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী : তিনি সেই মহান্ত পুরুষের ইঙ্গিতক্রমে জীবনপথে বিচরণ করিতেন এবং তাঁহার প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতেন।"

স্বর্গীয় দূতের আবির্ভাবের সময় একান্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এ বিশ্বাস তদানীন্তন কালে বিশেষরূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল 'সায়খি' নামক এক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ; এবং এই 'সায়খি' সম্প্রদায়ের একজন প্রধান পুরোহিত মোল্লা হোসেন বুশ্রুই মহোদয়ের নিকটেই বা'ব প্রথম তাঁহার আবির্ভাবের বার্ত্তা এবং আবির্ভাবের উদ্দেশ্য প্রকাশিত করেন। ঠিক কোন্ মুহূর্ত্তে এবং কোন্ তারিখে বা'ব তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তাহা বা'বের 'বয়াণ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সেখানে আছে যে ১২৬০ হিজরীর জমাদিয়ল-আউওয়াল মাসের পঞ্চম দিনে, অর্থাৎ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখে, সূর্য্যাস্তের দুই ঘণ্টা পনর মিনিট পরে, বা'ব ঐ পূর্ব্বোক্ত মোল্লার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন।

কিছুদিন গভীর ভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব অনুসন্ধান, চিন্তা ও ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ করিয়া মোল্লা হোসেনের নিঃসংশয়রূপে বিশ্বাস জন্মিল যে শিয়াগণ যে

প্রতিশ্রুত পুরুষের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, তিনি বাস্তবিকই সমাগত হইয়াছেন। এই আবিষ্কারজনিত তাঁহার যে বিপুল আনন্দ এবং প্রেরণা, তাঁহার বন্ধুগণও তাহাতে অনুপ্রাণিত হইলেন, তাঁহারাও বা'বকে স্বীকার করিয়া লইলেন। অনতিবিলম্বেই 'সায়খি' সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তি বা'বের ঐশ্বরিক দৌত্য স্বীকার করিয়া লইলেন; তাঁহাদের নাম হইল 'বা'বী' বা বা'বভক্ত। এইরূপে তরুণ অবতারের মাহাত্ম্য, খ্যাতি বনবহ্নির মতো সমগ্র দেশে দ্রুত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

বা'বী আন্দোলনের উন্নতি ও অগ্রগতি

বা'বের শিষ্য সর্ব্ব প্রথমে যাঁহারা হইলেন, তাঁহাদের সংখ্যা ১৮। এই অষ্টাদশজন শিষ্য এবং তিনি স্বয়ং, ইঁহারা 'জীবন্ত অক্ষর' নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা বিঘোষিত করিবার জন্য তিনি তাঁহার এই অষ্টাদশ শিষ্যকে পারস্য এবং তুর্কিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। তিনি স্বয়ং মক্কা অভিমুখে তীর্থযাত্রা করিলেন এবং সেখানে পৌঁছিলেন, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। সেখানে, মুসলমান জগতের বিভিন্ন অংশ হইতে সমাগত, সমবেত অগণন তীর্থ যাত্রীগণের সম্মুখে তিনি প্রকাশ্যে তাঁহার আবির্ভাবের বার্ত্তা এবং আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বিঘোষিত করিলেন।

তৎপর তিনি বুশায়ার নগরে প্রত্যাগমন করিলেন, ইহাতে এক বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। তাঁহার বাগ্মিতার তেজ, তাঁহার লেখনীর অদ্ভুত প্রভাব, দ্রুত রচনাশক্তি এবং ওজোগর্ভতা, তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য, সংস্কারকরূপে তাঁহার সাহস এবং প্রচণ্ড প্রেরণা, তাঁহার মতানুবর্ত্তীদের মধ্যে বিপুল কর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করিল বটে,

ক্রিয়াশ্রয় আশ্রম-মৌড়ী. হাওড়া

কিন্তু অপর পক্ষে তেমনই গোঁড়া মুসলমানদের মধ্যে ভয় এবং শত্রুভাব সঞ্চারিত করিল।

শিয়া ধর্ম্মাচার্য্যগণ তীব্র ভাষায় তাঁহাকে নিন্দা করিল এবং হোসেন খাঁ নামক বিচার বুদ্ধিহীন, অন্ধবিশ্বাসী এবং অতিশয় অত্যাচারী 'ফার্স'এর শাসনকর্ত্তাকে নানা উপায়ে সম্মত করিল, এই নবধর্ম্মকে ধ্বংস করিতে। ইহার ফলে বা'ব বহুবার শৃঙ্খলিত, নির্যাতিত, কারাগারে অবরুদ্ধ, দেশান্তরিত হ'ন, তাঁহাকে বিচারালয়ে পরীক্ষিত হইতে হয়, অশেষ প্রকারের শারীরিক যাতনা ও অসম্মান সহ্য করিতে হয়; পরিশেষে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আত্মোৎসর্গ তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারের পার্থিব যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দেয়।

বা'বের দাবী

তারপর, তরুণ সংস্কারক বা'ব যখন ঘোষণা করিলেন যে হজরত মোহাম্মদ যে মেহদীর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তিনিই সেই মেহদী, তখন বাবে'র বিরুদ্ধে প্রতিকূলতা এবং বিরুদ্ধাচরণ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। শিয়াগণের বিশ্বাস ছিল, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লোকসমাজ হইতে সহসা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন যে দ্বাদশ ইমাম, তিনিই সেই হজরত মোহাম্মদ-প্রতিশ্রুত ইমাম মেহদী*। তাহারা মনে করিত, তিনি

* শিয়াগণের বিশ্বাস অনুসারে, ঈশ্বরের বিধান মতে নিযুক্ত, পয়গাম্বর হজরত মোহাম্মদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিই ইমাম, যাঁহার আদেশ বিশ্বাসী-গণের সকলকেই মান্য করিতে হইবে। হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর দ্বাদশজন ব্যক্তি ইমামের পদে পর পর অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার খুড়তুত ভাই, জামাতা হজরত আলীই প্রথম ইমাম। শিয়াগণ দ্বাদশ

তখনও জীবিত ছিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় সশরীরে পুনরায় আবির্ভূত হইবেন; যীশুখৃষ্টের সম-সাময়িক য়িহুদীরা যেরূপ 'মসীহ'এর আগমন-বার্ত্তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলির আক্ষরিক ব্যাখ্যা করিত, সেইরূপ 'শিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরাও মেহদীর আবির্ভাব, তাঁহার রাজৈশ্বর্য্য, তাঁহার বিজয়-গৌরব, তাঁহার আবির্ভাবের অভিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তাহার পার্থিব ব্যাখ্যা করিত। তাহারা আশা করিত, তিনি পার্থিব রাজা বা সম্রাটরূপে প্রকটিত হইবেন, তাঁহার সেনা-বাহিনী থাকিবে, তিনি তাঁহার আগমন-বার্ত্তা ক্ষত্রজনোচিত স্পর্দ্ধার সহিত অভিব্যক্ত, বিঘোষিত করিবেন, তিনি মৃত ব্যক্তিকে সমাধি হইতে উত্তোলন করিয়া জীবন দান করিবেন এবং তদ্রূপ নানা অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত করিয়া স্বকীয় মহিমা প্রচারিত করিবেন। যখন তাহাদের প্রত্যাশিত এই সমস্ত ঘটনার একটিও ঘটিল না, তখন য়িহুদীগণ যীশুকে যেরূপ দারুণ অবজ্ঞা ভরে পরিত্যাগ করিয়াছিল, শিয়াগণও বা'বকে সেইরূপ অনাদর সহকারে প্রত্যাখ্যান করিল।

অপর পক্ষে বা'বীগণ পূর্ব্ববর্ত্তী ভবিষ্যদ্বাণীগুলির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিত; তাহারা শিয়াগণের ন্যায় মাত্র আক্ষরিক ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট থাকিত না। তাহারা বুঝিত, পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির অনেকটি রূপকের আকারে উচ্চারিত। তাহারা মনে করিত, প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ বা'বের রাজত্ব অপর একজন প্রতিশ্রুত মহামানব যীশুখৃষ্টের রাজত্বের

ইমামকেই ইমাম্ মেহদী বলিত। তাহাদের মতানুসারে,—তিনি মরেন নাই, ভূগর্ভের গুপ্তপথে অদৃশ্য হইয়াছেন (৩২৯ হিজরী), এবং সময় পূর্ণ হইলে আবির্ভূত হইবেন, অবিশ্বাসীগণকে ধ্বংস করিবেন, সুখশান্তির যুগ প্রবর্ত্তিত করিবেন।

মতই আধ্যাত্মিক; অধ্যাত্মদেশে গ্যালিলীবাসী 'শোক-ক্লিষ্ট মহামানব' যীশুখৃষ্টের মতই বা'বেরও প্রতাপ অপ্রতিহত; কিন্তু তাহার সঙ্গে পার্থিব রাজত্বের কোনও সম্বন্ধ নাই। তাহারা বিশ্বাস করিত, বা'বের ঐশ্বর্য্য পার্থিব বস্তু নহে, প্রতিশ্রুত মেহদীর ঐশ্বর্য্যও পার্থিব নহে। তাহারা বুঝিত, মেহদী সম্বন্ধে যে বলা হইয়াছিল যে তিনি রাজত্ব করিবেন, তাহার অর্থ ইহা নহে যে তিনি নগর, গ্রাম বা রাজত্ব জয় করিবেন, তাহার অর্থ এই যে তিনি সমগ্র মানবকুলের চিত্তদেশ জয় করিয়া সেখানে তাঁহার অমর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সুতরাং তাহারা এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হইল, বা'বের অসামান্য জীবনীতে, তাঁহার অপূর্ব্ব উপদেশাবলীতে; তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস, তাঁহার অপরাজেয় সত্য-সন্ধতা দেখিয়া তাহারা স্বভাবতঃ অসংশয় মনে বিশ্বাস করিয়া লইল, বা'বই সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ মেহদী। বিশেষতঃ যখন তাহারা দেখিতে পাইল, যাহারা ভ্রান্তি ও অজ্ঞতার গর্ত্তে অন্ধের মত পড়িয়া রহিয়াছিল বা'ব তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক নবজীবনে উদ্বুদ্ধ করিয়া পরিচালিত করিতেছেন, তখন তাহাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিবারও কারণ বিলুপ্ত হইল।

বা'ব এইখানেই নিবৃত্ত হইলেন না; তিনি নিজেকে মেহদী বলিয়া ত ঘোষণা করিলেনই, তিনি আরও বলিলেন, যে তিনিই সেই 'আদিবিন্দু' এবং এই মর্ম্মে তিনি 'নোকতিয়ে-উলা' উপাধি গ্রহণ করিলেন। মোহাম্মদের শিষ্যগণ হজরতের সম্বন্ধে এই উপাধি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত ছিল; তাহারা মনে করিত, হজরত মোহাম্মদই একমাত্র 'আদিবিন্দু' এবং সকলেই, এমন কি ইমামগণ পর্য্যন্ত সেই 'আদিবিন্দু'র অধীন, যাঁহার নিকট হইতে তাহারা আপনাদের উপজীব্য, প্রেরণা ও প্রভাব সংগ্রহ করিত। সুতরাং বা'ব যখন এই উপাধি গ্রহণ

করিলেন, তখন তিনি হজরত মোহাম্মদ প্রভৃতি জগৎপূজ্য মহাপুরুষ, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের সঙ্গে এক পংক্তিভূত বলিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিলেন, এই কারণে শিয়াগণ তাঁহাকে প্রবঞ্চক মনে করিল, যেমন মূসা এবং যীশুখৃষ্টকে প্রবঞ্চক মনে করা হইয়াছিল। এমন কি, বা'ব এই সময়েই এক নব-পঞ্জিকা প্রবর্ত্তন করিলেন, বর্ষ গণনার এক নূতনক্রম উদ্ভাবিত করিয়া ঘোষণা করিলেন, যে তাঁহার আবির্ভাব ঘোষণার বৎসর হইতেই পরবর্ত্তী সমস্ত বৎসর গণনা করা হইবে; তিনি সৌরবর্ষ পুনরায় প্রচলিত করিলেন।

নির্য্যাতনের আতিশয্য-বৃদ্ধি

বা'বের এই সমস্ত ঘোষণার ফলে, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, অপণ্ডিত, নানা শ্রেণীর বহু সংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহার দীক্ষায় দীক্ষিত হইতে লাগিল, দ্রুতগতিতে তাঁহার ধর্ম্মমত চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে বা'বের শত্রুপক্ষ সন্ত্রস্ত, উচ্চকিত হইয়া উঠিল এবং সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টিত হইল। বা'বধর্ম্মাবলম্বীদের গৃহ বিধ্বস্ত ও দগ্ধ করা হইতে লাগিল, তাহাদের অন্তঃপুরিকাদিগকে হরণ করা হইতে লাগিল। তেহেরাণ, ফার্স, মাজিন্দরাণ প্রভৃতি স্থানে বহু সংখ্যক বা'বধর্ম্মাবলম্বী নিহত হইল। অনেকের শিরচ্ছেদ করা হইল, অনেককে উদ্বন্ধন দ্বারা হত্যা করা হইল, অনেককে কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইল, অনেককে জীবন্ত দগ্ধ করা হইল, আবার অনেককে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হইল। কিন্তু এই সমস্ত ঘোরতর নির্যাতন সত্ত্বেও বা'ব-ধর্ম্মের আন্দোলন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বরং, এই সমস্ত অত্যাচার,

নির্য্যাতনের কারণেই বিশ্বাসীগণের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে লাগিল, মেহদী সম্বন্ধে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পুরাকালে করা হইয়াছিল, এই সমস্ত অত্যাচারের মাঝ দিয়াই যেন সেই সমস্ত বাণী অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইয়া উঠিল। জাবের কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ একটি প্রাচীন প্রবাদ-বাক্যে (হাদিছে) আমরা নিম্নোল্লিখিত কথা পাঠ করি। শিয়াগণ এই হাদিছের প্রতি সমধিক আস্থাসম্পন্ন ছিল।

"তাঁহার মাঝ দিয়া একাধারে অভিব্যক্ত হইবে মুসার পরিপূর্ণতা, যীশুর দুর্লভ চরিত্র-মাহাত্ম্য এবং জ'বের (আয়ুবের) সহিষ্ণুতা। তাঁহার সময়ে তাঁহার সিদ্ধপুরুষগণ লাঞ্ছিত হইবেন, তাঁহাদের শিরচ্ছেদ করা হইবে এবং তাঁহাদের মুণ্ড লইয়া উপহারের মত আদান-প্রদান চলিবে, যেমন তুর্ক ও দায়লমগণের মুণ্ড উপহার স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাঁহাদিগকে অগ্নিমুখে সমর্পণ করা হইবে, তাঁহাদিগকে অস্ত্রের আঘাতে বিখণ্ডিত করা হইবে; তাঁহারা সন্ত্রস্ত, ভীত, নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িবেন; ধরণী তাঁহাদের রক্তে রঞ্জিত হইবে, নারীকুলের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া যাইবে। যাঁহারা এই নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত হইবেন, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে আমার সিদ্ধপুরুষ।"—বা'বের নূতন ইতিহাস, প্রফেসার ই, জি, ব্রাউন কর্ত্তৃক অনূদিত, পৃঃ ১৩২)

বা'বের আত্মোৎসর্গ বা শাহাদত্

খৃষ্টাব্দ ১৮৫০এর ৯ই জুলাই তারিখে, একত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে বা'ব স্বয়ং তাঁহার অত্যাচারী শত্রুগণের হিংস্রধর্ম্মান্ধতার বেদীমূলে আত্মদান করিলেন। তেব্রিজ নগরের প্রাচীন সৈনিক-নিবাসের মধ্যস্থিত চত্বরে বধ্যভূমিতে যে বেদী রচিত হইত, তাহাতে আনা হইল তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গে আসিল একজন নিবেদিত-জীবন, বীর অনুচর আকা

মোহাম্মদ আলী; মোহাম্মদ আলী বহু অনুনয় বিনয় সহকারে আত্মোৎসর্গ করিবার গৌরবময় অধিকার কামনা করিয়াছিল। মধ্যাহ্নের প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে উভয় ব্যক্তিকে রজ্জুসহকারে বিলম্বিত করা হইল, এমন ভাবে, যাহাতে মোহাম্মদ আলীর মস্তক তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়প্রভু বা'বের বক্ষের উপর আসিয়া পড়ে। এক রেজিমেণ্ট আর্ম্মানী সৈন্য সম্মুখে আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল; তাহাদিগকে গুলি করিবার আদেশ দেওয়া হইল। গুলি চলিল, ধূমরাশিতে স্থানটি আচ্ছন্ন হইয়া গেল; ধূম অপসারিত হইলে দেখা গেল, বা'ব এবং তাঁহার অনুচর তখনও জীবিত, অনাহত আছেন। গুলি তাঁহাদের বন্ধন-রজ্জু ভেদ করিয়া গিয়াছিল এবং রজ্জু নষ্ট হইতেই বা'ব ও তাঁহার অনুচর ভূমির উপর পতিত হইলেন। তাঁহারা নিকটের একটি কক্ষে গিয়া তাঁহাদের এক জন বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নকালে তাঁহাদিগকে পুনরায় রজ্জু-সংযোগে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু আর্ম্মানী সৈন্যগণ পূর্ব্বঘটনা হইতে মনে করিল, তাঁহারা অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন, এবং পুনরায় গুলি করিতে আপত্তি জানাইল। সুতরাং সেই সৈন্যদল বিদায় দিয়া আর এক দল সৈন্য আনা হইল; তাহাদিগকে আদেশ দেওয়া হইলে তাহারা যথারীতি গুলি করিল। এইবার গুলিবর্ষণ সফল হইল; উভয় ব্যক্তির দেহ অগণন গুলিতে বিদ্ধ হইয়া ভয়াবহরূপ ধারণ করিল, কিন্তু একটি গুলিও তাঁহাদের মুখমণ্ডল স্পর্শ করিল না, মুখমণ্ডল পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিকই রহিল।

যীশুখৃষ্টের বধ্য-ভূমি কাল্‌ভ্যারির ন্যায় তেব্‌রিজের সৈনিকাবাসের চত্বর এই ভয়াবহ হত্যা-কাণ্ডের ফলে পুণ্যস্থানে পরিণত হইল। বা'বের শত্রুগণ ক্ষণতরে বিজয়পুলকে পুলকিত হইয়া উঠিল, তাহারা মনে করিল, বাবাধর্ম্মরূপ বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইল এবং বা'বী ধর্ম্মের

সম্পূর্ণ অপসারণ অতি সহজ হইবে; কিন্তু তাহারা যে একটি ঘোরতর অপরাধ দ্বারা ইহা সংঘটিত করিয়াছিল, ইহা তাহারা বিস্মৃত হইতে পারিল না এবং তাহাদের বিপুল পুলকের মধ্যেও এই অপরাধ-বোধ লুক্কায়িত ছিল। তাহাদের উল্লাসও ক্ষণস্থায়ী হইল। তাহারা পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই যে সত্যের বনস্পতি কোনো পার্থিব কুঠারের আঘাতেই নিপাতিত হইতে পারে না। যদিও তাহারা পূর্ব্বে ইহা বুঝিতে পারে নাই, এই হত্যাকাণ্ডের ফলেই বা'বী ধর্ম্মের প্রসার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বা'বের আত্মোৎসর্গে তাঁহার প্রিয় বাসনা পূর্ণ হইল এবং ইহা তাঁহার অনুগামীগণকে এক নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিল। তাহাদের আধ্যাত্মিক প্রেরণা এতই বলবতী হইল যে অত্যাচার-নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া উহা বায়ুতাড়িত বহ্নির ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অত্যাচার, নির্য্যাতনের পরিমাণ যেমন বর্দ্ধিত হইল, ধর্ম্মের অগ্নিও সেইরূপ প্রবল আকারে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

কার্ম্মেল পর্ব্বতে সমাধি

নগর-প্রাচীরের বাহিরে পরিখার তীরে বা'বের ও তাঁহার ভক্ত অনুচরের নশ্বর দেহ ফেলিয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয় দিনের মধ্যরাত্রে কয়েকজন বা'বধর্ম্মাবলম্বী সেই দেহ সংগ্রহ করিল; কয়েক বৎসর পারস্যের বিভিন্ন গোপন স্থানে সেই দেহ লুক্কায়িত থাকিবার পর, তাহা অবশেষে, বহুকষ্ট-বহুশ্রমসহকারে আনীত হইল 'পুণ্যভূমি প্যালেষ্টাইনে। সেখানেই, কার্ম্মেল পর্ব্বতের সানুদেশে, সুরম্য একটি স্থানে সেই দেহ সমাহিত করা হইল; তাহার অনতিদূরে 'ইলিজা'র গুহা, এবং তাহার কয়েক মাইলের মধ্যেই অবস্থিত বাহাউল্লা'র সমাধি; বাহাউল্লা' এই প্রদেশেই তাঁহার জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সহস্র

সহস্র তীর্থপর্য্যটক সমাগত হইয়া থাকেন, বাহাউল্লা'র পবিত্র সমাধি মন্দিরে প্রণতি এবং ভক্তি জ্ঞাপন করিতে; তাঁহারা বাহাউল্লা'র অগ্রগামী দূত এবং তাঁহার অনুরক্ত প্রেমিক বা'বের সমাধি মন্দিরেও ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিতে বিস্মৃত হয়েন না।*

বা'বের বাক্যাবলী

বা'বের বাক্যাবলী বহুপৃষ্ঠাব্যাপী; পূর্ব্বে অধ্যয়ন বা চিন্তা না করিয়া তিনি যেরূপ দ্রুতগতিতে প্রকাণ্ড গ্রন্থরাজি, টীকা-টিপ্পনী, গভীর অর্থপূর্ণ বিবৃতি ও সুন্দর ভাষায় অভিব্যক্ত প্রার্থনাবলী রচনা করিতে পারিতেন, তাহাতেই তাঁহার ঐশ্বরিক প্রেরণার পরিচয় সমধিক প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

"পথিকের কাহিনী" নামক পুস্তকে (পৃঃ ৫৪) তাঁহার বাক্যাবলীর সারাংশ এই বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে:—

"বা'বের রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে কয়েকখানি কোরাণের টীকা এবং কোরাণের শ্লোকের ব্যাখ্যা; কতকগুলি প্রার্থনা এবং পবিত্র বাক্যাবলীর প্রকৃত মর্ম্মার্থ উদ্ঘাটন; কতকগুলি, উপদেশ-বাক্য, নিষেধ-মূলক বিজ্ঞপ্তি, ঐশ্বরিক ঐক্যের নানাবিধ রূপ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, এবং ঐশ্বরিক প্রেরণার উপর নির্ভর করিবার প্রণালীর ব্যাখ্যা। কিন্তু তাঁহার সমস্ত বাক্যের মর্ম্মগত বিষয় এক; তাহা এই, যে তাঁহার একান্ত-

---

* বা'বের পবিত্র সমাধি-উদ্যানে আবদুল্‌বাহার পুণ্য বপুঃ সমাহিত করা হইয়াছে; ইহাতে তাহার সৌষ্ঠবশ্রী আরও অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। (৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

প্রার্থিত, একান্ত-কাম্য, হৃদয়ের নিধি, পরমসত্যস্বরূপ মহামানব, যিনি সহসা আবির্ভূত হইবেন, তাঁহারই প্রশংসাকীর্ত্তন ও জয়গান করাকেই মহামতি বা'ব্ তাঁহার একমাত্র লক্ষ্যস্বরূপ মনে করিতেন। তিনি নিজেকে মনে করিতেন, তিনি সেই মহামানবের আবির্ভাবের আনন্দ-বার্ত্তা প্রচারক, এবং তাঁহার নিজের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা সেই মহামানবের আবির্ভাবের জন্য পথসুগম করাতেই পর্য্যবসিত। রাত্রিদিন, ক্লান্তিশ্রান্তিহীনভাবে তিনি সেই মহামানবের প্রশংসা কীর্ত্তনে বিভোর থাকিতেন, এবং তাঁহার অনুগামীদিগকে সেই ভূমাস্বরূপ মহা-মানবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে বলিতেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর এক স্থানে তিনি বলিতেছেনঃ—'আমি মাত্র সেই প্রকাণ্ড, মহান্ গ্রন্থের একটি সামান্য অক্ষর, সেই সীমাহীন, অনন্ত সাগরের বুকে একটি শিশির-বিন্দু; তদপেক্ষা অধিক আমি আর কিছুই নই; যখন সেই মহামানব আবির্ভূত হইবেন, তখন আমার প্রকৃত স্বরূপ, আমার গূঢ়তত্ত্ব, রহস্য এবং বিজ্ঞপ্তি লোক সমাজে উপলব্ধ হইবে, তখন আমার এই ধর্ম্ম যাহা এখন ভ্রূণরূপে জগতে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা অস্তিত্ব ও উন্নতির বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া বর্দ্ধিত হইয়া নব পূর্ণসৃষ্টিতে পূর্ণতা লাভ করিবে, এবং 'শ্রেষ্ঠ শিল্পী, পরম স্রষ্টা ঈশ্বর ধন্য হউক' এই পবিত্র বাক্যের অনবদ্য শোভায় বিশোভিত হইবে।' * * এবং তাঁহার অনলে তিনি এতই উদ্দীপিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার প্রশংসাকীর্ত্তনই 'মাকু' দুর্গে তাঁহার অন্ধকার রজনীর প্রোজ্জ্বল বর্ত্তিকা হইয়াছিল, এবং তাঁহার পুণ্যস্মৃতিই 'চিহিরিক' কারাগারের দুঃখ-দুর্দ্দশায় তাঁহার অত্যুত্তম সঙ্গী হইয়াছিল। তাঁহার চিন্তাতেই তিনি আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করিতেন; তাঁহার প্রেমের মদিরা পানেই তিনি বিভোর থাকিতেন; তাঁহাকে স্মরণ করিয়াই তাঁহার হৃদয় স্বর্গীয় আনন্দে আপ্লুত হইত।"

সেই মহামানব যাঁহাকে ঈশ্বর 'প্রকাশ' করিবেন

জ'ন দি ব্যাপটিষ্টের মত বা'ব সর্ব্বদাই জোর করিয়া বলিতেন যে তিনি ভাবীকালের মহামানবের আনন্দবার্ত্তাবাহক, তাঁহার পথ প্রস্তুত করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। তিনি বলিতেন যে মানবীয় দেহে তিনি শীঘ্রই দেখা দিবেন, সত্য-স্বরূপ জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্য মানবের রূপ-পরিগ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে তাঁহার ভাস্বর জ্যোতিঃ বিকিরণ করিবেন। অতীব শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে তিনি বলিতেন যে, যে শুভদিনে সেই মহামানব আবির্ভূত হইবেন, সেদিন "যদি কেহ তাঁহার নিকট একটি শ্লোক শুনিয়া তাহা আবৃত্তি করে, সহস্রবার 'বয়ান' (বা'বের প্রকাশিত গ্রন্থ) আবৃত্তি করা অপেক্ষা তাহার ফল হইবে অধিক"।—(পথিকের কাহিনী, পৃঃ ৩৪৯)

আগামী মহামানবের পথ সুগম করিবার নিমিত্ত তিনি যে কোনো দুঃখ-কষ্ট-নির্য্যাতন ভোগ করিতে অতীব আনন্দের সহিত প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলিতেন, সেই মহাপুরুষই তাঁহার ঐশ্বরিক প্রেরণাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় এবং তাঁহার প্রেমের একমাত্র অধিকারী।

পুনরুত্থান, স্বর্গ ও নরক

"কেয়ামত" (অর্থাৎ পুনরুত্থান), পরমবিচারের দিন, স্বর্গ ও নরক ইত্যাদি বাক্যাবলীর ব্যাখ্যা হজরত বা'বের উপদেশাবলীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তিনি বলেন, "কেয়ামত" শব্দের তাৎপর্য্যার্থ সত্য-স্বরূপ অবতার-রবির পুনঃপ্রকাশ। "মৃতোত্থোলন" বাক্যের অর্থ এই যে, যাহারা অজ্ঞানতা, অনবধানতা এবং কামের

গর্ভে সমাধি লাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক জীবন দান করা। "পরমবিচারের দিন" বাক্যের অর্থ ঈশ্বরের নব অবতারের দিন,—যাঁহার ধর্ম্ম স্বীকার বা অস্বীকার করার দরুণ মেষকে ছাগল হইতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে, কেননা মেষকুল দয়াল মেষ-পালকের আহ্বান বুঝিতে পারে এবং তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকে,—অর্থাৎ মানবকুল বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। স্বর্গ ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রেমজনিত আনন্দ বই আর কিছু নহে। সেই জ্ঞান ও প্রেম ঈশ্বরের অবতারের মাঝ দিয়া সঞ্চারিত হয়, যাহার দ্বারা মানুষ আপন সামর্থ্যানুযায়ী পূর্ণতালাভ করে এবং মৃত্যুর পরে ঈশ্বরের রাজ্যে চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী হয়। নরক আর কিছুই নহে, মাত্র স্বর্গের বিপরীত অবস্থা, অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হওয়া, যাহার ফলে পূর্ণতালাভ অসাধ্য হয় এবং ঈশ্বরের চিরানুগ্রহ রুদ্ধ হইয়া যায়। তিনি নিশ্চিত করিয়া বলিতেন যে এই সমস্ত বাক্যের অর্থ ইহা হইতে স্বতন্ত্র অন্য কোনো প্রকৃত অর্থ হইতে পারে না। পার্থিব দেহের পুনরুত্থান এবং পার্থিব স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে যে ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত, তাহা অর্থহীন কল্পনা মাত্র। তিনি সকলকে উপদেশ দিয়া বলিতেন, মানব-জীবনের শেষ পরিণতি মৃত্যু নহে, মৃত্যুর পরও জীবন-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ ধারায় প্রবহমান, তাহার গতি বহুধা বিস্তৃত, পরম পরিণতি, পরিপূর্ণতার দিকে তাহার প্রয়াস অনন্তকালব্যাপী।

সামাজিক ও নৈতিক উপদেশাবলী

বা'ব তাঁহার বাক্যাবলীর মধ্য দিয়া তাঁহার অনুগামীগণকে উপদেশ দিতেছেন যে তাহাদের ভ্রাতৃভাব এবং সৌজন্যের জন্য তাহাদিগকে

প্রসিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় শিল্প-কলা প্রভৃতি চর্চ্চা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা সার্ব্বজনীন করিতে হইবে। এই নূতন, বিস্ময়কর যুগে নারীজাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। রাজস্ব হইতে, অর্থাৎ, সার্ব্বজনীন রাজকোষ হইতে দরিদ্রদিগের জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করা হইবে; ভিক্ষাবৃত্তি একেবারে বন্ধ হইবে। পানীয় স্বরূপ মাদক দ্রব্য ব্যবহারও সেরূপ একান্তভাবে নিষিদ্ধ।

পুরস্কার, তিরস্কার, অনুগ্রহ, নিগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবলমাত্র প্রেম-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কর্ত্তব্য বলিয়াই সমস্ত কর্ম্মে প্রযুক্ত হইতে হইবে; ইহাই বা'বীর লক্ষণ। তিনি 'বয়ান'এ বলিয়াছেন:—

"এমন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা ক'র, যদি আগুনই তোমার উপাসনার প্রতিদান হয়, তথাপি যেন ঈশ্বরোপাসনায় তোমার কোনো ব্যতিক্রম না ঘটে। যদি তুমি ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা কর, তাহা হইলে তাহা ত ঈশ্বরের পবিত্র সান্নিধ্যের উপযুক্ত নহে। * * * যদি স্বর্গের দিকে তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া থাকে এবং তুমি স্বর্গের আশায় ঈশ্বরের উপাসনা কর, তাহা হইলেও ঐ একই কথা; কারণ, তাহা হইলে তুমি সৃষ্টকে স্রষ্টার সহিত অংশীদার করিয়া ফেলিলে।"

বা'বের কষ্টভোগ ও জয়লাভ

বা'বের সমস্ত জীবন যে কী প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহা ঐ শেষোক্ত উদ্ধৃত বাণীতে প্রতীয়মান। ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা, ঈশ্বরানুরাগী হওয়া, ঈশ্বরের গুণাবলী প্রতিবিম্বিত করা এবং

ঈশ্বরের মহান্ প্রকাশের আসন্ন আবির্ভাবের জন্য পথ সুগম করা—এই সমস্তই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাঁহার পক্ষে জীবন ভয়শূন্য, মৃত্যু অমৃতময় ছিল, কেননা প্রেম ভয়কে অপসারিত করিয়াছিল এবং তিনি জীবনবিসর্জ্জনকে মনে করিতেন তাঁহার প্রিয়তমের শ্রীচরণে সর্ব্বস্ব-অর্পণ-জনিত পরমানন্দ।

কি আশ্চর্য্য! এই পবিত্র, পূত আত্মা, এই প্রেরণাপ্রাপ্ত আধ্যাত্মিক শিক্ষাদাতা, ঈশ্বর ও মানবকুলের ঐ একান্ত প্রেমিক পুরুষ তাঁহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাধ্যক্ষগণের দ্বারা এমতে ঘৃণিত এবং তাহাদের হস্তেই নিহত হইলেন! অবিবেচিত, এবং খেয়ালপূর্ণ কুসংস্কারের দ্বারা তাহাদের চক্ষু অন্ধ না হইয়া থাকিলে, তাহারা কথনই ঈশ্বরের এই পবিত্র প্রকাশের আলোক হইতে বঞ্চিত হইত না। পার্থিব মহত্ব কি মর্য্যাদা তাঁহার কিছুই ছিল না। পার্থিব সহায়সম্বল ত্যাগ করিবার এবং যাবতীয় প্রবল ও অত্যুগ্র বিঘ্নরাশিকে জয় করিবার শক্তি না থাকিলে কিরূপে আধ্যাত্মিক শক্তি ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য প্রমাণ করা যাইতে পারে? কোনো অবস্থায় নৈরাশ বা বিরক্ত না হইয়া, নিরন্তর অন্তরে ক্ষমাগুণ ও পরের মঙ্গল কামনাকে স্থান দিয়া, শেষ পর্য্যন্ত শান্ত ভাবে দুঃখ যন্ত্রণার মর্ম্মবিদারী ঘাত-প্রতিঘাত, শত্রুর অশ্রদ্ধা ও কপট বন্ধুগণের বিশ্বাস-ঘাতকতা অম্লানবদনে সহ্য করিবার ও তাহা অতিক্রম করিবার সামর্থ্য না থাকিলে, কিরূপে এই অবিশ্বাসী জগতে ঈশ্বরের প্রেমের প্রমাণ ও প্রচার সম্ভবপর হইতে পারে?

বা'ব চরম কষ্টভোগ করিয়াছিলেন এবং পরম জয়লাভ করিয়াছেন। সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাহাদের সর্ব্বস্ব এবং জীবন বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের অকৃত্রিম ভালবাসার প্রমাণ দিয়াছেন। মানুষের মন ও জীবনের উপরে বা'বের আধিপত্যে রাজা মহারাজাগণের ঈর্ষান্বিত

হওয়া কিছুই বিচিত্র ছিল না। অধিকন্তু, "ঈশ্বর যাঁহাকে প্রকাশ করিবেন", তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার অগ্রগামী দূত বা'বের সত্যতা সমর্থন করিয়াছেন, সেই ভক্তের একান্ত ভক্তিনিবেদন সাদরে তুলিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহার মহান্ প্রভা ও ঐশ্বর্য্যের অংশীদাররূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছন।

তৃতীয় অধ্যায়

বাহাউল্লা'

"হে প্রতীক্ষমান মানবকুল! তোমরা আর প্রতীক্ষায় থাকিও না, কারণ, তিনি সমাগত হইয়াছেন। ঐ দেখ, তাঁহার মন্দির, মন্দিরে দেখ তাঁহার 'বাহা' (প্রভা)। ইহাই শাশ্বত 'বাহা', নবপ্রকাশে প্রকাশিত।"—(বাহাউল্লা')

জন্ম ও জীবনের প্রথমাংশ

পরে যিনি বাহাউল্লা' (অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রভা) উপাধি গ্রহণ করিয়া সেই নামে জগতে পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম, মীর্জ্জা হোসেন আলী। তাঁহার পিতা উজীর বা রাজমন্ত্রী ছিলেন; তাঁহার পিতার নাম 'নুর'এর মীর্জ্জা আব্বাস। মীর্জ্জা হোসেন আলী পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। যে পরিবারে বাহাউল্লা' বা মীর্জ্জা হোসেন আলী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দেশে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ধনশালী ও অনন্য-সাধারণ বলিয়া পরিবারটি বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। সে পরিবারের অনেকেই রাজসরকারে উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, সামরিক ও অসামরিক নানা বিভাগে কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা প্রভূত যশ ও অর্থ অর্জ্জন

করিয়াছিলেন। পারস্যের রাজধানী তেহেরান নগরীতে, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর তারিখে অর্থাৎ ১২৩৩ হিজরীর মোহরম মাসের ২য় দিনে, প্রভাত ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্ত্তীকালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কখনও কোনো বিদ্যায়তনে বিদ্যা-শিক্ষার্থে গমন করেন নাই; দেশ-প্রথা অনুসারে চিরাভ্যস্ত বিদ্যাভ্যাস, তিনি সামান্যই করিয়াছিলেন; তাহাও নিজের পিত্রালয়ে। কিন্তু নিতান্ত শৈশবেই তিনি অসামান্য প্রতিভা ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। যৌবন অতিক্রান্ত না হইতেই তাঁহার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন ও তাঁহার ভ্রাতা-ভগ্নীদের জন্য দায়িত্ব-ভার ও বিপুলায়তন পারিবারিক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িল।

কোনো এক উপলক্ষ্যে বাহাউল্লা'র জ্যেষ্ঠ পুত্র, আব্দুল্‌বাহা বর্ত্তমান লেখকের নিকট, তাঁহার পিতার জীবনের প্রথমাংশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বলিয়াছিলেন:—

"শৈশব হইতেই তিনি অতিশয় দয়ালু ও উদারচেতা ছিলেন। তিনি গৃহকোণে অধিক সময় অতিবাহিত করা পছন্দ করিতেন না, তাঁহার সময়ের অধিকাংশ যাপিত হইত উদ্যানে বা প্রান্তরে। তাঁহার আকর্ষণী-শক্তি ছিল অত্যন্ত অধিক; যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, সেই তাহা অনুভব করিত। জনসাধারণ সর্ব্বদাই তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভিঁড় করিয়া থাকিত। মন্ত্রীগণ ও সভাসদবর্গ তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিতেন; বালকগণও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসর, তখনই তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। যে কোনো বিষয়ে তিনি কথোপকথন করিতে পারিতেন, তাঁহার সম্মুখে যে কোনো সমস্যা উপস্থিত করা হউক না কেন, তিনি তাহার সমাধান করিয়া দিতে পারিতেন। মহতী জন

সভাতে তিনি "উলেমা" (অর্থাৎ প্রসিদ্ধ মোল্লা)গণের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন এবং অতীব জটিল ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নের ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। তাহারা সকলেই মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শুনিত।"

"বাহাউল্লা'র বয়স যখন বাইশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল এবং পারস্য-রাজ্যের চিরাভ্যস্ত প্রথা-মত মৃত মন্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাউল্লা'কে পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, পারস্য-সরকার হইতে বাহাউল্লা'কে নিমন্ত্রণ করা হইল। কিন্তু বাহাউল্লা' সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। তখন, প্রধান মন্ত্রী বলিলেনঃ—'উহাকে আর বিরক্ত করিয়া কাজ নাই; মন্ত্রী-পদ নিশ্চয়ই উহার উপযুক্ত নহে; কারণ, উহার জীবনের উদ্দেশ্য বৃহত্তর, মহত্তর। আমি উহাকে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোনো উত্তুঙ্গ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উহার জীবন কোনো মহান্ সাধনা-পথে প্রযুক্ত হইবে; নিয়তি উহাকে সেই জন্যই সেইরূপে চালিত করিতেছে। আমাদের সকলের মত উহার চিন্তাধারা নহে; উহার চিন্তা-প্রণালী বিভিন্ন। উহাকে ইচ্ছামত থাকিতে দাও।"

বা'বী বলিয়া কারারুদ্ধ

মহামতি বা'ব যখন ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে স্বীয় অবতারত্ব ঘোষণা করিলেন, তখন মাত্র সাতাইশ বৎসরের যুবক বাহাউল্লা' নির্ভীকচিত্তে নূতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন; শীঘ্রই তিনি এই নব-ধর্ম্মের একজন শ্রেষ্ঠ, শক্তিমান্ ব্যাখ্যাতারূপে বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন।

ধর্ম্মমতের জন্য তিনি দুইবার কারাবরুদ্ধ এবং একবার লগুড় আঘাতে প্রহৃত হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর এমন একটি

ঘটনা ঘটিল, যাহা বা'বীদের পক্ষে ঘোরতর অশুভসূচক হইয়া দাঁড়াইল। এই ঘটনা, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সংঘটিত হইল। বা'বধর্ম্মাবলম্বী একটি যুবক (তাহার নাম ছাদিক) বা'বের প্রাণদণ্ড ও চরম আত্মোৎসর্গে এতই বিষণ্ণ ও আহত হইল যে তাহার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান লোপ পাইল, সে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার বিস্মৃত হইল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বা'বের বধ্যভূমিতে সে উপস্থিত ছিল এবং সে স্বচক্ষে সেই নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়াছিল। প্রাণাপেক্ষা প্রিয় প্রভুর হনন্-দৃশ্য দেখিয়া সে একান্ত ক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিশোধ-মানসে পারস্যের রাজাকে (যাঁহাকে "শাহ" বলা হইয়া থাকে) রাজ-পথে গুলি করিতে চেষ্টা করিল। গুলির পরিবর্ত্তে সে কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি সীসার বর্ত্তুল পিস্তলে পুরিয়া সে তাহাই শাহের দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিল। কয়েকটি গোলক শাহের গায়ে লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় নাই। যুবক ছাদিক শাহকে ঘোড়া হইতে টানিয়া নামাইয়াছিল; শাহের অনুচরবর্গ এবং পার্শ্বচরগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া সেইখানেই নিহত করিল। এই ঘটনার জন্য সমগ্র বা'বী সম্প্রদায়কেই অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা হইল। তাহাদের উপর ভয়ানক নিষ্ঠুর অত্যাচার আরম্ভ হইল। তরবারিমুখে দলে দলে বা'বীগণ প্রাণ হারাইতে লাগিল। তীব্রতম নির্য্যাতন সহকারে, তাহাদের আশী জনকে তেহেরাণ নগরে নিহত করা হইল। অনেককে বন্ধন করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল; ইহাদের মধ্যে বাহাউল্লা' একজন। তিনি পরে এসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"এই শোচনীয়, নিষ্ঠুর ঘটনার সঙ্গে আমাদের আদৌ কোনো সংস্রব ছিল না; আমাদের নির্দ্দোষিত্ব বিচারালয়ে অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল। অথচ, তাহারা আমাদিগকে গ্রেফতার করিয়া নিয়াবরাণ হইতে তেহেরাণে কারাগারে লইয়া আসিল। তখন

রাজা নিয়াবরাণে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আমাদিগকে পায়ে হাঁটিয়া আদ্যোপান্ত ঐ দীর্ঘ অতিক্রম করিতে হইল; শৃঙ্খল দিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া আসা হইল। একজন পশু-প্রকৃতি পুরুষ আমাদের সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে পাহারা দিতে দিতে আসিতেছিল; সে আমার মস্তক হইতে আমার টুপিটী ছিনাইয়া লইল; সুতরাং সমস্ত পথ খালি মাথায় আসা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। কয়েকজন ঘাতক ও ফর্‌রাস (অর্থাৎ প্রহরী) আমাদিগকে ছুটাইয়া লইয়া চলিল, তাহাতে বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। পরিশেষে, তাহারা আমাদিগকে এমন একটি স্থানে লইয়া আসিয়া চারি মাস কাল আবদ্ধ করিয়া রাখিল যে তাহার তুলনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ, সেইরূপ আর একটি স্থান আমি দেখি নাই। প্রকৃত পক্ষে এই অত্যাচারিত ব্যক্তি ও তাহার সঙ্গীগণকে যে স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, একটি অন্ধকারময়, সঙ্কীর্ণ কারাকক্ষও তদপেক্ষা অনেক ভাল।”

“যাত্রাশেষে পৌঁছিয়া আমরা কারাগারে প্রবেশ করিলাম। ঘোর, অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি পথে আমাদিগকে লইয়া চলিল, সেখান হইতে আমরা তিনটি খাড়া সিঁড়ি বাহিয়া নিম্নে অবতরণ করিলাম; সেইখানেই আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কারাকক্ষ। স্থানটি ভীষণ অন্ধকার ও সেখানকার অধিবাসী, যাহারা ছিল তাহাদের সংখ্যা ১৫০,—চোর, নরহন্তা ও ডাকাত। এই হিংস্র জনতায় পরিপূর্ণ স্থানে প্রবেশ-পথ মাত্র ঐ পূর্ব্ব বর্ণিত একটি; ঐটি ছাড়া অন্য পথ ছিল না। এই স্থানের বর্ণনা দিতে বা এখানকার তীব্র পূতিগন্ধের আভাস মাত্রও পাঠককে দিতে আমার লেখনী অক্ষম। এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশেরই পরিধেয় বস্ত্র ছিল না বা শয়ন করিবার মাদুর ছিল না। ঈশ্বর জানেন, আমরা এই ঘৃণ্য, অন্ধকারময় আবেষ্টনীর মধ্যে কি নরক-যন্ত্রণাই ভোগ করিয়াছিলাম!”

"এই কারাকক্ষে আমরা দিবারাত্রি চিন্তা করিতাম, বা'বীদের অবস্থা ও তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে; আমাদের বিস্ময়ের কারণ ঘটিত, যখন চিন্তা করিতাম, বা'বীদের স্বাভাবিক ঔদার্য্য, চিত্তের প্রসার, মহা-প্রাণতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে একজন কি করিয়া, দেশের রাজার জীবন-হানি করিবার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা করিতে পারে। তখন এই অন্যায়ভাবে অত্যাচারিত, নির্য্যাতিত ব্যক্তি নিশ্চয়তাসহকারে স্থির করিল যে, কারাগার হইতে বাহির হইয়া, আমি এই সমস্ত দুর্ব্বুদ্ধি-জর্জ্জরিত ব্যক্তিদের পুনরুজ্জীবনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

"একদা রাত্রিকালে, আমি স্বপ্নযোগে শুনিতে পাইলাম, চতুর্দ্দিক হইতে এই নিম্নলিখিত পুণ্যবাণী উচ্চারিত হইতেছে:—

'তুমি স্বকীয় শক্তি ও লেখনী দ্বারা জয়যুক্ত হইবে; আমরা তোমাকে সাহায্য করিব। তুমি বর্ত্তমান সময়ে যে দুরবস্থার মধ্যে কাল অতিবাহিত করিতেছ, তাহার জন্য দুঃখিত হইওনা; তাহার জন্য তোমার ভয়ের কোনো কারণ নাই। জগতের কোনো দুঃখকষ্ট, যাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, তুমি সেই মহাপুরুষগণের মধ্যে একজন, সুতরাং তুমি নিরাপদ। অনতিবিলম্বেই ঈশ্বর পৃথিবীর রত্নসমূহ প্রকটিত করিয়া উঠাইবেন, এবং তাহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহারা তোমাকে সাহায্য করিবে, তোমাকে আশ্রয় করিয়া এবং তোমার ঐ নাম অবলম্বন করিয়া,—যাহার দ্বারা 'যাহারা জানে' তাহাদের হৃদয়ে ঈশ্বর জীবন সঞ্চারিত করিয়াছেন।' "—(বৃক পুত্রের প্রতি ফলকলিপি, পৃঃ ২০—২২)

বগদাদে নির্ব্বাসন

এই ভীষণ কারাগারে কারাযন্ত্রণা ভোগ ৪ মাস কাল চলিল। কিন্তু বাহাউল্লা' ও তাঁহার সঙ্গীগণের উৎসাহ উদ্যম কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত

হইল না, বরঞ্চ তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অতীব প্রফুল্ল-চিত্তে তাঁহারা কারাগারে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। প্রায় প্রত্যহই তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন বা একাধিক বন্দী নির্য্যাতীত বা বধ্য-ভূমিতে নীত ও নিহত হইতে লাগিল; অবশিষ্ট বন্দীদের প্রতি ইহা স্মারকস্বরূপ ছিল, যে তাহাদের যে কাহারও পালা অব্যবহিত পরেই আসিতে পারে। ঘাতকগণ যখন বন্ধুদের মধ্য হইতে কাহাকেও লইবার জন্য আসিত, তখন যে ব্যক্তির ডাক পড়িত ও নাম উচ্চারিত হইত, সে বাস্তবিকই আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিত, শুভক্ষণ আসিয়াছে জানিয়া বাহাউল্লা'র হস্তচুম্বন করিয়া, অন্যান্য বন্ধুদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দে বিহ্বল, অধীর অবস্থায় দ্রুতগতিতে বধ্যভূমিতে আত্মোৎসর্গ করিতে যাইত।

নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ হইল যে বাহাউল্লা'র সঙ্গে শাহের জীবন-নাশের চেষ্টার কোনো সংস্রব ছিল না; রুশ-মন্ত্রী বাহাউল্লা'র চরিত্রের অকলঙ্ক পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিলেন। এতদ্ব্যতীত, বাহাউল্লা' এতই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন যে, অনেকে মনে করিল, তিনি বাঁচিবেন না। এই সমস্ত কারণে, শাহ, তাঁহাকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করিবার পরিবর্ত্তে, মেসোপোটেমিয়া দেশে ইরাকে-আরব নামক স্থানে নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রদান করিলেন। একপক্ষ কাল পরে বাহাউল্লা' তাঁহার পরিবারস্থিত ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য ঈশ্বরবিশ্বাসীগণের সমভিব্যাহারে সেই স্থান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শীতকালে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে তাঁহাদের কষ্টের অবধি রহিল না: পরিশেষে, যখন তাঁহারা বগ্‌দাদ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা সম্পূর্ণ নিঃস্ব।

বাহাউল্লা'র শরীর কিঞ্চিৎ সক্ষম হইতেই, তিনি শিশিক্ষু ব্যক্তি-গণকে বা'বধর্ম্মের প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ

করিলেন, এবং বিশ্বাসীগণকে উৎসাহদানে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইলেন। শীঘ্রই বা'ব-ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরুদ্বিগ্নতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে অর্থাৎ বা'বের ঘোষণার নয় বৎসর পরে এই অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল। এমতে নবম বৎসর সম্বন্ধে বা'বের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইল। কিন্তু ইহা অধিক কাল স্থায়ী হইল না। বাহাউল্লা'র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, মীর্জ্জা য়াহ্য়া (ইঁহাকে ছুব্‌হে-আ'জল্ নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে) বগ্‌দাদে আসিয়া গোপনে নানারূপ বিবাদ-বিসম্বাদের বীজ ছড়াইতে লাগিলেন; বা'ব-ধর্ম্মাবলম্বীগণ এই বিবাদ, বিসম্বাদের জন্য নানারূপ আভ্যন্তরীণ বিরোধে ও কলহে লিপ্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল; যীশুখৃষ্টের শিষ্যবর্গের মধ্যেও এরূপ হইয়াছিল। কিছুকাল পরে, আদ্রিয়ানোপল্‌এ এই কলহ অতি প্রবল আকার ধারণ করিয়া প্রকাশ্যে নানাবিধ উগ্র কার্য্যাবলীর কারণ হইয়াছিল। বাহাউল্লা'র নিকট এই সমস্ত বিবাদ বা উগ্র কলহ অতিশয় অপ্রিয় ছিল, কারণ, তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর সমগ্র অধিবাসী-বৃন্দের মধ্যে ঐক্য-সম্বন্ধ সৃষ্টি করা।

দুই বৎসর অরণ্য-বাস

বগ্‌দাদে আসিবার প্রায় ১ বৎসর পরে তিনি একাকী সুলায়্‌মানিয়ার অরণ্যে প্রবেশ করিলেন; তিনি, দুই প্রস্থ পরিধেয় পরিচ্ছদ ব্যতীত আর কিছুই সঙ্গে লইলেন না। এই সময় সম্বন্ধে তিনি "ইকান্ গ্রন্থে" এইরূপ বলিতেছেন :—

"বগ্‌দাদে পৌছিয়াই এই দীনহীন ভৃত্য কতকাংশে বুঝিতে পারিল, ভাবী ঘটনাগুলি কিরূপ হইবে; সেই জন্য আমরা নির্জ্জনতার মরুভূমিতে

প্রস্থান করিলাম, সেখানে একাকীত্বের অরণ্যে দুই বৎসর কাল যাপন করিলাম। চক্ষু হইতে বাষ্পধারা অবিরাম প্রবাহিত হইতেছিল, হৃদয়ে রক্ত-সাগর উদ্বেল হইতেছিল। অনাহারে অনেক রাত্রি কাটিয়াছে, অনেক দিন দেহ বিশ্রাম লাভ করে নাই। উপর্য্যুপরি এইরূপ বিপত্তি-পাত ও অশেষ দুঃখবর্ষণ সত্ত্বেও,—যাঁহার হস্তে আমাদের আত্মা ন্যস্ত, তাঁহারই পূণ্য নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমাদের আনন্দ ও হর্ষের কিঞ্চিন্মাত্রও লাঘব হইল না; আমরা পূর্ব্বের মতই আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন রহিলাম।"

"আমরা ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি যে আমাদের এই স্বেচ্ছাবৃত নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগমন করিবার অভিপ্রায় আদৌ ছিল না ও যাত্রাশেষে পুনর্মিলনের আশাও ছিল না। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদের মধ্যে বিরোধের বা কলহের কারণীভূত না হওয়া। বন্ধুগণের মধ্যে আমাদিগকে লইয়া যাহাতে বিসম্বাদের কারণ না ঘটে, আমাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া যাহাতে কাহারও প্রতি আঘাত না লাগে বা কাহারও মনঃকষ্টের কারণ না ঘটে, সেই জন্য আমরা নিজেকে অপসারিত করিয়াছিলাম। আমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের অভিরুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে আমাদের এই স্বেচ্ছাবৃত নির্ব্বাসনের কারণ স্থির করিয়া লইল ও নির্দ্দেশ করিতে লাগিল। অবশেষে, প্রত্যাগমন করিবার আদেশ নিঃসৃত হইল, সেই সর্ব্ব-আদেশের আকর ঈশ্বরের সকাশ হইতে; আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা শিরোধার্য্য করিয়া তদনুসারে প্রত্যাগমন করিলাম। আমাদের প্রত্যাগমনের পর কি ঘটিয়াছিল, তাহা লেখনীর সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব; দুই বৎসর ধরিয়া শত্রুগণ এই দীনহীন ভৃত্যকে ধ্বংস করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল, ইহা সকলেই জানেন।"

মোল্লাগণের বিরুদ্ধাচরণ

অরণ্য-বাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, বাহাউল্লা'র যশ পূর্ব্বের অপেক্ষা সাতিশয় বৃদ্ধিলাভ করিল; নানা দিগ্‌দেশ হইতে জনসাধারণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য বগ্‌দাদ্‌ নগরে সমাগত হইল। য়িহুদী, খৃষ্টীয়াণ, জোরোয়াষ্ট্রীয়াণ, মুসলমান, সকলেই এই নব-ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। কিন্তু মুসলমান মোল্লাগণ তাঁহার প্রতি প্রতিকূলাচরণ করিতে আরম্ভ করিল ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়া ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিল। কোনো এক উপলক্ষে তাহারা, তাহাদের একজনকে বাহাউল্লা'র নিকটে প্রেরণ করিল, তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিবার জন্য; এইরূপে তাহারা বাহাউল্লা'কে পরীক্ষা করিবার আয়োজন করিল। মোল্লাদের প্রতিনিধিরূপে সমাগত মোল্লা আসিয়া বাহাউল্লা'কে সেই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। বাহাউল্লা' যে উত্তর দিলেন, তাহাতে তাঁহার যুক্তিমত্তা ও জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া মোল্লা বিস্মিত হইয়া গেল; এই জ্ঞানরাশি যে বাহাউল্লা'র অধ্যয়ন-লব্ধ নহে, ইহা সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল এবং ইহা বুঝিতে পারিয়াই সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। মোল্লা বুঝিল, জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধিতে বাহাউল্লা' অদ্বিতীয়। কিন্তু, যে মোল্লাগণ তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহারা যাহাতে বাহাউল্লা'র অবতারত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারে, সেই জন্য সে বাহাউল্লা'কে বলিল যে, তাঁহার অবতারত্বের নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাকে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটাইতে হইবে। বাহাউল্লা' এইরূপ প্রমাণ দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু মাত্র এই সর্ত্তে যে মোল্লাগণ যে অলৌকিক ঘটনা চায়, তাহা ঘটিবার পূর্ব্বে তাহারা একটি কাগজে স্বাক্ষর করিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান

করিবে যে, সেই অলৌকিক ঘটনা ঘটিবার পর, তাহারা তাঁহার অবতারত্ব মানিয়া লইবে এবং তাঁহার প্রতিকূলাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইবে; তাহাদিগকে সেই স্বাক্ষরিত কাগজ শীল-মোহরাঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। যদি তাহারা এই সর্ত্তে রাজী হয়, তাহা হইলে, তিনি মোল্লাগণের অভীপ্সিত যে কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটাইতে প্রস্তুত; যদি তিনি তাহা না পারেন, তাহা হইলে তিনি প্রবঞ্চনা-অপরাধে অভিযুক্ত হইতে প্রস্তুত আছেন, ইহাও তিনি বলিলেন। মোল্লাগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবিকই যদি সত্যানুসন্ধান ও সত্য-প্রতিষ্ঠাই হইত, তাহা হইলে, এতদপেক্ষা সুন্দর সুযোগ কিছু কল্পনা করা সম্ভব নহে। কিন্তু তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সত্য-প্রতিষ্ঠা নহে; তাহা একান্ত অন্যরূপ। সদুপায়েই হউক আর অসদুপায়ে হউক, তাহারা বাহাউল্লা'র বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করিয়া নিজেদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। তাহারা সত্য-প্রতিষ্ঠা কামনা করিত না, তাহারা সত্যকে ভয় করিত; সুতরাং বাহাউল্লা' যখন তাহাদিগকে সাহসসহকারে আহ্বান করিলেন, তখন তাহারা পলায়নে তৎপর হইল।

এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়া তাহারা বাহাউল্লা'কে ধ্বংস করিবার জন্য নানারূপ নূতন ষড়্যন্ত্র করিতে লাগিল। বগ্‌দাদের কন্‌সাল্-জেনারেল্ (উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী) তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন; তিনি বারম্বার পারস্য-রাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতে লাগিলেন যে, বাহাউল্লা' পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী হইয়া পড়িয়াছে এবং মুসলমান ধর্ম্মের নানারূপ গ্লানি ঘটাইতেছে, পারস্যে তাঁহার বিষাক্ত উপদেশাবলীর বিষ ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং তাঁহাকে সেই কারণে কোনো দূরতর স্থানে নির্ব্বাসন করা উচিত।

এই দারুণ দুঃসময়ে যখন পারস্য ও তুর্কী সরকার হইতে সমবেত

চেষ্টা দ্বারা এই ধর্ম্মের আন্দোলন উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা চলিতেছিল, যখন মোল্লাগণের প্রতিকূলাচরণ চরমে উপস্থিত হইয়াছিল, তখনও বাহাউল্লা' তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, প্রশান্ত, সৌম্যরূপে তাঁহার অনুগামীগণকে উৎসাহিত করিতেছিলেন ও অনর লেখনা-মুখে সান্ত্বনা-নিঃস্যন্দী ভাষায় তাঁহার অনুগামীদের অত্যাচার-জর্জ্জরিত হৃদয়ে শান্তি ও শক্তির প্রবাহ বহন করিয়া আনিতেছিলেন। "নিহিত বাক্য" নামক গ্রন্থ এই সময়েই অবতীর্ণ হইয়াছিল। আবুদুল্‌বাহা স্বয়ং বিবৃত করিয়াছেন, ইহা কিরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

বাহাউল্লা' অনেক সময় তাইগ্রীস্‌ নদীর তীর ধরিয়া বেড়াইতে যাইতেন। ভ্রমণ হইতে যখন ফিরিয়া আসিতেন, তখন তিনি স্বর্গীয় আনন্দে আপ্লুত; সেই অবস্থায় তিনি এই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ গীতি-কবিতা নিমিষের মধ্যে লিখিয়া ফেলিতেন। সহস্র সহস্র নর-নারীর তাপিত, তৃষিত, ব্যথাতুর প্রাণে এই গ্রন্থের বাক্যগুলি আশা ও সান্ত্বনা সঞ্চারিত করিত। বহু বৎসর ধরিয়া "নিহিত বাক্য"এর কয়েকটি মাত্র পাণ্ডুলিপি পৃথিবীতে ছিল; তাহাও সযত্নে লুকাইয়া রাখা হইত, কারণ, শত্রু পক্ষীয় ব্যক্তি সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক হওয়ায় ও তাহাদের হাতে পড়িলে, গ্রন্থ বিনষ্ট হইবে, এই আশঙ্কা ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, বাহাউল্লা'র গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই গ্রন্থখানিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পঠিত হইয়া থাকে; পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই গ্রন্থের প্রসার ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাহাউল্লা'র জীবনের এই সময়েই "ঈকান্‌ গ্রন্থ" নামক আর একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; তখন তাঁহার বগদাদ্‌-বাস প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল (১৮৬২-১৮৬৩ খৃঃ)

বগ্‌দাদের নিকটে রিজ্‌ওয়ানে ঘোষণা

অনেক মন্ত্রণার পর, পারস্য রাজসরকারের অনুরোধে তুর্কী সরকার এক আদেশ-পত্র বাহির করিলেন, তাহাতে বাহাউল্লা'কে কনষ্টাণ্টিনোপল্ (তুর্কীর রাজধানী)এ আসিবার জন্য আজ্ঞা করা হইল। বাহাউল্লা'র অনুগামীগণ এই আদেশ-সংবাদে নিতান্ত ভীত, বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহাদের প্রিয় প্রভু বাহাউল্লা'র আবাস-গৃহ তাহারা অবরোধ করিয়া বসিল; ইহা এতই গুরুতর আকার ধারণ করিল যে, যতদিন সার্থবাহ দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া না উঠিতে পারে, ততদিন সমস্ত পরিবার লইয়া বাহাউল্লা'কে নগরের বাহিরে নাজিব পাশার উদ্যানে দ্বাদশ দিন তাঁবু ফেলিয়া অবস্থান করিতে হইল। এই দ্বাদশ দিনের প্রথম দিনে, (অর্থাৎ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল তারিখে, বা'বের ঘোষণার ঊনবিংশ বৎসর পরে) বাহাউল্লা' তাঁহার অনুগামীগণের অনেকের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন যে তিনি ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত, অবতারগণের প্রতিশ্রুত সেই মহামানব, যাঁহার আগমন-বার্ত্তা বা'ব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। এই আনন্দ-বার্ত্তা যেদিন ঘোষিত হইল, পৃথিবীতে তাহা একটি স্মরণীয় দিন; যেস্থানে এই অমৃত-বাণী বিঘোষিত হইল, তাহা প্রসিদ্ধ হইয়াছে; বাহাইগণের নিকট ইহার নাম, "রিজওয়াণের উদ্যান"; যে কয় দিন বাহাউল্লা' সেখানে ছিলেন, তাহার স্মারক-স্বরূপ, প্রতি বৎসর "রিজওয়াণের মহোৎসব" নামে একটি সমারোহ-সম্পন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এই দ্বাদশ দিন, বাহাউল্লা' সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ, সম্ভ্রমশীলতা ও শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বিন্দুমাত্র নিরানন্দতাও তাঁহাকে এই

কয়েক দিনের মধ্যে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার অনুগামীগণ তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইল এবং আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে সোৎসাহে বিচরণ করিতে লাগিল; বিপুল জনসঙ্ঘ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য সমাগত হইল। বগ্‌দাদ্ নগরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এমন কি বগ্‌দাদের শাসন-কর্ত্তা গভর্ণর পর্য্যন্ত এই অনন্যসাধারণ বন্দীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিলেন। বাহাউল্লা' বগ্‌দাদ্ হইতে যাত্রা করিলেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল্ ও আদ্রিয়ানোপল্

কনষ্টাণ্টিনোপলে পৌঁছিতে তাঁহাদের তিন হইতে চা'র মাস কাল সময় লাগিল; বাহাউল্লা'র সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার পরিবারস্থ দ্বাদশজন ব্যক্তি ও বাহাত্তরজন শিষ্য। পথে ইঁহারা আবরণহীন অবস্থায় অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। কনষ্টাণ্টিনোপলে পৌঁছিয়া তাঁহারা প্রথমে যে আবাস-গৃহ পাইলেন, তাহাতে তাঁহারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অল্প-পরিসর স্থানে বন্দীবৎ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে, তাঁহারা ভাল আবাসগৃহ পাইলেন বটে; কিন্তু চারি মাস কাল পরে তাঁহাদিগকে আবার স্থানান্তরে যাইতে হইল, এবার আদ্রিয়ানোপলএ। এই আদ্রিয়ানোপল্-গমন, যদিও কয়েক দিবসের ব্যাপার, তথাপি অত্যন্ত ভয়াবহ ও অতীব কষ্টকর; ইতঃপূর্ব্বে তাঁহারা কোনো যাত্রা-কালেই এত কষ্ট পা'ন নাই। যাত্রার অধিকাংশ সময়ই অতিরিক্ত তুষারপাতে তাঁহাদিগকে উদ্বেজিত হইতে হইয়াছিল এবং তাঁহাদের উপযুক্ত পরিচ্ছদ বা খাদ্য না থাকায়, তাঁহাদের কষ্টের অবধি ছিল না। আদ্রিয়ানোপলে আসিয়া তাঁহাদের প্রথম শীত কাটিল, একটি অতীব ক্ষুদ্র, মাত্র তিনটি কক্ষসমন্বিত, মৎকুন প্রভৃতি নানারূপ জঘন্য জীবসঙ্কুল একটি গৃহে;

তাঁহার পরিবারস্থিত দ্বাদশজন ব্যক্তির পক্ষে এই গৃহে বাস অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। শীতকাল শেষ হইলে, তাঁহারা এতদপেক্ষা বাসযোগ্য একটি গৃহ বাসের নিমিত্ত পাইলেন। তাঁহারা আদ্রিয়ানোপলে সাড়ে চারি বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল ছিলেন, এখানে বাহাউল্লা' পুনরায় ধর্ম্মান্দোলন আরম্ভ করিলেন; পুনরায় তাঁহার চতুর্দ্দিকে বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীগণের ভিঁড় হইল। তিনি তাঁহার অবতারত্ব প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন; বা'বীগণের অধিকাংশই তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইল; এই সময় হইতে বা'বীগণ বাহাই নামে পরিচিত হইল। কিন্তু একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ দল তাঁহাকে মানিয়া লইল না; তাহারা বাহাউল্লা'র ভ্রাতা, পূর্ব্বোক্ত মীর্জ্জা য়াহ্য়ার নেতৃত্বে ভীষণভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিল ও তাঁহার চিরশত্রু শিয়াগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার ধ্বংসসাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। নানাবিধ অশান্তি সৃষ্ট হইতে লাগিল; অবশেষে তুর্কী সরকার বা'বী এবং বাহাই উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগকে আদ্রিয়ানোপল্ হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দিল। তাহারা বাহাউল্লা' ও তাঁহার অনুগামীদিগকে নির্ব্বাসন করিল, প্যালেষ্টাইনে, আক্কানামক স্থানে এবং মীর্জ্জা য়াহ্য়া ও তাহার দলকে নির্ব্বাসন করিল, সাইপ্রাস্ দ্বীপে। বাহাউল্লা' ও তাঁহার অনুগামীগণ আক্কাতে আসিয়া পৌঁছিলেন, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের শেষ তারিখে।

রাজন্যবর্গের নিকট লিপি-প্রেরণ

এই সময়েই বাহাউল্লা' য়ুরোপের সমস্ত প্রধান রাজন্যবর্গের নিকটে তাঁহার প্রসিদ্ধ পত্রাবলী প্রেরণ করেন। য়ুরোপের ধর্ম্মগুরু পোপ্, পারস্যের শাহ্, আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট, ইঁহাদের নিকটেও তিনি তাঁহার

আবির্ভাব জ্ঞাপন করিয়া পত্র লেখেন। সমস্ত পত্রেই তিনি গভর্ণমেণ্টকে আহ্বান করিলেন, প্রকৃত ধর্ম্ম, ন্যায় রাজ্যশাসন ও আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে যত্নবান্ হইতে ও এই সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাসাধ্য শক্তি নিয়োজিত করিতে। পারস্যের শাহের নিকট তিনি যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে তিনি অত্যাচারিত, নির্য্যাতিত বা'বীগণের পক্ষ হইতে, তাহাদের প্রতি যে অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা হইতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে তেজস্বী ভাষায় প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, যে যাহারা তাঁহাদিগকে অত্যাচার করিতে সরকারকে প্ররোচিত করিতেছিল, তাঁহাদিগকে তাহাদের সম্মুখীন করা হউক। বলা বাহুল্য, এই অনুরোধ পারস্য সরকার কর্ত্তৃক রক্ষিত হইল না, অগ্রাহ্য করা হইল। বদী' নামক একটি অনুরক্ত, ধার্ম্মিক যুবক বাহাউল্লা'র এই পত্র লইয়া পারস্য-সরকারের সম্মুখীন হইয়াছিল; তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ভীষণ অমানুষিক নির্য্যাতন সহকারে মারিয়া ফেলা হইল, উত্তপ্ত ইষ্টক তাহার দেহের বিভিন্ন অংশে চাপিয়া ধরা হইতে লাগিল; বদী' হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিল।

এই পত্রেই বাহাউল্লা' নিজের প্রতি যে সমস্ত অত্যাচার, নির্য্যাতন করা হইয়াছিল, অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও তাঁহার উদ্দেশ্যসম্বন্ধেও তিনি তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

"রাজন্, যাহা চর্ম্মচক্ষুতে কেহ দেখে নাই, কর্ণেন্দ্রিয়ে শুনে নাই, তাহা আমি ঈশ্বরের পথে দেখিয়াছি। বন্ধুগণ আমাকে অস্বীকার করিয়াছে; আমার পক্ষে পথগুলি সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া উঠিতেছে, নিরাপদতারূপ শীতল জলাশয় শুকাইয়া গিয়াছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের হরিৎ-প্রান্তর শুষ্ক হইয়া হরিদ্রাভ হইয়াছে। কত শোক, কত কষ্টই আমার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে, আর কত যে ভাবীকালে অবতীর্ণ হইবে,

তাহা বলিতে পারি না। আমি সেই মহান্, সর্ব্বলোকাশ্রয়, সর্ব্বকরুণা-নিধানের দিকে অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু আমার পশ্চাতে চলিতেছে নিঃশব্দসঞ্চারে সেই ক্রূর সর্প। আমার চক্ষু হইতে অবিরাম অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়া শয্যা, উপাধান সিক্ত করিতেছে, কিন্তু আমার শোক, আমার নিজের জন্য নহে। ঈশ্বরের নাম লইয়া বলিতেছি, আমার মস্তক আপন প্রভুর প্রেম পাইবে এই আশাতেই বর্শাফলকে আরোহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি বৃক্ষের পাশ দিয়া যাইতেই আমার হৃদয় বৃক্ষটিকে ডাকিয়া বলে, 'হায়,—যদি তোমাকে আমার নামে কাটা হইত এবং 'ক্রুশ' তৈয়ার করা হইত, এবং আমার দেহ আমার প্রভুর পথে তোমার উপরে উদ্বন্ধনে তুলিয়া দেওয়া হইত!' আমি দেখিতে পাইতেছি, মানবকুল মদমত্ত অবস্থায় বিপথগামী হইতেছে, কিন্তু তাহারা তাহা জানিতে পারিতেছে না; তাহারা তাহাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতিকেই সর্ব্বপ্রধান স্থান দিয়াছে, ঈশ্বরকে তাহারা দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে; মনে হয় যেন তাহারা ঈশ্বরের ধর্ম্মকে ক্রীড়নক বলিয়া মনে করে, ইহাকে বিদ্রূপের যোগ্য মনে করিয়া বিদ্রূপ করে। তাহারা মনে করে যে তাহারা ভালই করিতেছে এবং তাহারা নিরাপদ দুর্গে অবস্থান করিতেছে, তাহারা কখনও বিপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু তাহারা যাহা মনে করিতেছে, ব্যাপার সেরূপ নহে; আগামী কল্য তাহারা দেখিবে, আজ যাহা অস্বীকার করিতেছে।

"আমাদিগকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল, এই সুদূর নগরী আদ্রিয়া-নোপলে; এখান হইতে আমাদিগকে স্থানান্তরিত করা হইতেছে আক্কার কারাগারে। এবং লোকমুখে যাহা শুনিতেছি, তাহাতে বুঝিতেছি যে পৃথিবীর সমস্ত নগরীর মধ্যে আক্কাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরানন্দ, নির্জ্জন,

সর্ব্বাপেক্ষা অসুন্দর, কুৎসিত, জলবায়ু হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর; মনে হয়, যেন উহা পেচকের রাজধানী, কারণ পেচকের কর্কশ শব্দ ব্যতীত, আর কোনো শব্দই সে নগরে শ্রুত হয় না। এইরূপ একটি নগরে ঈশ্বরের এই ভৃত্যকে কারাবরুদ্ধ করিয়া রাখার আয়োজন হইতেছে। নির্ম্মম হস্তে আমাদের সম্মুখে মমতার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতেছে, জীবনের অবশিষ্ট অংশে আমরা যাহাতে জাগতিক জীবনের সর্ব্বপ্রকার ভালবস্তু হইতে বঞ্চিত হই, তাহার আয়োজন করিতেছে। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, যদিও দুঃখ-কষ্টের উপদ্রবে আমাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, যদিও ক্ষুৎপিপাসায় আমাকে কাতর করিয়া ফেলে, যদি কঠিন উপলাস্তীর্ণ ভূমি আমার শয্যা হয়, মরুভূমির হিংস্র পশুগুলিই আমার একমাত্র সঙ্গী হয়, তথাপি আমি বিচলিত হইব না, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সহনশীল ব্যক্তিগণ যেমন অচল, অটল, প্রতিজ্ঞাশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তেমনই আমি সেই জন্মজন্মান্তরের সম্রাট, সর্ব্বজাতি, সর্ব্বমানবকুলের স্রষ্টা, পরমশক্তিমান্ পরমেশ্বরের শক্তিতে আশ্রয় করিয়া থাকিব; আমার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাইব। আমি ভরসা করি, পরমকারুণিক পরমেশ্বর আমার এই কারাবরণ উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার অপর ভৃত্যগণকে শৃঙ্খল বেড়ী হইতে মুক্ত করিবেন এবং তাঁহার অকপট ভৃত্যগণকে তাঁহার অসীম ঐশ্বর্য্যের দিকে ফিরাইবেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেক প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক প্রার্থনাকারীর সন্নিকটে থাকেন। আমরা সেই প্রিয় প্রভুর নিকটে যাক্‌রা করিতেছি যেন তিনি তাঁহার সিদ্ধপুরুষগণকে এই নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করেন এবং উহার দ্বারা তাহাদিগকে শাণিত তরবারি ও ক্ষুরধার বর্ষাফলক হইতে রক্ষা করেন। বিপদ-আপদের মধ্য দিয়াই ঈশ্বরের ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে এবং তাহা উন্নতিলাভ করিয়াছে। ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম,—যাহা আদিম কাল হইতে এইরূপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।"—(পথিকের কাহিনী, পৃঃ ১৪৬, ১৫৭)

আক্কায় বন্দী-জীবন

তদানীন্তনকালে আক্কা (Acre) নগরী, তত্রস্থ দুর্গকারাগারের জন্যই প্রসিদ্ধ ছিল; তুরস্ক সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রদেশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত, ভীষণ প্রকৃতি অপরাধীগণ সেইখানে প্রেরিত হইত। সমুদ্র-পথে নানা কষ্ট ভোগ করিয়া বাহাউল্লা' ও তাঁহার অনুগামীগণ (নরনারী বালক প্রভৃতি মিলিয়া তাহাদের সংখ্যা ৮০ হইতে ৮৪) সৈনিকাবাসে কারাবরুদ্ধ হইলেন। নিরানন্দ ও অপরিচ্ছন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য স্থানটি অতি জঘন্য, ইহা ত বলাই বাহুল্য। শয়ন করিবার শয্যা ছিল না, এক কথায় কোনও রকম জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সুখ-সুবিধা সেখানে ছিল না। যে খাদ্য বন্দীদিগকে দেওয়া হইত, তাহা অখাদ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহাও আবার পরিমাণে যৎসামান্য; খাদ্যাভাবে প্রপীড়িত হইয়া কিছুকাল পরে বন্দীগণ নিজেদের খাদ্য কিনিয়া লইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। কারাবাসের প্রথম কয়েকদিন বালকগণ নিয়তই রোদনরত থাকায় নিদ্রা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ম্যালেরিয়া জ্বর, অতিসার প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধি দেখা দিল; পাঁচজন ব্যতীত আর সমস্ত বন্দীই অসুস্থ হইয়া পড়িল; এই পাঁচ জন পরে ভুগিয়াছিল। চারিজন রোগে ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল; যাহারা জীবিত থাকিল, তাহারা যে যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল,

তাহা বাস্তবিকই অবর্ণনীয়।*

এইরূপ কঠোর কারাবাস দুই বৎসর কাল চলিল; এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনো বাহাইকেই কারাগারের বাহিরে কিঞ্চিন্মাত্র সময়ের জন্যও যাইতে দেওয়া হইত না; কেবল প্রত্যহ চা'রজন করিয়া বাহাই সশস্ত্র সিপাহীদ্বারা সতর্কভাবে পরিবেষ্টিত ও রক্ষিত অবস্থায় খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য বাহিরে যাইতে পাইত।

বাহির হইতে কেহ দেখা করিতে আসিলে, তাহাকে দেখা করিতে দেওয়া হইত না। পারস্য হইতে অনেক বাহাই সমস্ত পথ পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করিয়া তাহাদের প্রিয় প্রভুকে দেখিতে আসিত, কিন্তু তাহাদিগকে নগর-প্রাচীরের বাহির হইতেই ফিরিতে হইত। তৃতীয় পরিখার বাহিরে প্রান্তরের একটি স্থান হইতে বাহাউল্লা'র কারাকক্ষের গবাক্ষ পথ দৃষ্টি-গোচর হইত, তাহারা সেখানে গিয়া সমবেত হইত। বাহাউল্লা' গবাক্ষ পথে আসিয়া দাঁড়াইতেন, তাহারা দূর হইতে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিত, পরিশেষে অশ্রু-বর্ষণ করিতে করিতে স্বকীয় আবাসে প্রত্যাগমন করিত, তাহাদের হৃদয়ে উৎসাহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য ও সেবাব্রতে জীবন উদ্‌যাপিত করিবার জন্য তাহাদের চিত্ত অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

---

* যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তাহাদিগের দুইজনকে সমাধিস্থ করিবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য বাহাউল্লা' নিজের একটি কার্পেট প্রদান করিয়াছিলেন, বিক্রয় করিতে; কিন্তু বিক্রয়লব্ধ অর্থ সৈনিকগণ সমাধিস্থ করিবার জন্য না লাগাইয়া নিজেরাই আত্মসাৎ করিল ও দুইটি মৃতদেহ মৃত্তিকাভ্যন্তরে একটি গর্ত্তে পুঁতিয়া ফেলিল।— (পারসিক ঐতিহাসিক)

কঠোরতার উপশম

অবশেষে, কারাবরোধের কষ্ট ও কঠোরতা কিছু কমিল। তুর্কী সৈনিকগণের সমাবেশের প্রয়োজন হওয়ায় সমস্ত সৈনিকবাসই সৈনিক-দিগের জন্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। সুতরাং সৈনিকাবাস হইতে বাহাউল্লা' ও তাঁহার সঙ্গীগণকে অন্যত্র নেওয়া হইল। বাহাউল্লা' ও তাঁহার পরিবার একটি গৃহে স্থানান্তরিত হইলেন ও তাঁহার অনুগামী-সঙ্গীগণ নগরস্থিত একটি সরাইখানায় নীত হইলেন। বাহাউল্লা' আরও সাত বৎসর এই গৃহে বন্দীবৎ জীবন যাপন করেন। যে কক্ষে তিনি অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহারই সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্রায়তন কক্ষে তাঁহার পরিবারস্থিত ১৩ জন নরনারীকে বাস করিতে হইত, এতগুলি ব্যক্তির ঐ এককক্ষে কেমন করিয়া স্থান সঙ্কুলান হইবে, তাহা কেহই চিন্তা করিল না। যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা না থাকায়, তাঁহাদিগকে ক্ষুধায় কষ্ট পাইতে হইত, জীবনধারণোপ-যোগী সাধারণ সুখ-সুবিধা না থাকায় সেই কষ্ট অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইত। কিছুকাল পরে, কয়েকটি কক্ষ তাঁহাদিগের বাসের নিমিত্ত ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য-সহকারে বাস করিতে পারিলেন। সৈনিকাবাস ত্যাগ করিবার পর হইতেই, বাহির হইতে যাঁহারা সাক্ষাৎলাভের মানসে আসিতেন, তাঁহাদিগকে বাহাউল্লা'র সঙ্গে দেখা করিতে দেওয়া হইতে লাগিল; সম্রাটের বিধি-নিষেধ অনুসারে যে সমস্ত আদেশ বাহাউল্লা' ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে মানিয়া চলিতে হইত, তাহার কঠোরতা ধীরে ধীরে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল; মাঝে মাঝে সেগুলি পূর্ব্ববৎ অনুসৃত হইলেও, সাধারণতঃ তাহার তীব্রতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মন্দীভূত হইল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

কারাগারের দ্বার উন্মোচন

কারাযন্ত্রণা যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখনও বাহাইগণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ন নাই; তাঁহাদের প্রশান্ত আত্মবিশ্বাস ক্ষণকালের জন্য তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। আক্কার সৈনিকাবাসে থাকিতেই বাহাউল্লা' তাঁহার কতিপয় বন্ধুর কাছে লিখিয়াছিলেন :—"তোমরা ভীত হইও না; কারণ, কারাগারের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইবে, কার্ম্মেল পর্ব্বতে আমার তাঁবু সন্নিবিষ্ট হইবে, অপরিসীম আনন্দ উপলব্ধ হইবে।" বাহাউল্লা'র এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার অনুগামীগণের যথেষ্ট সান্ত্বনার কারণ হইয়াছিল; পরিশেষে, ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। কারাদ্বার কিরূপে মুক্ত হইয়াছিল, তাহা আবদুল্‌বাহার ভাষাতেই বিবৃত করিতেছি; তাঁহার দৌহিত্র শোঘি এফেন্‌দি ইহা অনুবাদ করিয়াছেন :—

"বাহাউল্লা' পল্লার শ্যামল শ্রী ও সৌন্দর্য্যের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। একদা তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—'আমি দীর্ঘ নয়বৎসর কাল পল্লীর শ্যামল সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই নাই। নগর যেমন বহিরাবরণ দেহতুল্য, পল্লী তেমনই প্রাণস্বরূপ আত্মার নিকেতন'। যখন আমি পরোক্ষভাবে তাঁহার এই অভিমত শুনিতে পাইলাম, তখন আমি হৃদয়ঙ্গম করিলাম, তিনি পল্লীতে যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে যখন প্রভুর এইরূপ বাসনা হইয়াছে, তাহা সার্থক করিবার জন্য আমি যে কোনো চেষ্টা করিব তাহা সফল হইবে। এই সময়ে আক্কাতে মোহাম্মদ পাশা সফ্‌ওয়াৎ নামক একজন ব্যক্তি বাস করিত; সে সর্ব্বদাই আমাদের প্রতিকূলাচরণ করিত। নগর হইতে চারি মাইল উত্তরে, একটি অতি সুরম্যস্থানে এই ব্যক্তির 'মাজ্‌রাই' নামক একটি প্রাসাদ

ছিল; তাহা চতুর্দ্দিকে উদ্যানদ্বারা পরিবেষ্টিত ও তাহাকে ঘিরিয়া নিয়ত বহমান্ একটি স্রোতস্বিনী স্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। আমি এই ব্যক্তির গৃহে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম; তাহাকে বলিলাম, 'তুমি তোমার প্রাসাদ শূন্য ফেলিয়া রাখিয়া আক্কাতে আসিয়া বাস করিতেছ?' সে উত্তর দিল, 'আমি রুগ্ন ব্যক্তি, আমার পক্ষে নগর ত্যাগ করিয়া সেখানে গিয়া বাস করা অসম্ভব। সেখানে নিতান্ত একাকী, বন্ধুহীন অবস্থায় আমাকে থাকিতে হয়; আমার এই রুগ্ন স্বাস্থ্যে আমি তাহা করিতে পারি না'। তখন আমি বলিলাম, 'তুমি যখন সেখানে বাস করিতেছ না, তখন সে প্রাসাদ আমাদিগকে ভাড়া দিতে পার; সে প্রাসাদ ত খালিই পড়িয়া আছে'"। সে ব্যক্তি আমার এই প্রস্তাবে কিছু বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। বার্ষিক প্রায় পঁচাত্তর টাকা ভাড়ায় সেই প্রাসাদ ভাড়া নেওয়া হইল; ইহা অতি অল্পমূল্য, তাহা বলিতেই হইবে। তাহাকে পাঁচ বৎসরের ভাড়া অগ্রিম দিয়া চুক্তি ঠিক করিয়া ফেলিলাম; সর্ত্ত সাব্যস্ত হইয়া গেল। আমি মজুর পাঠাইয়া প্রাসাদের জীর্ণসংস্কার করিয়া লইলাম, প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যান সুশোভিত ও একটি স্নানাগার প্রস্তুত করাইলাম। স্বর্গের আশীষপূত সুন্দর পুরুষের (অর্থাৎ 'জমাল-এ-মোবারেক'; বাহাউল্লা'র অনুগামী ও বন্ধুগণ তাঁহাকে অনেকসময়ে এই নামেই অভিহিত করিত) ব্যবহারের জন্য একটি গাড়ী নির্ম্মিত করাইলাম। তারপর, আমি একদা স্থির করিলাম, স্থানটি নিজে গিয়া দেখিয়া আসিব। নগর-প্রাচীর অতিক্রম করিয়া আমরা কদাচ কোনোক্রমে বাহিরে যাইতে পারিব না, উপর্য্যুপরি প্রকাশিত বহু বিধিনিষেধসম্বলিত 'ফর্ম্মান'এ এই আদেশ-বাণী আমাদিগকে জানান হইয়াছিল; তথাপি আমি নগরের দ্বারপথ দিয়া হাঁটিয়া বাহির

হইয়া গেলাম। প্রহরীগণ পাহারা দিতেছিল, কিন্তু তাহারা কোনো বাধা না দেওয়ায় আমি সোজা প্রাসাদাভিমুখে চলিলাম। পরদিন, আমি পুনরায় কতিপয় বন্ধুসমভিব্যাহারে ও কয়েকজন রাজপুরুষকে সঙ্গে লইয়া, নগরদ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলাম; দ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রহরী ও সৈনিকগণ পাহারা দিতেছিল, তাহারা কোনোরূপ বিরক্তির কারণ বা বাধা সৃষ্টি করিল না, আমরা নির্ব্বিঘ্নে, বিনা বাধায় দ্বার উত্তীর্ণ হইলাম। অন্য একদিন, আমি বাহ্‌জির "পাইন" গাছের ছায়ায় টেবিল পাতিয়া ভোজের আয়োজন করিলাম; সেই ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া একত্র হইলেন নগরের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সরকারী কর্মচারীগণ। সায়াহ্নকালে আমরা সকলে একত্র নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

"একদা আমি বাহাউল্লা'র পুণ্য সকাশে গিয়া তাঁহাকে বলিলাম— 'মাজরাইএর প্রাসাদ আপনার জন্য সম্পূর্ণ করা হইয়াছে, সেখানে আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ীও প্রস্তুত'। সে সময়, আক্কা বা হাইফাতে গাড়ী ছিল না। কিন্তু বাহাউল্লা' যাইতে সম্মত হইলেন না; তিনি বলিলেন—'আমি বন্দী'। পরে, আমি পুনরায় আমার পূর্ব্বোক্ত অনুরোধ তাঁহার সমীপে নিবেদন করিলে তিনি পূর্ব্বের উত্তরই দিলেন। আমি সাহসে ভর করিয়া তাঁহাকে তৃতীয়বার ঐ একই অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তথাপি তিনি 'না' বলিলেন; আমি আর তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে সাহসী হইলাম না।

"এই সময়ে আক্কাতে মোহাম্মদ শে'খ নামক এক ব্যক্তি ছিল, তাহার স্থানীয় প্রতিপত্তি ছিল, সে বাহাউল্লা'র একজন দীনভক্ত ছিল; প্রভু বাহাউল্লা'ও তাহাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। আমি এই ব্যক্তিকে বলিলাম—'তুমি সাহসী ব্যক্তি; তুমি আজ রাত্রে প্রভুর সম্মুখে নত

জানু হইয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে এই নগর ত্যাগ করিতে অনুরোধ ক'র ও যতক্ষণ তিনি সম্মতি-জ্ঞাপন না করেন, ততক্ষণ তাঁহার হাত ছাড়িও না'। এই ব্যক্তি জাতিতে আরব। সে বাহাউল্লা'র নিকট গিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিল। সে বাহাউল্লা'র হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক, তাঁহার হস্তে চুম্বন করিল ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রভু, আপনি এই নগর ত্যাগ করিতেছেন না কেন?' বাহাউল্লা' উত্তর দিলেন—'আমি যে কারাবরুদ্ধ, বন্দী'। শে'খ বলিল—'ঈশ্বর এরূপ না করুন! আপনাকে কারাবরুদ্ধ অবস্থায় বন্দী করিয়া রাখিতে পারে কে? আপনিই ত স্বেচ্ছা পরবশ হইয়া নিজেকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি নিজের ইচ্ছায় বন্দী দশা গ্রহণ করিয়াছিলেন; এখন আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি বাহিরে আসিয়া সেই প্রাসাদে বাস করুন। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতি এখন অতি মনোরম সুন্দর শোভায় সুসজ্জিত হইয়াছে; বনস্পতিগুলির শ্যামলতা মনোমুগ্ধকর, তাহাতে রাশি রাশি কমলা লেবু অগ্নিগোলকের মত জ্বলিতেছে, চতুর্দ্দিকে যেন আগুন ধরাইয়া দিয়াছে'। এই কথা শুনিয়া বাহাউল্লা' যতবারই অসম্মতি প্রকাশ করিয়া জানাইতে লাগিলেন যে তিনি বন্দী, পরের অধীন, ততবারই শে'খ তাহার অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল। শে'খ তাঁহার হস্ত চুম্বন করিয়া, হস্তগ্রহণপূর্ব্বক এক ঘণ্টাকাল প্রার্থনা করিল। অবশেষে বাহাউল্লা' বলিলেন—'আচ্ছা, তাই হোক'। শে'খের অধ্যবসায়ের ও সহিষ্ণুতার পুরস্কার মিলিল। শে'খ দ্রুতগতিতে আমার নিকট আসিয়া তাহার সাফল্যের সংবাদ দিল; প্রভু সম্মত হইয়াছেন, এই সংবাদ দিতেও শে'খের যেমন বিপুল আনন্দ, এ সংবাদ পাইতেও আমার সেইরূপ বিপুল আনন্দ।

"সোল্‌তান আব্‌দুল্‌ আজীজের নিষেধাজ্ঞা অনুসারে আমার পক্ষে

বাহাউল্লা’র নিকট যাওয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা বা তাঁহার সংস্পর্শে আসা অপরাধ। এই কঠোর নিষেধ থাকা সত্ত্বেও আমি পরদিন গাড়ী লইয়া গিয়া প্রভু বাহাউল্লা’কে প্রাসাদে লইয়া গেলাম। কেহ কোনো আপত্তি করিল না। আমি প্রভুকে প্রাসাদে রাখিয়া স্বয়ং নগরে ফিরিয়া আসিলাম।

“দুইবৎসর কাল বাহাউল্লা’ সেই মনোমুগ্ধকর, অতীব সুরমা স্থানে অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর, স্থির করা হইল, তাঁহাকে পুনরায় স্থানান্তরিত করিয়া ‘বাহ্‌জী’ নামক একটি স্থানে রাখা হইবে। ঘটনা-ক্রমে বাহ্‌জীতে মারী রোগ দেখা দিয়াছিল ও জনৈক গৃহস্বামী বিপন্ন হইয়া সপরিবার গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল; তাহার গৃহ অতি অল্প মূল্যে ভাড়া দিতে সুতরাং তাহার কোনো আপত্তি ছিল না। আমরা তাহার গৃহ অতি অল্পটাকায় ভাড়া পাইলাম, সেখানেই আমরা আমাদের প্রভু বাহাউল্লা’র জন্য বাসস্থান স্থির করিলাম। সেখানেই প্রভু বাহাউল্লা’র ঐশ্বর্য্য ও প্রকৃতমহিমা উদ্‌ঘাটিত হইল। সোল্‌তান আবদুল্ আজীজের কঠোর আজ্ঞা রহিত না হওয়ায়, বাহাউল্লা’ তখনও আইনতঃ বন্দী; কিন্তু তখন তাঁহার বন্দীত্ব নামে মাত্র; তিনি তাঁহার প্রাত্যহিক, দৈনন্দিন অতি সাধারণ আচরণেও এমন মহত্ব ও ঔদার্য্যের পরিচয় দিতেন যে সকলেরই হৃদয় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় আনত হইত, এমন কি, প্যালেষ্টাইনের শাসনকর্ত্তাগণও সেই কারণে তাঁহার প্রভাব, প্রতিপত্তি ও শক্তি কাম্য মনে করিতেন, হয়ত, ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন। শাসনকর্ত্তা গভর্ণরগণ, মুতসর্‌রিফ্‌গণ, সেনাধ্যক্ষগণ ও স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেন, বিনয়াবনত, গুণমুগ্ধভাবে; তাহাদের এই প্রার্থনা কদাচ পূর্ণ হইত।

"কোনো এক উপলক্ষ্যে, নগরের শাসনকর্ত্তা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অনুমতি যাচ্ঞা করিল, এই কারণে, যে তাহার উপরিস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক সে জনৈক সেনাধ্যক্ষকে প্রভুর সম্মুখে লইয়া যাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিল; প্রভুকে সে এই কথা জানাইয়া অতি বিনয়সহকারে তাঁহার দর্শন লাভের অনুমতি প্রার্থনা করিল। প্রভু অনুমতি দিলেন এবং শাসনকর্ত্তা উক্ত সেনাধ্যক্ষকে সঙ্গে লইয়া সমাগত হইলেন। সেনাধ্যক্ষ য়ুরোপীয় ও অত্যন্ত স্থূলকায়। বাহাউল্লা'র আজ্ঞাশক্তিসম্পন্নতা দর্শনে সে ব্যক্তি এতই অভিভূত হইয়া পড়িল যে সে দ্বারদেশে ভূমির উপর নতজানু হইয়া বসিয়া রহিল। উভয় অতিথি বাহাউল্লা'র সমক্ষে এতই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল যে বাহাউল্লা'র বারম্বার অনুরোধের পর তাহাদিগকে বাহাউল্লা'র সম্মুখে ধূমপান করিতে সম্মত করা গেল; সম্ভ্রম-বোধে তাহারা একান্ত বিচলিত, বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। বাহাউল্লা'র একাধিকবার আমন্ত্রণের ফলে যখন তাহারা ধূমপানের নল হাতে লইল, তখনও তাহারা মাত্র তাহা ওষ্ঠাগ্রে লাগাইয়াই রাখিয়া দিল, তারপর তাহাদের বাহু বক্ষোদেশে নিবদ্ধ করিয়া এমন দীন, হীনভাবে বাহাউল্লা'র সম্মুখে বসিয়া রহিল যে, যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, সকলেই বিস্মিত হইয়া গেল।

"তাঁহার প্রতি বন্ধুগণের প্রীতিপূর্ণ ভক্তিশ্রদ্ধা, রাজকর্ম্মচারী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সম্মানসমাদর, তাঁহার সমীপে বহু সত্যান্বেষী তীর্থপর্য্যটকের সমাগম, তাঁহার চতুর্দ্দিকে সেবা ও ধার্ম্মিকতার পরিব্যাপ্তি, তাঁহার বদন-মণ্ডলে মহত্ব ও ঐশ্বর্য্যের মহাদ্যুতি, তাঁহার আদেশের ব্যাপ্তিশীলতা, তাঁহার উৎসাহপূর্ণ ভক্তগণের সংখ্যাধিক্য—এই সকল প্রত্যক্ষ বিষয় প্রতিপন্ন করে যে বাহাউল্লা' বাস্তবিক বন্দী ছিলেন না, তিনি সমস্ত রাজন্যকুলে সম্রাট্‌বৎ ছিলেন। দুইটি প্রভূতশক্তিশালী, দায়িত্বহীন,

যথেচ্ছাচারী রাজশক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে, অথচ, তাহাদের বন্দী-নিবাসে অবরুদ্ধ থাকিয়াই তিনি তাহাদিগের প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতেন, যেমন ভাষা সাধারণতঃ রাজাগণ প্রজাগণের প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকে। কঠোর নিষেধাজ্ঞামূলক 'ফার্ম্মান্'গুলির অস্তিত্ব সত্ত্বেও তিনি বাহ্‌জীতে রাজার ন্যায় সগৌরবে জীবনযাপন করিতেন। তিনি অনেক সময়ে বলিতেন—'সত্য সত্যই, অতি জঘন্য কারাগার স্বর্গোদ্যানে পরিণত হইয়াছে'।

"বিশ্ব-সৃষ্টির কাল হইতে অদ্যাপি এরূপ অভাবনীয় দৃশ্য আর কখনও কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় নাই।"

বাহ্‌জীতে জীবন-যাত্রা

বাহাউল্লা' জীবনের প্রথম অংশে দেখাইয়াছিলেন, শত লাঞ্ছনা, অপমানের মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে হয় কিরূপে এবং তাঁহার জীবনের শেষ অংশে বাহ্‌জীতে বাসকালে দেখাইলেন, সম্মানের ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাস করিয়া ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয় কিরূপে। শত সহস্র ভক্তগণ তাঁহার চরণসমীপে প্রভূত অর্থ নিবেদন করিত; এই বিরাট অর্থরাশি কিরূপে ব্যয়িত হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার একমাত্র অধিকারী ছিলেন প্রভু বাহাউল্লা'। বাহ্‌জীতে তাঁহার ঐশ্বর্য্য রাজোচিত, ইহা বলিলে পার্থিব সম্পদ ও পার্থিব সুখভোগ বুঝায় না; কারণ, প্রভু বাহাউল্লা' ও তাঁহার পরিবারস্থিত ব্যক্তিবর্গ অতি সাধারণ ও প্রাঞ্জলভাবে জীবন ধারণ করিতেন, বিলাসিতা বা ব্যয়বাহুল্য তাঁহার পরিবারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তাঁহার বাস-গৃহের নিকটে বিশ্বাসীগণ একটি সুন্দর উদ্যান রচনা করিল, তাহার নাম রাখা হইল "রীজ ওয়াণ্"; প্রভু এই উদ্যানেই অনেকদিন উপর্য্যুপরি

কাটাইয়া দিতেন, এমন কি, সপ্তাহের পর সপ্তাহকালও মাঝে মাঝে সেখানেই থাকিতেন; উদ্যানস্থিত একটি ছোট কুটীরে তিনি রাত্রে নিদ্রা যাইতেন। কখনো কখনো তিনি দূরবর্ত্তী কোনো স্থানে, যথা, আক্কা ও হাইফাতে যাইতেন; একাধিকবার তিনি কার্ম্মেল পর্ব্বতের উপর তাঁবু সন্নিবিষ্ট করিয়া বাস করিতেন; আক্কার সৈনিকাবাসে থাকিতে তিনি এ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপে অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইল। বাহাউল্লা'র অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত, উপাসনা ও নিদিধ্যাসনে, পবিত্র গ্রন্থ ও ফলকলিপি লিখনকার্য্যে ও বন্ধুগণের আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান করিতে। মোল্লাগণ, কবিগণ ও সরকারী কর্ম্মচারী-গণ বাহাউল্লা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, আব্দুল্‌বাহা (বাহাউল্লা'র পুত্র)ই তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেন, যাহাতে বাহাউল্লা'র সময় নষ্ট না হয়। তাঁহারা আব্দুল্‌বাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিয়াই প্রীতিলাভ করিতেন, কারণ, তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়াই তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার পিতা, প্রভু বাহাউল্লা'র মহত্ত্ব ও মর্য্যাদা কত অধিক।

বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ স্বর্গীয় অধ্যাপক এড্‌ওয়ার্ড জি ব্রাউন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, বাহ্‌জীতে বাহাউল্লা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বাহাউল্লা'র দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার যে মন্তব্য তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।

"যে ব্যক্তি আমাকে লইয়া চলিতেছিল, সে ক্ষণকালের জন্য অপেক্ষা করিল, আমি আমার জুতা খুলিয়া ফেলিলাম। তারপর সে ব্যক্তি হস্তের দ্রুত সঞ্চালনে ঘরের পর্দ্দা সরাইয়া ফেলিল, আমি প্রবেশ করিলাম; আমি প্রবেশ করিলে পর, সে আবার পর্দ্দাটি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিল। আমি প্রবেশ করিয়া দেখি, আমি একটি বৃহৎ কক্ষ

মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি, আমার সম্মুখে সেই কক্ষের উপরের অংশে এক মস্‌নদ (মঞ্চ), প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে দুই তিনখানি কেদারা। আমাকে স্পষ্ট করিয়া পূর্ব্বে কিছু বলা হয় নাই, তথাপি আমার অস্পষ্ট ধারণা ছিল, আমি কোথায় যাইতেছি বা কাহাকে দেখিতে পাইব, সে সম্বন্ধে। কক্ষ মধ্যে দু'এক সেকেণ্ড কাল দণ্ডায়মান থাকিবার পর আমি স্পষ্ট করিয়া জানিলাম যে কক্ষটি শূন্য নহে; ইহা জানিতে পারিয়া আমি বিস্মিত, ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। মস্‌নদটি যে স্থানে প্রাচীরের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল, সেই স্থানে দেখিতে পাইলাম, একটি তেজঃপুঞ্জ-সমাবৃত আজ্ঞা-সম্পন্ন মহান্ পুরুষ আসীন রহিয়াছেন। 'দর্‌বেশ'গণ যে ধরণের মাথার টুপীকে 'তাজ' বলিয়া থাকে, সেইরূপই, কিন্তু অসাধারণ উঁচু ও অসাধারণ রকমের তৈরী একটি 'ফেল্ট্' বস্ত্রের টুপী তাঁহার মাথায় রহিয়াছে, দেখিতে পাইলাম। টুপীর অধস্তন প্রান্ত দিয়া একটি ছোট, শুভ্র, উষ্ণীষ বিজড়িত ছিল।

"যে মহামানবের সমীপে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, তাঁহার মুখশ্রী অপূর্ব্ব; আমি তাহা বর্ণনা করিতে না পারিলেও আমি তাহা জীবনে বিস্মৃত হইব না। তাঁহার তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী চক্ষুদু'টি যেন অপরের অন্তরের মর্ম্মনিহিত বাক্য অনায়াসে বুঝিতে পারে; প্রশস্ত ললাটে শক্তি ও মহত্ত্বের সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান; ললাটে চিন্তার গভীর রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যেন তাঁহার বয়স অধিক হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার ঘনকৃষ্ণ কেশ ও আবক্ষবিলম্বিত শ্মশ্রুরাশি দেখিয়া তাঁহার বয়স সম্বন্ধে পূর্ব্বধারণা যে ভ্রান্ত, তাহা বুঝা যায়। আমি কোন্ মহাপুরুষের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, ইহা আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, স্বতঃই বুঝিতে পারা গেল, যে মহামানবের প্রতি ঈশ্বর-বিশ্বাসীগণের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও প্রণতি-নম্র মনোভাব রাজন্যবর্গের ঈর্ষার

বস্তু ও নিষ্ফল কামনার সামগ্রী, বুঝিলাম, আমি সেই মহামানব বাহাউল্লা'র সম্মুখে আসিয়াছি; তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

"স্নিগ্ধ অথচ উদাত্ত, আজ্ঞাসম্পন্ন স্বরে তিনি আমাকে উপবিষ্ট হইতে বলিলেন, তাহার পর, বলিতে লাগিলেন—ধন্য ঈশ্বরকে,—তুমি তাঁহার করুণা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছ! * * * তুমি এখানে একজন নির্ব্বাসিত বন্দীকে দেখিতে আসিয়াছ। * * * আমাদের কাম্যবস্তু, জগতের হিত ও আন্তর্জাতিক শান্তি; তথাপি যাহারা আমাদের এই দশা করিয়াছে, তাহারা মনে করে, আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটাইতে তৎপর ও রাজদ্রোহের ইন্ধন যোগাইয়া থাকি. তাহারা সেইজন্য আমাদিগকে শাস্তির যোগ্য, বন্ধন-নির্ব্বাসনের উপযুক্ত বলিয়া মনে করে। * * * সমস্ত জাতি এক ধর্ম্ম-বিশ্বাস-পরায়ণ হইবে এবং সমস্ত মানবকুলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে; মানব-সন্তানের মধ্যে স্নেহ ও একতার বন্ধন বলবত্তর হইবে; ধর্ম্ম বিরোধ, জাতি বিরোধ প্রভৃতি নানাবিধ বিদ্বেষভাবের অবসান হইবে;—এই সকল কথার কি দোষ থাকিতে পারে? * * * হাঁ, ঠিক এইরূপই হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী; বর্ত্তমান যুগের নিষ্ফল সংগ্রাম, সর্ব্বধ্বংসকারী যুদ্ধ-বিগ্রহ, এই সমস্তের অবসান হইবে,. তার পর মহান্‌শান্তি সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। * * * য়ুরোপে তোমাদের কি ইহার প্রয়োজনীয়তা নাই? যীশুখৃষ্ট এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেন নাই কি? কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে য়ুরোপের রাজন্যবর্গ ও শাসন-কর্ত্তাগণ মানবের হিত করা অপেক্ষা মানবের অহিত করিবার জন্য, মানবের ধ্বংস-সাধন করিবার জন্যই মুক্ত হস্তে রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত করিতেছেন।

"এই সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাতের অবসান

হইবে; মানবকুল এক জাতি, এক পরিবারবৎ হইবে। *** আমার দেশকে আমি ভালবাসি, ইহা বলিয়া যেন কোনো ব্যক্তি অহঙ্কার না করে; মানব-জাতিকে ভালবাসাই একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহাতেই উল্লাস করা উচিত।

"যতদূর আমার স্মরণ হয়, এই সমস্ত কথাই আমি বাহাউল্লা'র নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম; তিনি আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। যাহারা এই কথাগুলি পড়িবে, তাহারা চিন্তা করিয়া দেখুক, এই সমস্ত মতবাদের জন্য মৃত্যুদণ্ড ও কারাবরোধের বাস্তবিকই যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল কি না; তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখুক, এই সমস্ত মতবাদের বহুল বিস্তৃতিতে পৃথিবীর লাভ হইবে, কি পৃথিবীর ক্ষতি হইবে।" ("পথিকের কাহিনী"র ভূমিকা হইতে, পৃঃ ৩৯।)

বাহাউল্লা'র স্বর্গারোহণ

জীবন-সায়াহ্ন এইরূপ শান্ত অনাবিলতার মধ্যে অতিবাহিত করিয়া প্রভু বাহাউল্লা' ২৮শে মে, ১৮৯২, তারিখে, পঁচাত্তর বৎসর বয়সে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে "প্রতিজ্ঞা-পুস্তক"ই তাঁহার শেষ ফলক-লিপি। ইহাতে তিনি তাঁহার দেহান্তর ঘটিবার পর তাঁহার অনুগামী শিষ্যবর্গের কি ব্যবস্থা হইবে তৎসম্বন্ধে বিশদ বিবরণ স্বহস্তে লিখিয়া বিধিমত স্বাক্ষর ও শীল মোহরাঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুর নয়দিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তি ও কতিপয় বন্ধুর সমক্ষে তাহার শীল ভাঙ্গিলেন; এবং তাহা পাঠ করাইয়া সকলকে শুনাইলেন। দেখা গেল যে এই প্রতিজ্ঞা-পুস্তকের বলে আব্দুল্‌বাহা বাহাউল্লা'র প্রতিভূ ও

তাঁহার উপদেশাবলীর ব্যাখ্যাতারূপে তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং বাহাউল্লা'র সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, পরিবারবর্গ এবং বিশ্বাসীগণের সকলের প্রতি আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা সকলেই আব্দুল্বাহার দিকে ফিরিবে, তাঁহার অনুরক্ত হইয়া থাকিবে, তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া চলিবে। এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা স্বার্থ-বুদ্ধি প্রণোদিত নানারূপ ব্যক্তিগত কলহ নিবারিত হইল, বাহাই ধর্ম্মের একতা রক্ষিত হইল।

বাহাউল্লা'র অবতারত্ব

বাহাউল্লা'র অবতারত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক। অন্যান্য অবতারগণের বাণীর ন্যায় তাঁহার বাণীও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর বাণী সেইগুলি, যাহাতে তিনি এমন এক ব্যক্তির ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন, যিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মানবসমাজে ঈশ্বরের বার্ত্তা দেওয়ার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন; অপর এক শ্রেণীর বাণী সেগুলি, যাহাতে মনে হয়, স্বয়ং ঈশ্বরই বাণী উচ্চারণ করিতেছেন। ঈকান গ্রন্থে তিনি বলিতেছেন:—

"ঈশিত্বের উদয়াচল হইতে সমুদিত সূর্য্যসমূহের দুইটি পদবী আছে। একটি হইতেছে—একত্বের পদ, এককত্বের পদবী। যেমন ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে—'আমরা তাহাদের কাহারও মধ্যে প্রভেদ করি না' (কোরাণ, সুঃ ২)। অপরটি হইতেছে প্রভেদ ও সৃষ্টজগতের পদ, মানবীয় সঙ্কীর্ণতার পদবী। এই পদবীতে প্রত্যেকের জন্য এক এক 'মন্দির' নির্দ্দিষ্ট, এক এক বিধান নিরূপিত, এক এক প্রকাশ নির্দ্ধারিত, এক এক সীমা অবধারিত। প্রত্যেকেই এক নির্দ্দিষ্ট নামে অভিহিত, এক নির্দ্দিষ্ট বিশেষণে বিশেষিত। প্রত্যেকেই এক নূতন ধর্ম্ম, এক নূতন বিধি-ব্যবস্থার কার্য্যে নিয়োজিত; যেমন বলা

হইয়াছে: 'ইহারা প্রেরিতপুরুষ, আমরা তাহাদের কয়েক জনকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর সম্মাননা প্রদান করিয়াছি, তাহাদের কয়েকজনের সহিত ঈশ্বর কথোপকথন করিয়াছেন, অপর কয়েকজনের পদ উন্নত করিয়াছেন। এবং মরিয়মের পুত্র যীশুকে আমরা প্রকাশ্য নিদর্শন দিয়াছিলাম, তাহাকে পবিত্রাত্মার শক্তি সহকারে শক্তিমান্ করিয়াছিলাম' (কোরাণ, সূঃ ২)।

"এককত্বের পদে, একাকীত্বের পদবীতে, এই সমস্ত অস্তিত্বের সারাৎসারের প্রতি বিশুদ্ধ মহত্ব, ঈশ্বরত্ব, এককত্ব এবং পূর্ণদেবত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে, কারণ, তাঁহারা প্রত্যেকেই 'ঈশ্বর-প্রকাশ'এর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং ঈশ্বরের নিগূঢ় তথ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য তাঁহাদের সৌন্দর্য্যে প্রকাশিত।

"দ্বিতীয় পদবীতে অর্থাৎ জাগতিক বিশেষত্ব, স্বাতন্ত্র্য, সঙ্কীর্ণতা ও নির্দ্দেশকতার পদবীতে তাঁহাদের হইতে পূর্ণদাসত্ব, প্রকৃত অভাব, একান্ত দীনহীনতা প্রকাশিত হইয়া থাকে, যেমন বলা হইয়াছে: 'নিশ্চয়ই আমি ঈশ্বরের দাসানুদাস, এবং বাস্তবিকই আমি তোমাদের ন্যায় মানব মাত্র' (কোরাণ, সূ ৪১)।

"যদি শোনা যায়, পূর্ণঅবতার হইতে, 'নিঃসন্দেহে, আমিই ঈশ্বর', ইহা সর্ব্বাংশে সত্য, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের স্থান নাই; কেননা, তাঁহাদের নামে, বিশেষণে ও প্রকাশে, ঈশ্বরের নাম, ঈশ্বরের বিশেষণ, ঈশ্বরের প্রকাশ পৃথিবীতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সে একই প্রকারে, যদি তাঁহারা বলেন: 'আমরা ঈশ্বরের ভৃত্যের ভৃত্য', ইহাও পূর্ণ সমর্থনে সমর্থিত ও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত, কেননা, তাঁহারা সীমাহীন দাসত্বের পদবীতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। কোনো

ব্যক্তিরই এমন সাহসিকতা নাই যে এই প্রকারের দাসত্বের সহিত ধরাধামে আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম।

"এই কারণে, যখন এই সমুদয় অস্তিত্বের সারাৎসার ঈশ্বরের পবিত্র সমুদ্র-সলিলে নিমজ্জিত থাকেন এবং যখন আদর্শ-সম্রাটের তাৎপর্য্য-শৃঙ্গে আরোহণ করেন, তখন প্রভু ও ঈশ্বররূপে বাক্য উচ্চারণ করেন। যদি মনোযোগ সহকারে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহারা এই পদবীতেও সেই পরম অস্তিত্ব ও চরম স্থায়িত্বের সম্মুখে এমন প্রণতি নম্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন যে তাঁহারা যেন সম্পূর্ণ সত্তাবিহীন, এবং সেই প্রাঙ্গনে তাঁহাদের আত্মস্মৃতিই যেন নাস্তিকতা।

"সুতরাং, তাঁহারা ঈশ্বরত্ব, দেবত্ব, অবতারত্ব, বার্ত্তাবাহকত্ব, উত্তরাধিকারিত্ব, নায়কত্ব বা দাসত্ব সম্পর্কে যাহা কিছু বলেন, তাহা সমস্তই সর্ব্বতোভাবে সত্য এবং সর্ব্বপ্রকারে সন্দেহ বিহীন।"—(ঈকান গ্রন্থ, পৃঃ ১২৫—১২৯)

বাহাউল্লা' যখন সাধারণ মানবরূপে বাক্য বলেন, তখনও তিনি নিজের জন্য নিতান্ত দীনহীন ভাবে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের পদবী দাবী করেন। সাধারণ মানুষ হইতে ঈশ্বরের অবতারের বিশেষত্ব, এই, যে তিনি সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা ও পূর্ণতার অধিকারী হইয়াও সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন এবং যীশুখৃষ্ট যেমন "গেথ্‌সেমেনের" উদ্যানে বলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছা নয়, প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক", তিনিও সর্ব্বাবস্থায় তদ্রূপ বাক্য বলিতে সক্ষম। শাহ্‌এর ফলক-লিপিতে, বাহাউল্লা' বলিতেছেন:—

"রাজন্‌, আমি মানব-সমাজে সাধারণ মানবের মতই সুখশয্যায় নিদ্রিত ছিলাম। আচম্বিতে পরম গৌরবময়ের ঝটিকাবর্ত্ত আমার পার্শ্ব

দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এই পর্য্যন্ত যাহা কিছু পৃথিবীতে প্রকাশ হইয়াছে তাহার জ্ঞান আমাকে শিক্ষা দিল। এই কথা আমা হইতে নহে, কিন্তু সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর হইতে। তিনিই আমাকে স্বর্গমর্ত্ত্যে তাঁহার পুণ্যবাণী প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছেন। সেই আদেশ পালন করিতে আমার উপর যে সমস্ত বিপদাপদ ঘটিয়াছে, তাহা দেখিয়া 'যাহারা জানে' তাহাদের চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি যে বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, আমি তাহা কিছুই জানি না, আমি তাহা অধ্যয়ন করি নাই। যে নগরে আমার বাসস্থান সেখানকার অধিবাসীগণ হইতে আপনি অনুসন্ধান করিয়া লউন,—আপনি নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন, আমি কখনও মিথ্যাবাদী নহি। * * * প্রকাণ্ড মহীরুহের অসংখ্য পত্ররাজির মধ্যে আমি মাত্র একটি সামান্য পত্র, তদপেক্ষা অধিক কিছুই নহি; সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ বায়ুতে আমি আন্দোলিত হইয়াছি। চতুর্দ্দিকে যখন ভীম বাত্যা গর্জ্জন করিয়া প্রবহমান্ হয়, পত্রগুলি কি নিশ্চল থাকিতে পারে? সর্ব্বনাম-হেতু, সর্ব্ববিশেষণের বিশেষ্য সেই সর্ব্বকারণ ঈশ্বরের নাম লইয়া বলিতেছি, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। বরং, বাত্যাগুলি নিজের ইচ্ছামত তাহাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই উড়াইয়া ফেলে; সেই পরমচিরন্তন, পরম-শাশ্বত পুরুষের সমক্ষে অন্য সমস্তই সত্তাহীন। তাঁহার সমীপ হইতে আমার প্রতি চুড়ান্ত আদেশ আসিল, সর্ব্ব-লোকে তাঁহার পুণ্য নামের জয়গান করিতে। আমার নিজের ইচ্ছাশক্তি তাঁহার আদেশের সমক্ষে বিলুপ্ত হইয়াছে; তাঁহার যে পথে ইচ্ছা সে পথে আমাকে পরিচালিত হইতে হয়। নতুবা, কি নিজের ক্ষুদ্র মানবীয় দায়িত্ব লইয়া কেহ এমন কিছু বলিতে পারে বা করিতে সাহসী হয়, যাহার জন্য উচ্চ, নীচ সকলেই তাহাকে নির্য্যাতন করিবে, তাহার প্রতি অত্যাচার করিবে?

যিনি এই লেখনীকে চিররহস্যময় শাশ্বত শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার নাম লইয়া বলিতেছি, যে ব্যক্তি সেই পরম শক্তিমানের শক্তি দ্বারা শক্তিমান্ নহে, সে ব্যক্তি কখনই এরূপ করিতে পারে না।"—(পথিকের কাহিনী, পৃঃ ৩৯৫)

যীশুখৃষ্ট যেমন তাঁহার শিষ্যদিগের পদ-প্রক্ষালন করিয়া দিতেন, বাহাউল্লা'ও সেইরূপ তাঁহার অনুগামীদের জন্য রন্ধন করিতেন ও অন্যান্য নানারূপ ভৃত্যজনোচিত কার্য্য অনেক সময় করিতেন। তিনি ভৃত্যগণের ভৃত্য, ভৃত্যত্বেই গৌরব বোধ করিতেন। প্রয়োজন হইলে ঘরের খালি মেজেই নিদ্রা যাইতেন, মাত্র শুষ্ক রুটী ও জল খাইয়াই জীবনধারণ করিতেন, এবং অনেক সময় তিনি বিনা আহারে কাল অতিবাহিত করিতেন; ক্ষুধাকে তিনি বলিতেন—"স্বর্গীয় পরিপুষ্টি"। মানব ও বিশ্ব-প্রকৃতিকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সাধু, সন্ত, অবতার ও শহীদগণের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম সমস্ত পদার্থেই তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মানবীয় সত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, ঈশ্বরের বাণী অবতরণের জন্য মুখ ও লেখনী স্বরূপ প্রযুক্ত হইতে। তিনি স্বেচ্ছাপরবশ হইয়া এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ শত সহস্র প্রকারের দুঃখকষ্টসঙ্কুল পদবী গ্রহণ করেন নাই। যীশুখৃষ্ট যেমন বলিয়াছিলেন—"হে পিতৃদেব, যদি সম্ভব হয়, এই কর্ত্তব্য সম্পাদনের পান-পাত্র আমার নিকট হইতে অন্যের নিকট সংক্রামিত হউক", সেইরূপ বাহাউল্লা'ও বলিতেছেন:—"যদি কোনো উপযুক্ত বক্তার বা ব্যাখ্যাতা পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমি কখনই নিজেকে এরূপ সর্ব্ববিধ নির্য্যাতন, অসম্মান ও উপহাসাস্পদ করিতাম না" ("ইশ্‌রকাত"এর ফলক-লিপি)। ঈশ্বরের আহ্বান সুস্পষ্ট ও প্রভুত্বব্যঞ্জক ছিল; তিনি তাহা মর্ম্মে ধারণ করিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা, ঈশ্বরের সন্তোষেই

তাঁহার আনন্দ; সুতরাং, জ্বলন্ত সম্মতি সহকারে তিনি ঘোষণা করিলেন :— "আমি নিঃসন্দেহে বলিতেছি, ঈশ্বরের পথে আমার যাহাই ঘটুক না কেন, তাহাই আমার প্রাণের একান্ত প্রিয়বস্তু, এবং আমার আত্মার অন্তরতম অভিলাষ; তাঁহার পথে ভীষণ হলাহলও অমৃত তুল্য, তাঁহার নামে যে নির্য্যাতন, তাহা শীতল ও স্বাস্থ্যপ্রদ পানীয় তুল্য।"—(বৃক পুত্রের প্রতি ফলক-লিপি, পৃঃ ১৭)

বাহাউল্লা' কখনও কখনও ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নরূপে, একাত্ম হইয়া বাক্য উচ্চারণ করিতেন; এই সম্পর্কে পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। এইরূপ বাক্যালাপের সময়ে তাঁহার মানবীয় সত্তা এত অধিক লোপপ্রাপ্ত হইত যে, তাহা একেবারে থাকিত না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার মধ্যস্থতায় ঈশ্বর তাঁহার ভৃত্যগণকে আহ্বান করিতেছেন, তাহাদের প্রতি তাঁহার প্রেম জ্ঞাপন করিতেছেন, তাহাদিগকে তাঁহার গুণাবলী শিক্ষা দিতেছেন, তাহাদের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন, তাহাদের পথপ্রদর্শক তাঁহার অনুশাসন-আইন ঘোষণা করিতেছেন এবং তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, যেন তাহারা তাঁহাকে ভালবাসে, ভক্তি ও সেবা করে।

বাহাউল্লা'র গ্রন্থাবলীতে দেখা যায়, তাঁহার বাক্য এইরূপ এক ধরণ হইতে অন্য ধরণে অনেক সময়েই রূপান্তরিত হইত। তিনি মানবরূপে বাক্য বলিতে বলিতে হঠাৎ এই ভাবে বলিতেছেন, যেন তিনি নাই, ঈশ্বর স্বয়ংই বাক্যালাপ করিতেছেন। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে যখন বাহাউল্লা' মানবরূপে কথা বলিতেন, তখনও তিনি ঈশ্বরের দূত হিসাবে, তাঁহার ইচ্ছাতে একান্ত অনুরক্ত প্রাণ হইয়াই বাক্যালাপ করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার সমস্ত জীবনই সেই পবিত্রাত্মার শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। প্রাত্যাহিক, দৈনন্দিন কার্য্যেও

তাহার পরিচয় সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যাইত। এই কারণে তাঁহার মানবীয় রূপ এবং ঐশ্বরিক রূপ, উভয়ের মধ্যে সীমারেখা অঙ্কিত করা সম্ভব নহে। ঈশ্বর তাঁহাকে বলিতেছেন ঃ—

"ব'ল, 'আমার দেহ-মন্দিরে ঈশ্বরের শ্রীনিকেতন ব্যতীত, আমার সৌন্দর্য্যে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ব্যতীত, আমার অস্তিত্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যতীত, আমাতে তিনি স্বয়ং ব্যতীত, আমার সঞ্চরণে তাঁহার সঞ্চরণ ব্যতীত, আমার অধিষ্ঠানে তাঁহার অধিষ্ঠান ব্যতীত, আমার লেখনীতে তাঁহার পরম-শ্রেষ্ঠ লেখনী ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না'। "ব'ল, 'আমার আত্মায় পরম-সত্য ব্যতীত আর কিছুই নাই, এবং আমাতে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না।"—(সুরাতুল-হায়্‌কল্‌)

বাহাউল্লা'র আবির্ভাবের উদ্দেশ্য

বাহাউল্লা'র জীবন-ব্রত ছিল, পৃথিবীতে সমস্ত মানবজাতির মধ্যে একত্ব ও একতা প্রতিষ্ঠিত করা, অর্থাৎ, মানবীয় ঐক্যকে অস্তিত্বে সমাগত করা। তিনি ঈশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে বলিতেছেন ঃ—

"জ্ঞান-বৃক্ষের সর্ব্ব-প্রভাময় ফল এই মহান্‌ বাণী ঃ তোমরা সকলেই একই বনস্পতির ফল, একই শাখার পত্রনিচয়। আমার দেশকে আমি ভালবাসি, ইহা বলিয়া যেন কোনো ব্যক্তি অহঙ্কার না করে; মানব-জাতিকে ভালবাসাই একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহাতেই উল্লাস করা উচিত।"

পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারগণ সকলেই পৃথিবীতে শান্তি ও মৈত্রীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং তাহা সত্বর প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই

স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে এই পরম-কাম্য-অবস্থা সমাগত হইবে ভাবীকালে ঈশ্বর আবির্ভূত হইবার পরে, যখন দুরাত্মাগণ শাস্তিলাভ করিবে ও পুণ্যাত্মাগণ পুরস্কৃত হইবেন।

জোরোয়াষ্টার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিয়াছেন, তিনসহস্র বৎসর যুদ্ধ বিগ্রহ, বিবাদ-বিসম্বাদ পৃথিবীতে চলিবে, তাহার পর শাহ্‌বাহ্‌রাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া শয়তান আহ্‌রিমান্‌কে পরাস্ত করিয়া পৃথিবীতে ন্যায়পরতা ও শান্তির অখণ্ড রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানবকুলকে ত্রাণ করিবেন।

মুসা বলিয়াছিলেন, য়িস্রায়েলের বংশধরগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্ব্বাসন, অত্যাচার ও নির্য্যাতন ভোগ করিবার পর, বাহিনীগণের প্রভু আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে একত্র করিবেন, অত্যাচারীদিগকে ধ্বংস করিবেন ও তাঁহার রাজত্ব পৃথিবীতে প্রবর্ত্তন করিবেন।

যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন ঃ—"মনে করিও না যে আমি শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি। বরঞ্চ, ইহা বলা যাইতে পারে যে আমি শান্তির পরিবর্ত্তে তরবারিই আনয়ন করিয়াছি" (মথি, ১০,৩৪)। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিয়াছিলেন, যে বহুকাল ব্যাপী যুদ্ধ চলিবে, যুদ্ধের সম্ভাবনায় পৃথিবী সততই উচ্চকিত থাকিবে, দারুণ দুঃখ-ক্লেশে জর্জ্জরিত হইবে, যতদিন না মানবপুত্র পরমপিতার প্রভায় দেখা দিবেন।

মোহাম্মদ বলিয়াছিলেন যে তাহাদের পাপের শাস্তি ভোগ করিবার জন্য, য়িহুদী ও খৃষ্টীয়ান, উভয়ের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেশের বীজ ঈশ্বর বপন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারা নানারূপ আত্মকৃত কলহে ব্যাপৃত থাকিবে, যতদিন না "কেয়ামত" অর্থাৎ পুনরুত্থানের দিনে সকলের বিচার করিবার জন্য তিনি আবির্ভূত হইবেন।

অপর পক্ষে, কিন্তু বাহাউল্লা' ঘোষণা করিয়াছেন যে সমস্ত পূর্ব্বগামী অবতারগণের প্রতিশ্রুত পুরুষ তিনি স্বয়ং, তিনিই ঈশ্বরের প্রকাশ, তাঁহার যুগেই শান্তির রাজত্ব সত্যসত্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে। এরূপ ঘোষণা-বাক্যের তুলনা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে কুত্রাপি মিলে না; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত অবতারগণের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে ও সম-সাময়িক যুগের যে সমস্ত লক্ষণ ও চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে বাহাউল্লা'র ঘোষণা-বাক্য মিলিয়া যায়। বাহাউল্লা' মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার উপায়-গুলি সুস্পষ্ট বিশদ ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সত্য বটে, বাহাউল্লা'র আবির্ভাবের পরে, আজ পর্য্যন্ত, অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছে, সত্য বটে, ধ্বংসলীলা এই যুগে এরূপ বৃহদায়তনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে যে পূর্ব্ব-যুগের যুদ্ধগুলি ইহার নিকটে অতি সামান্য। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমস্ত অবতারগণই বলিয়াছেন, ঈশ্বর যেদিন আবির্ভূত হইবেন, সেই দিনের প্রভাত অতীব ভয়ঙ্কর হইবে; সুতরাং আমাদের সম-সাময়িক যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে ইহাই দৃঢ়তার সহিত উপলব্ধ হয় যে ঈশ্বরের আবির্ভাবের কাল মাত্র যে সমাগত, তাহা নহে, ঈশ্বরও সমাগত হইয়াছেন।

যীশুখৃষ্টের উপাখ্যান অনুসারে দ্রাক্ষার উদ্যানের মালিক, দুষ্ট চাষী-গণকে সংহার করিয়া তাহার পর, যে সমস্ত চাষীগণ নিয়মিতভাবে মালিকের প্রাপ্য যথাসময়ে বুঝাইয়া দিবে, তাহাদের হস্তে উদ্যান-কর্ষণের ভার অর্পণ করিবেন। এই উপাখ্যানের তাৎপর্য্য কি এই নয় যে ঈশ্বর আবির্ভূত হইলে, স্বেচ্ছাতান্ত্রিক রাজত্বগুলি, অর্থগৃধ্নু, কুসংস্কারান্ধ পুরোহিত সম্প্রদায়, মোল্লাগণ ও যথেচ্ছাচারী জননায়কগণ, যাহারা পৃথিবীতে দুঃশাসনের যুগ প্রবর্ত্তন করিয়া পৃথিবীর ফসল আত্মসাৎ করিতেছে, সকলেই সমূলে বিনষ্ট হইবে?

অনেক ভয়াবহ ঘটনা ঘটিতে পারে, এবং দারুণ ও অতুলনীয় দুঃখ-কষ্টে, মন্বন্তর-সঙ্কটে, পৃথিবী নিপীড়িত হইতে পারে, কিন্তু বাহাউল্লা' আমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন,—"অনতিবিলম্বেই এই সমস্ত ব্যর্থ যুদ্ধ-বিগ্রহ, এই সর্ব্ব-ধ্বংসকারী মহাসমর-লীলা অতিক্রম করিয়া পৃথিবী শান্তির কুলায়ে পৌছিবে, তখন চির-আনন্দময় মহাশান্তি পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে"।

মানবকুল এই যুদ্ধ-বিগ্রহের আবর্ত্ত হইতে হয় উদ্ধারলাভ করিবে, নতুবা এই আবর্ত্তের মধ্যে সমাধি-লাভ করিবে।

"দিন আগত ঐ" এবং প্রতিশ্রুত পরিত্রাতা বাহাউল্লা'ও সমাগত হইয়াছেন।

বাহাউল্লা'র ফলকলিপি ও পুস্তকাবলী

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের পার্থিব, অপার্থিব সমস্ত বিষয়, সর্ব্বপ্রকারের সমস্যাই বাহাউল্লা'র গ্রন্থাবলীতে অতি ব্যাপকভাবে আলোচিত হইয়াছে। মানুষের জীবনের যতগুলি দিক থাকা সম্ভব, বাহাউল্লা' তাহার কোনোটিকেই উপেক্ষা করেন নাই। তিনি প্রাচীন ও বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দূর ও অদূর ভবিষ্যতের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছেন।

তাঁহার জ্ঞানের পরিধি, বিস্তৃতি ও পূর্ণতা অতীব বিস্ময়কর ছিল। তিনি তাঁহার প্রশ্ন-কর্ত্তাদিগকে তাহাদের আপন আপন ধর্ম্মগ্রন্থের বাণী উদ্ধৃত করিয়া ধর্ম্ম-তথ্য সম্বন্ধে এমন বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও অর্থ করিয়া দিতেন যে তাহাতে তাহাদের কোনও সংশয় থাকিত না, তাহারা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইয়া যাইত। অনেক ধর্ম্মের পবিত্র গ্রন্থ

যে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাও বলা যায় না, অথচ এই সমস্ত ধর্ম্মের নিহিত সত্য সম্বন্ধেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি অসাধারণ ছিল। তিনি "বৃক পুত্র" নামক ফলক লিপিতে বলিয়াছেন যে তিনি বা'বের গ্রন্থাবলীও পাঠ করিবার সময় ও সুযোগ পান নাই; অথচ তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, বা'বের প্রকাশিত বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণে তাঁহার কি অগাধ পারদর্শিতা ও ব্যুৎপত্তি ছিল।

অধ্যাপক ব্রাউন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বাহাউল্লা'র সহিত চা'রবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; প্রত্যেকবার উভয়ের মধ্যে বিশ কি ত্রিশ মিনিট-কাল আলাপ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, আর কখনও পাশ্চাত্য সুধীদিগের সহিত বাহাউল্লা'র আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয় নাই। তথাপি, তাঁহার ফলকলিপি ও পুস্তকাবলী হইতে বুঝিতে পারা যায়, পাশ্চাত্য জগতের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান কত গভীর ও প্রগাঢ় ছিল। এমন কি, তাঁহার শত্রুদিগকেও স্বীকার করিতে হইত যে তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অসাধারণ। দীর্ঘকালব্যাপী তাঁহার করাবরোধের কাহিনী এতই সর্ব্বজনপরিচিত যে তাঁহার পুস্তকাবলীতে আমরা যে জ্ঞান-সম্ভারের পরিচয় লাভ করি, তাহা যে কোনো ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্যে সঞ্চিত, অধ্যয়নার্জ্জিত নহে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ থাকে না। (১)

---

(১) যখন আব্দুল্‌বাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, বাহাউল্লা' পাশ্চাত্য গ্রন্থাবলী বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন করিয়া পাশ্চাত্য নীতি ও যুক্তি অনুসারে তাঁহার ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কি না, তখন আব্দুল্‌বাহা উত্তর দেন যে বাহাউল্লা'র গ্রন্থ ষাট বৎসর পূর্ব্বে লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল ও সে সমস্ত গ্রন্থে যে সমস্ত আদর্শ ও চিন্তাধারার

কখনও কখনও বাহাউল্লা' বর্ত্তমান পারস্যের কথ্য-ভাষা তাঁহার গ্রন্থাবলীতে ব্যবহার করিতেন। তাহাতে তাঁহার গ্রন্থ তাঁহার স্বদেশবাসী সাধারণ ব্যক্তিবর্গের নিকট অনায়াসবোধ্য হইত; এই ভাষা নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ পার্‌সিক্ ভাষা নহে, কারণ, ইহা আর্‌বী-মিশাল। অন্য সময়ে, যখন তাঁহাকে জোরায়াষ্ট্রীয়াণ পণ্ডিত ব্যক্তিগণের বোধার্থ লিখিতে হইত, তখন তিনি বিশুদ্ধ, প্রাচীন পার্‌সিক্ ভাষা ব্যবহার করিতেন। আর্‌বী ভাষাতেও তাঁহার সমধিক ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহাতেও তাঁহার রচনাশক্তি সমানই সাবলীল ছিল।

কখনও কখনও তিনি সাধারণ্যে কথিত আর্‌বী ভাষাতে সরল ভাবে লিখিতেন, কখনও কখনও আবার "কোরাণের" অনুরূপ বিশুদ্ধ আর্‌বী ভাষাতে লিখিতেন। নানারূপ লিখন-ভঙ্গী ও নানারূপ ভাষার উপর আধিপত্য এক্ষেত্রে সত্য সত্যই বিস্ময়কর ছিল, কারণ, তিনি বিদ্যালয়ে বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চিরাচরিত প্রথা অনুসারে কোনো দিনই শিক্ষা লাভ করেন নাই।

তাঁহার কোনো কোনো গ্রন্থে ধর্ম্মপথ এতই সরল ভাষায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে "পথচারী মূর্খেরও তাহা বুঝিতে কোনো রকমের সন্দেহ বা ভ্রান্তি ঘটিতে পারে না" (য়িশায়হ ৩৫,৮)। আবার, তাঁহারই কোনো কোনো পুস্তকে কাব্য-সম্মত উপমার প্রাচুর্য্য, গভীর দার্শনিক তথ্য ও মুসলমান, জোরোয়াষ্ট্রীয়াণ ও অন্যান্য নানা ধর্ম্মের বিবৃত মতবাদ, পার্‌সিক্ ও আর্‌বী সাহিত্যের কথা ও উপকথা প্রভৃতি নানা

উল্লেখ আছে, তাহা তদানীন্তন কালের পাশ্চাত্য জগতে অচিন্তিত, অজ্ঞাত ছিল এবং পাশ্চাত্য জগতে সেগুলি মাত্র বর্ত্তমান সময়ে প্রসার লাভ করিয়াছে।

সুধীজনোচিত বিষয়ে সমৃদ্ধ; এগুলি কবি, দার্শনিক বা পণ্ডিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না। অধিকারী-ভেদে তাঁহার গ্রন্থাবলীও বিভিন্ন; তাঁহার কতিপয় পুস্তক আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চস্তর সমূহ অবলম্বনে লিখিত, যাঁহারা নিম্নস্তর অতিক্রান্ত হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই তাহা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারেন। তাঁহার গ্রন্থবাজী খাদ্য সম্ভারে পরিপূর্ণ মেজের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে, যাহা বিবিধ আহার্য্য ও সুমিষ্ট দ্রব্যে সুশোভিত, যাহা প্রকৃত সত্যান্বেষীর পক্ষে প্রয়োজনীয় ও উপাদেয়।*

এই কারণে, তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষিত সম্প্রদায়ে, আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন কবিগণের সমাজে ও সর্ব্বজন-পরিচিত লেখকদিগের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, সুফী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেক নেতা, সাহিত্যানুরাগী রাজকর্ম্মচারী ও রাজ অমাত্যগণও তাঁহার বাক্যে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার মুখ্য কারণ এই যে আধ্যাত্মিক ভাবের গভীরতা, ভাষার লালিত্য, বাণীর মাধুর্য্য, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার বাক্যাবলী অন্য সকল লেখকের রচনা হইতে শ্রেষ্ঠ।

বাহাই ধর্ম্মের প্রভাব

সুদূর আক্কার কারাগার হইতে বাহাউল্লা' তাঁহার জন্মভূমি পারস্যকে জাগাইয়া তুলিলেন, দেশের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিলেন। আর, শুধু পারস্য নহে; তিনি পারস্যের মাঝ দিয়া পৃথিবীতে নবজাগরণ আনয়ন করিলেন। এখনও সেই জাগরণের স্পন্দন নিত্য নূতন দিকে অনুভূত হইতেছে। যে প্রেরণায় তাঁহাকে ও তাঁহার অনুগামীগণকে অনুপ্রাণিত করিল, তাহা যদিও সৌজন্য, সাধুতা ও সর্ব্বাবস্থায় সন্তোষ থাকার প্রেরণা, তত্রাচ বিস্ময়কর সঞ্জীবনী ও অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন

ছিল। বাহাই ধর্ম্মের প্রভাবে যে আসিল, তাহার পক্ষে অসম্ভব সম্ভব হইল, তাহার প্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল, সে নবজীবন প্রাপ্ত হইল। বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীগণ প্রেম, বিশ্বাস ও উৎসাহে এতই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহারা পার্থিব সুখ-দুঃখকে ধূলার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর মনে করিতে লাগিল। তাহারা নির্ভিকভাবে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, প্রশান্ত মনে, এমন কি, উজ্জ্বল আনন্দ সহকারে জীবনব্যাপী নির্য্যাতন ও কঠোরতম মৃত্যু-যন্ত্রণার সম্মুখীন হইতেছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে বাহা'ই ধর্ম্মাবলম্বীদের হৃদয় নবজীবন স্পন্দনে এতই আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে অত্যাচারীদের প্রতি কোনোরূপ বিদ্বেষ ভাব বা শত্রু ভাব তাহাদের মনে স্থান পাইতেই পারে নাই। আত্মরক্ষার্থেও বল প্রয়োগ করা তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহারা আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কখনও কোনো শোক প্রকাশ করে নাই; বরং এই প্রভাময় নবধর্ম্ম গ্রহণের সুযোগ ও সৌভাগ্যে তাহারা আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিল এবং আপন বুকের রক্তপাত করিয়া এই ধর্ম্মের সত্যতা সপ্রমাণ করিয়াছিল। পরম কারুণিক, পরমেশ্বর মানুষের মুখ দিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন, তাহাদিগকে তাঁহার ভৃত্য ও বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তিনি পৃথিবীতে আপন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ জর্জ্জরিত এই সংসারে পরম শান্তি প্রবর্ত্তিত করিতে আসিয়াছেন,—ইহা তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিত; এই বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তাহাদের হৃদয়ে অনুক্ষণ অপার আনন্দ বিরাজ করিত।

বাহাউল্লা' তাঁহার অনুগামীগণকে এইরূপ বিশ্বাসেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তিনি বা'বের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নিজের আবির্ভাব ঘোষণা করিয়াছিলেন। বাহাউল্লা'র মহান্ অগ্রদূতের অক্লান্ত পরিশ্রম

ধন্য হউক,—সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল, সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাহাদের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করিয়া, সরল ও পবিত্র হৃদয় লইয়া ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত প্রভার আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতেছিল। দারিদ্র্য, বন্ধন, শৃঙ্খল, উৎপীড়ন, অপমান তাহাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের প্রভাকে লুক্কায়িত করিতে পারে নাই; বরং এই সমুদয় পার্থিব ভয়াবহ অবস্থার দ্বারাই তাঁহার প্রকৃত প্রভা অধিকতর উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান্ হইয়াছিল।

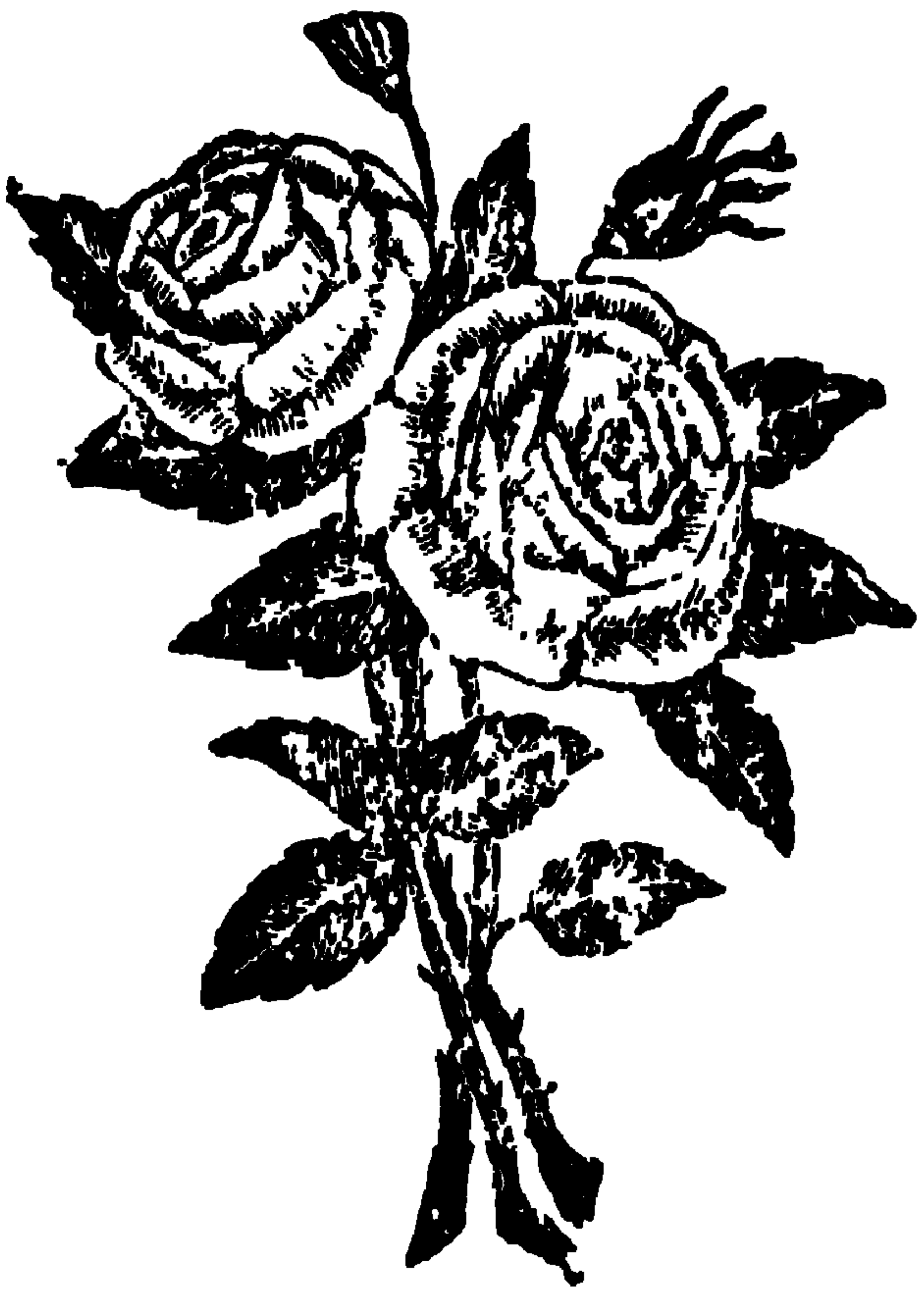

চতুর্থ অধ্যায়

আব্‌দুল্‌বাহা

"যখন আমার উপস্থিতি-সাগরে ভাটা পড়িবে, যখন আমার উন্মেষলিপি সম্পূর্ণ হইবে, তখন তোমরা, যাঁহাকে ঈশ্বর মানস করিয়াছেন তাঁহার দিকে ফিরিও, যিনি এই প্রাচীন মূল হইতে উদ্ভূত।"—(বাহাউল্লা')

জন্ম ও বাল্যকাল

বাহাউল্লা'র জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্বাস এফেন্‌দি পরে আব্‌দুল্‌বাহা (অর্থাৎ "বাহা"র ভৃত্য) উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সেই নামেই তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখে অর্থাৎ ১২৬০ হিজ্‌রীর জমাদিয়াল-আউওয়াল মাসের ৫ম দিবসে, বৃহস্পতিবার রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি ত্বেহেরাণ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন,—যেসময়ে বা'ব তাঁহার আবির্ভাব-বাণী ঘোষণা করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়েই আব্‌দুল্‌বাহার জন্ম হইল।

তাঁহার যখন আট বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতা ত্বেহেরাণের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন; সেই বয়সেও তিনি তাঁহার পিতার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। উন্মত্ত জনতাসঙ্ঘ তাঁহাদের বাসগৃহ ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল, পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি লুট করিয়া লইল, তাঁহারা সকলেই নিঃসম্বল, কপর্দ্দকহীন অবস্থায় পতিত হইলেন। আব্‌দুল্‌বাহা বলিয়াছেন, এই সময়ে একবার তাঁহাকে কারাগারের চত্বরে তাঁহার পিতার সহিত

সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। আব্‌দুল্‌বাহা দেখিলেন, তাঁহার পিতৃদেবের ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তিনি এতই অসুস্থ যে তিনি অতি কষ্টে হাঁটিতে পারিতেছিলেন, তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু অতি অপরিচ্ছন্ন, মলিন হইয়া পড়িয়াছে, একটি গুরুভার লৌহ-বেষ্টনী গলদেশে আবদ্ধ থাকায় তাঁহার গলা ফুলিয়া গিয়াছে, লৌহশৃঙ্খলের ভারে তাঁহার সমস্ত শরীর নুইয়া পড়িয়াছে। এই নিদারুণ দৃশ্য, বালক আব্‌দুল্‌বাহার সুকুমার, তরুণ হৃদয়ে অবিস্মরণীয়রূপে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া রহিল।

বাহাউল্লা' যখন প্রকাশ্যভাবে তাঁহার অবতারত্ব ও তাঁহার ধরাধামে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সর্ব্বজন সমাজে প্রকটিত করেন, তাহার দশ বৎসর পূর্ব্বে, বগ্‌দাদে বাসের প্রথম বৎসরে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, অনুধাবন ও পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতাশালী মাত্র নয় বৎসরের বালক আব্‌দুল্‌-বাহা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইলেন যে, সমস্ত বা'বাগণ যে মহাপুরুষের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাঁহার পিতৃদেব বাহাউল্লা'ই সেই প্রতিশ্রুত অবতার। এই গুরুতর আবিষ্কারের আনন্দে, তাঁহার পিতৃদেবের অবতারত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবার ফলে, তাঁহার হৃদয় কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ-উল্লাসে আপ্লুত হইয়া পড়িল, সে সম্বন্ধে তিনি প্রায় ৬০ বৎসর পরে এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন ঃ—

"আমি প্রভু বাহাউল্লা'র একজন অতি দীন ভৃত্য। যখন বগ্‌দাদে ছিলাম, তখন আমার শৈশবাবস্থা অতিক্রান্ত হয় নাই; তখন 'প্রভু বাহাউল্লা' আমার নিকট সেই পরমবাণী উচ্চারণ করিলেন; আমি তাঁহাতে বিশ্বাসী হইলাম। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার পুণ্যচরণ প্রান্তে নিপতিত হইয়া কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করিলাম, তাঁহার পুণ্য পথে আমার এই ক্ষুদ্র জীবন বলিস্বরূপ গ্রহণ করিতে। আত্মবলি!

এই বাক্যটি কত সুন্দর! আমার জন্য ইহা হইতে মহত্তর অবদান আর কি হইতে পারে! তাঁহার কারণে এই গলদেশ শৃঙ্খলে ভূষিত হইবে, তাঁহার প্রেমের দরুণ এই চরণদ্বয় নিগড়ে আবদ্ধ হইবে, তাঁহার ধর্ম্মের জন্য এই পার্থিব দেহ ছেদিত, বিচ্ছেদিত হইবে, কি সমুদ্র গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা অপেক্ষা মহত্তর গৌরবের বিষয় আমি আর কি কল্পনা করিতে পারি! যদি আমরা সত্য সত্যই তাঁহার প্রকৃত প্রেমিক হইয়া থাকি,—যদি বাস্তবিকই আমি তাঁহার খাঁটি ভৃত্য হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমার জীবন, আমার সর্ব্বস্ব, তাঁহার পবিত্র বেদিমূলে বিসর্জ্জন দিতে অবশ্যই পারিব।"—(মীর্জ্জা আহামদ সোহ্রাবের রোজ্‌নাম্‌চা, জানুয়ারী, ১৯১৪)

এই সময় হইতেই আব্‌দুল্‌বাহার বন্ধুগণ তাঁহাকে "ঈশ্বরের রহস্য", এই নামে ডাকিতে আরম্ভ করিল। এ নাম বাহাউল্লা'ই তাঁহাকে দিয়াছিলেন। বগ্‌দাদে বাসকালে এই নামেই তিনি সাধারণতঃ অভিহিত হইতেন।

যখন তাঁহার পিতৃদেব দুই বৎসরের জন্য বন-গমন করিলেন, তখন আব্বাস্ (আব্‌দুল্‌বাহা) ভগ্ন-হৃদয়ে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রধান সান্ত্বনাস্থল ছিল, বা'বের ফলকলিপিগুলি নকল করা ও সেগুলি কণ্ঠস্থ করা; তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত নিঃসঙ্গ আরাধনায়। পরে, যখন বাহাউল্লা' অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, বালক আব্‌দুল্‌বাহা আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

যৌবন

সেই সময় হইতে, তিনি সততই তাঁহার পিতার সঙ্গে থাকিতেন; তিনি বাহাউল্লা'র সঙ্গী, এমন কি রক্ষক হইয়া উঠিলেন।

যদিও তখন তাঁহার মাত্র যৌবনাবস্থা, তথাপি তিনি আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেবের নিকটে বহুসংখ্যক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিত; আব্‌দুল্‌বাহাই তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া আলাপ-আলোচনা করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। যদি তিনি আলাপ করিয়া বুঝিতেন, আগন্তুক ব্যক্তি বাস্তবিকই সত্য-সন্ধানী তাহা হইলে তিনি তাহাকে বাহাউল্লা'র নিকটে লইয়া যাইতেন; কিন্তু যদি তিনি বুঝিতে পারিতেন, আগন্তুক ব্যক্তি সত্যান্বেষী নহে, তাহা হইলে তিনিই তাহাকে বিদায় দিতেন, বাহাউল্লা'কে অকারণে বিরক্ত করিবার সুযোগ সে পাইত না।

অনেক সময়, সমাগত ব্যক্তিবর্গ বাহাউল্লা'কে যে সমস্ত প্রশ্ন করিতেন, তাহার উত্তর-প্রদান বিষয়ে আব্‌দুল্‌বাহা, বাহাউল্লা'কে সাহায্য করিতেন ও দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিদের বিবিধ কঠিন সমস্যার সমাধান তিনিই করিয়া দিতেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

একজন সুফী-নেতা, আলী শাওকাৎ পাশা, বাহাউল্লা'কে প্রশ্ন করিলেন:—"একটি সর্ব্বজন-পরিচিত মুসলমান প্রবাদ-বাক্যে (হাদিছে) আছে—'আমি মর্ম্ম-নিহিত রত্ন ছিলাম'—ইহার ব্যাখ্যা কিরূপ হইবে?" প্রভু বাহাউল্লা' তখন বালক আব্বাস্ (আব্‌দুল্‌বাহা)র দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে এই বাক্যের ব্যাখ্যা লিখিতে বলিলেন। বালক আব্বাসের বয়স তখন মাত্র পনর কি ষোল বৎসর। তিনি বাহাউল্লা'র আদেশ পাইবা মাত্রই এক দীর্ঘ বিবৃতি লিখিয়া উক্ত বাক্যের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। আলী শাওকাৎ পাশা বালকের এই অদ্ভুত ক্ষমতা ও প্রতিভার নিদর্শন পাইয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। এই বিবৃতি পরে

বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত হইয়াছে, বাহাই সম্প্রদায়ের গণ্ডীর বাহিরেও এই বিবৃতিটি অপরিচিত নহে।

এই সময়ে আব্বাস্ প্রায়ই মস্জিদে গিয়া মুসলমান আচার্য্যগণের সঙ্গে ধর্ম্ম-বিষয়ক ব্যাপার লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেন। তিনি কখনও কোনো বিদ্যালয় বা কলেজে যান নাই, তিনি যাহা কিছু জানিতেন, সমস্তই তাঁহার পিতৃদেব বাহাউল্লা'র নিকট হইতে প্রাপ্ত। ঘোড়ায় চড়া তাঁহার একান্ত সখ ছিল, ইহা তিনি, বিশেষভাবে উপভোগ করিতেন।

বগ্দাদের প্রান্তদেশে, নগরীর বাহিরে, উদ্যানে বাহাউল্লা' তাঁহার অবতারত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পর হইতে আব্দুল্‌বাহা ও তাঁহার পিতৃদেবের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ নিকটতর হইয়া উঠিল, আব্দুল্‌বাহা তাঁহার পিতৃদেবের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। যখন সুদূর কনষ্টান্টিনোপ্‌ল্ অভিমুখে দীর্ঘকাল ব্যাপী যাত্রা আরম্ভ হইল, তখন হইতে যাত্রা শেষ পর্য্যন্ত, আব্দুল্‌বাহা বাহাউল্লা'র রক্ষকরূপে দিবারাত্রি তাঁহার সান্নিধ্যে অবস্থিতি করিতেন। তিনি তাঁহার গাড়ীর পার্শ্বে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেন, তাঁহার তাঁবুর নিকটে পাহারা দিতেন। যতদূর সম্ভব, তিনি তাঁহার পিতৃদেবকে সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক ও পারিবারিক দায়িত্ব ও চিন্তা হইতে মুক্তি দিয়া স্বয়ং সেগুলি গ্রহণ করিলেন, তিনিই সমস্ত পরিবারের স্তম্ভস্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

তাঁহারা আদ্রিয়ানোপল্-এ যে কয়েক বৎসর ছিলেন, সেই সময়ে তিনি আদ্রিয়ানোপল-বাসী সকলের নিকটেই অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে তিনি বিশেষরূপে ব্যাপৃত থাকায় ও ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ায় তিনি সাধারণ্যে "শিক্ষক" বলিয়া অভিহিত হইতেন। আক্কাতে,

বাহাই সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই যখন টাইফয়েড্ জ্বরে, ম্যালেরিয়া ও অতিসার রোগে আক্রান্ত, শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তিনি নিজেকে সেবাব্রতে উৎসর্গ করিলেন, রুগ্ন ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষা-কার্য্যে সমস্ত সময় নিয়োজিত করিলেন; তিনি রোগীদিগকে স্নান করাইতেন, খাওয়াইতেন, তাহাদিগের শয্যা-পার্শ্বে পাহারা দিতেন; সর্ব্বক্ষণ এইরূপ ঘোরতর পরিশ্রম করিয়া তিনি স্বয়ং অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তিনি নিজে অতিসার রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন ও প্রায় একমাস কাল তাঁহার জীবন অতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থার মাঝ দিয়া অতিক্রান্ত হইল। যেমন আড্রিয়ানোপলএ, সেইরূপ আক্কাতেও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া দীনহীন ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তিগণই তাঁহাকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত।

বিবাহ

আব্দুল্‌বাহার বিবাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বাহাই আন্দোলনের জনৈক পারসিক ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক বর্ত্তমান লেখককে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানান হইয়াছে :—

"আব্দুল্‌বাহার যৌবনে, তাঁহার বিবাহ-ব্যাপার বাহাইগণের মধ্যে স্বভাবতঃই বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি প্রশ্নরূপে আলোচিত হইত। কোথায় তাঁহার উপযুক্ত পাত্রী মিলিবে, এ সন্ধানে অনেকেই ব্যাপৃত থাকিতেন। এই সম্মান-লাভের দ্বারা পরিবারের মর্য্যাদা বৃদ্ধির আশায় অনেক ব্যক্তিই বিবাহ-সম্বন্ধ করিতে আসিল। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল, আব্দুল্‌বাহা বিবাহের সম্বন্ধে কোনোরূপ ঔৎসুক্য দেখাইলেন না বা ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না; তাঁহার ঔদাসীন্যের কারণ কেহই বুঝিতে পারিল না। অবশেষে জানা গেল, আবদুল্‌বাহার জীবন-সঙ্গিনী হইবার

জন্য একটি বালিকা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত রহিয়াছেন। য়িস্পাহান নগরীতে বা'ব এই বালিকার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাঁহার দয়াতেই এই বালিকা জন্মলাভ করিয়াছিল। বালিকার পিতা মীর্জ্জা মোহাম্মদ আলী "শহীদগণের প্রিয়", "শহীদ-কুলাবতংশ" প্রভুর সঙ্গে সম্পর্কে খুল্লতাত হইতেন; য়িস্পাহানের এক অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যক্তি তিনি। বা'ব যখন য়িস্পাহানে ছিলেন, তখন মীর্জ্জা মোহাম্মদ আলী নিঃসন্তান ছিলেন ও তাঁহার পত্নীর মাতৃ-হৃদয় সন্তানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। বা'ব এইকথা জানিতে পারিয়া মীর্জ্জা মোহাম্মদ আলীকে একটি আপেল্-ফল দিয়া বলিলেন, তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী যেন উহা ভাগ করিয়া খা'ন। স্বামী-স্ত্রী আপেল ফলটি খাইলেন; তাহার পর দেখা গেল যে তাঁহাদের বহুদিনের আশা সফল হইতে বসিয়াছে, স্বামী-স্ত্রীর পিতৃত্ব ও মাতৃত্বে উন্নীত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। যথা সময়ে, তাঁহাদের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিল, তাঁহার নাম রাখা হইল, মুনীরি' খানুম। সে'ণ্ট লিউকের সুসংবাদ গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে উল্লেখিত জন্ দি ব্যাপ্‌টিষ্টের জন্ম কাহিনীর সঙ্গে এই জন্ম-কাহিনীর তুলনা করা চলে। পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাঁহার নাম রাখা হইল, সৈয়দ য়াহ্‌য়া; ইহার পর, তাঁহাদের আরও কয়েকটি সন্তান জন্মিয়াছিল।

"যাহা হউক, কিছুকাল পরে মুনীরি' খানুমের পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, তাঁহার দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতাগণ বাহাই ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া জিল্লুস-সুলতান ও মোল্লাদিগের দ্বারা চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আত্মদান করিলেন ও সমস্ত পরিবারটিই বাহাই ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া গুরুতর অত্যাচার, নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিল; তাঁহাদের দুঃখকষ্টের অবধি রহিল না। তখন বাহাউল্লা' তাঁহাদের রক্ষার্থ অনুমতি দিলেন যে

মুনীরি' ও তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ য়াহ্য়া আক্কাতে আসিয়া তাঁহাদের নিকটে থাকিতে পারে। তাঁহারা আক্কাতে গমন করিলে পর, বাহাউল্লা' ও তাঁহার পত্নী, আব্দুল্‌বাহার মাতৃদেবী নওয়াব মুনীরি'র প্রতি অত্যন্ত সদয় ও স্নেহার্দ্র ব্যবহার করিলেন; তাহাতেই অন্যান্য ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিল, যে তাঁহাদের ইচ্ছা, মুনীরি'র সঙ্গে আব্দুল্‌বাহা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হউন। পিতৃদেব, মাতৃদেবীর যাহা ইচ্ছা, আব্দুল্‌বাহার ইচ্ছা তদ্ব্যতীত কিছু হইতে পারে না। তিনি মুনীরি'র প্রতি সাতিশয় প্রেমপূর্ণ ভাবাপন্ন ছিলেন, মুনীরি'ও তাঁহার এই গভীর প্রেমের প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করিলেন না এবং অনতিবিলম্বেই তাঁহারা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গেলেন।"

তাঁহাদের বিবাহিত জীবন অতিশয় শান্তিপূর্ণ, আনন্দময় ও সম্পূর্ণরূপে বৈষম্য-বিরহিত। বিবাহের পরিণত ফলস্বরূপ তাঁহাদের যে সমস্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কারাবাসের দীর্ঘ নির্য্যাতন-ভোগ অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের মধ্যে মাত্র চা'রটি কন্যা জীবিত আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝেন, তাঁহাদের জীবন কত সুন্দর, সুসঙ্গত, সেবাধর্ম্মে নিবেদিত।

অঙ্গীকারের কেন্দ্র

আব্‌দুল্‌বাহা যে বাহাউল্লা'র স্থলাভিষিক্ত হইবেন, একথা বাহাউল্লা' নানারূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুর অনেক পূর্ব্বে "কিতাবুল্ আক্‌দাস্"এ প্রচ্ছন্নরূপে এই কথা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। একাধিক উপলক্ষ্যে তিনি আব্‌দুল্‌বাহা'কে "আমার অঙ্গীকারের কেন্দ্র", "সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শাখা", "এই প্রাচীন মূল হইতে উদ্ভূত শাখা" ইত্যাদি

নামে অভিহিত করিতেন। সাধারণতঃ বাহাউল্লা' আব্‌দুল্‌বাহাকে "সরকারে আকা" (মাষ্টার বা [illegible] নামে অভিহিত করিতে অভ্যস্ত ছিলেন; তিনি তাঁহার পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তিদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন যে আব্‌দুল্‌বাহার সহিত বিশেষ সম্মান সহকারে আচরণ করিতে হইবে। তাঁহার প্রতিজ্ঞা-পুস্তক (কেতাব-এ-আহ্‌দ)এ তিনি অতি সুস্পষ্ট ভাষায় উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার অবর্ত্তমানে সকলে আব্‌দুল্‌বাহা'র দিকে ফিরিবে, তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া চলিবে।

"স্বর্গের আশীষপূত সুন্দর পুরুষ" (বাহাউল্লা'র আত্মীয় স্বজন ও বিশ্বাসীগণ সাধারণতঃ তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করিতেন) দেহরক্ষা করিলে, আব্‌দুল্‌বাহা তাঁহার পিতৃনির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন ও বাহাই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতৃত্বে আরূঢ় হইয়া বাহাউল্লা'র বাণীর একমাত্র প্রকৃত ব্যাখ্যাতারূপে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু ইহাতে বাহাই সম্প্রদায়ের একাংশ বিক্ষুব্ধ হইল; তাহারা তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে অসম্মত হইল। এই দলে তাঁহার কতিপয় আত্মীয়ও ছিলেন। ছুব্‌হে-আজল্‌ যেরূপ বাহাউল্লা'র প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন ও তিনি যেমন বাহাউল্লা'র বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইঁহারাও আব্‌দুল্‌বাহার প্রতি নিতান্ত বিদ্বেষাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বাসীগণের মধ্যে তাহারা একটি বিভেদ ঘটাইতে উদ্যত হইল; তাহা করিতে অক্ষম হইয়া তাহারা অবশেষে আব্‌দুল্‌বাহার বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা অভিযোগ সৃষ্টি করিয়া সেগুলি তুর্কী রাজসরকারের গোচরীভূত করিল।

পিতৃদেবের নির্দ্দেশক্রমে আব্‌দুল্‌বাহা এই সময়ে কার্ম্মেল পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে, হাইফার উপরে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। বা'বের নশ্বর দেহের স্থায়ী সমাধিরূপে এই অট্টালিকা ব্যবহৃত হইবে,

ইহাই এই অট্টালিকার উদ্দেশ্য ছিল। বাহা'ই ধর্ম্মাবলম্বীদের সভা-মণ্ডপ ও উপাসনাগারের জন্য এই অট্টালিকাতে কয়েকটি কক্ষ থাকিবে, এরূপ ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। আব্‌দুল্‌বাহার শত্রুপক্ষ তুর্কী সরকারে জানাইল যে এই অট্টালিকা দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইবে, ইহাই আব্‌দুল্‌-বাহার প্রকৃত অভিসন্ধি; তাহারা বলিল, আব্‌দুল্‌বাহা ও তাহার শিষ্য ও অনুগামীগণ এই দুর্গে সুদৃঢ়রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া তুর্কী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে ও নিকটস্থ সিরিয়া অঞ্চলে তুর্কী আধিপত্য দূর করিয়া স্বকীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবে।

পুনরায় কারাবরোধ

এই অভিযোগ ও অন্যান্য এইরূপ ভিত্তিহীন অভিযোগের ফলে, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আব্‌দুল্‌বাহা ও তাঁহার স্বজনবর্গ আক্কার প্রাচীরান্তরালে কারাগার নগরীতে পুনরায় আবদ্ধ হইলেন; এই কারাবাস সাত বৎসর-কাল চলিল। কুড়ি বৎসরের অধিককাল ধরিয়া আব্‌দুল্‌বাহা ও তাঁহার অনুচরদিগকে আক্কার নিকটবর্ত্তী স্থানে কয়েক মাইলের মধ্যে বিচরণ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল, সে স্বাধীনতা এক্ষণে প্রত্যাহৃত হইল। কিন্তু এই কারাবরোধ সত্ত্বেও তিনি বাহাই ধর্ম্মের বাণী সমগ্র এসিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকা ভূখণ্ডে প্রচারিত করিতে লাগিলেন, কারাবাস তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্য-সম্পাদন হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। এই সময়ে আব্‌দুলবাহা কিরূপে কাল অতিবাহিত করিতেন, সে সম্বন্ধে মিষ্টার হোরেস্ হলি এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"আব্‌দুল্‌বাহা ছিলেন সকলের শিক্ষক ও বন্ধু, একাধারে। সুতরাং তাঁহার নিকটে সমাগত হইত প্রত্যেক জাতির ও প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী নরনারী; তাহারা তাঁহাকে নানারূপ সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক

প্রশ্ন ও সমস্যা সম্বন্ধে উত্তর ও সমাধানের কথা জিজ্ঞাসা করিত। তাহারা নিতান্ত বন্ধুভাবে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিত; আব্দুল্‌বাহা তাহাদিগকে সম্মানিত অতিথির মত দেখিতেন ও তাহাদের সঙ্গে সেই-রূপই ব্যবহার করিতেন; কেহ মাত্র কয়েক ঘণ্টা থাকিত, কেহ বা কয়েক মাস থাকিত; তারপরে তাহারা নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত হইয়া স্বকীয় আবাসে প্রত্যাগমন করিত। পৃথিবীতে এরূপ অতিথিশালা আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় নাই।

"আব্‌দুল্‌বাহার আবাসে, ভারতবর্ষের চাতুর্ব্বর্ণ্যের কঠিন বিধি-নিষেধ বিলুপ্ত হইত, য়িহুদী, খৃষ্টীয়াণ ও মুসলমানদের তীব্র জাতীয় বিদ্বেষ বিস্মৃত হইত, গৃহস্বামী আব্দুল্‌বাহার মহান্ ব্যক্তিত্বের গুণে সকলেই যেন এক-আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হইত, আন্তর্মানবীয় মৈত্রী ব্যতীত আর সমস্ত কৃত্রিম আইন কানুনগুলি অন্তর্হিত হইত। এই দৃশ্য সম্রাট আর্থার ও তাঁহার গোল টেবিলের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে, * * * কিন্তু এই আর্থার নারী ও পুরুষ উভয়কেই, তরবারির পরিবর্ত্তে পরমবাণী দিয়া, সাহসী যোদ্ধরূপে জগজ্জয়ী হইবার জন্য পাঠাইয়াছেন, এই মাত্র পার্থক্য।"—(বর্ত্তমান সামাজিক ধর্ম্ম, পৃঃ ১৭১)

আব্দুল্‌বাহা এই সাত বৎসর কাল পৃথিবীর নানা স্থান হইতে আগত সত্য-বিশ্বাসী ও সত্য-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের প্রশ্নের ও চিটি পত্রের উত্তরে অসংখ্য পত্রাবলী লিখনে ব্যাপৃত ছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার কন্যাগণ তাঁহাকে বিলক্ষণ সহায়তা করিতেন; তাঁহার সঙ্গে দ্বিভাষী, অনুদক ও সহকারীগণ ছিল, তাহারাও যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিত।

রুগ্ন, শোকাতুর ব্যক্তিগণের আবাসে যাইয়া তাহাদিগকে শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা দান করাতে আব্দুল্‌বাহার অনেক সময় ব্যয়িত হইত। আক্কার দরিদ্রতম বস্তিতেও তিনি যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না;

সেখানকার জন-সাধারণ তাঁহাকে অতীব সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া লইত। একজন তীর্থ-যাত্রী এই সময়ে আক্কাতে গিয়াছিল; সে এইরূপ লিখিয়াছেঃ—

"প্রতি সপ্তাহে, শুক্রবার সকালে, আব্‌দুল্‌বাহা দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে ভিক্ষা পরিবেশন করিতেন। ইহা ছিল তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে, নিজের সামান্য সঞ্চয় হইতেই তিনি সমাগত ভিক্ষুকদিগের প্রত্যেককে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

আজ সকালে, আব্‌দুল্‌বাহার গৃহ-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল, প্রায় একশত ব্যক্তি। শ্রেণীবদ্ধরূপে তাহারা মাটির উপর দীনহীন ভাবে বসিয়াছিল। সর্ব্বপ্রকারের নরনারীই এই মিশ্র জনতার মধ্যে ছিল; দরিদ্র, আতুর, সর্ব্বপ্রকারে আশা, উৎসাহহীন, অর্দ্ধনগ্ন, অন্ধ, খঞ্জ ভিক্ষুকগণ, ভিক্ষা ও সাহায্যের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল। অবশেষে, তাহাদের প্রতীক্ষার অবসান হইল, আব্‌দুল্‌বাহা দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। শ্রেণীবদ্ধ সাহায্যপ্রার্থীদের একজনের নিকট হইতে আর একজনের নিকট তিনি দ্রুত পদবিক্ষেপে চলিতে লাগিলেন; তিনি কখনও বা কাহারও সম্মুখে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াইয়া তাহাকে উৎসাহ ও সান্ত্বনার বাণী শুনাইলেন, প্রত্যেক ভিক্ষার জন্য প্রসারিত হস্তে মুদ্রা গুঁজিয়া দিলেন, হয়ত কোনো শিশুর মুখে হাত দিলেন, একজন বৃদ্ধা তাঁহার গাত্রাবরণের প্রান্তদেশ ধরিয়াছিল, তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন, দৃষ্টির আলোক যাহাদের নিকটে চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল, সেই অন্ধ, বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানের আলোক দান করিলেন, যাহারা তাঁহার নিকটে কোনো কারণে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে নাই, তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের ভিক্ষাংশ অন্যের হাত দিয়া তাহাদের জন্য প্রেরণ করিলেন

ও তাহাদের জন্য প্রেম ও উৎসাহপূর্ণ বাণী দিলেন।"—(গ্লিম্প্‌স্‌ অব্‌ আব্‌দুল্‌বাহা, পৃঃ ১৩)

আব্‌দুল্‌বাহার ব্যক্তিগত অভাব অতি সামান্য ছিল। তিনি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতেন, আবার অতি প্রত্যূষে কার্য্যারম্ভ করিতেন। দিনে-রাত্রে তিনি মাত্র দুইবার আহার করিতেন। সাধারণ, অল্প মূল্যের কয়েকটি পোষাকেই তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। অপর সকলে অভাবে বাস করিতেছে জানিয়া তিনি বিলাসিতার মধ্যে বাস করিতে পারিতেন না, বিলাসিতা তাঁহার নিকটে অসহনীয় বোধ হইত।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, বালকগণ ও পুষ্প, এইগুলি তাঁহার আকর্ষণের প্রধান বিষয় ছিল। প্রত্যহ প্রভাতে, আব্‌দুল্‌বাহা ও তাঁহার পরিবারের স্বজনবর্গ, সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে প্রভাতী-চা পান করিতেন; প্রভু যখন চা পান করিতেন, তখন বালকগণ প্রার্থনা-সঙ্গীত গান করিত। মিষ্টার থর্নটন্‌ চেজ্‌ এই বালকদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"আমি এমন বিনয়-সৌজন্য-ভূষিত, একান্ত স্বার্থ-বুদ্ধি-হীন, অপরের প্রতি সহৃদয়তাসম্পন্ন, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমান্‌ বালক অন্য কোথাও দেখি নাই; তাহারা অপরের ব্যাপারে কদাচ হস্তক্ষেপ করে না; তাহারা এরূপ সংযম-শিক্ষা করিয়াছে যে প্রয়োজন হইলে, যে সমস্ত ক্ষুদ্র জিনিষ স্বভাবতঃ বালকগণের অত্যন্ত প্রিয়, সে-সমস্ত জিনিষ হইতেও তাহারা অনায়াসেই বঞ্চিত থাকিতে জানে।"—(ইন্‌ গ্যালিলী, পৃঃ ৫১)

কুসুমের সমাদর আক্কা-জীবনের বিশেষত্ব। প্রত্যেক তীর্থযাত্রীই ইহার কিছু না কিছু নিদর্শন তাহাদের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। মিসেস্‌ লুকাস্‌ লিখিতেছেন :—

"প্রভু যখন কুসুমের ঘ্রাণ সেবন করেন, তখন তাঁহাকে দেখিতে অতি বিস্ময়কর, অদ্ভুত মনে হয়। মনে হয় যেন 'হায়্যাসিন্থ' কুসুমগুলি তাঁহাকে সৌরভের ভাষায় কি কথা বলিতেছে; তিনি কুসুমরাশির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া যেন একাগ্রচিত্তে, 'কর্ণ সংযোগে একটি সুন্দর সঙ্গীত শুনিতে চেষ্টা করিতেছেন।"— (আক্কা-ভ্রমণের একটি নাতিদীর্ঘ কাহিনী, পৃঃ ২৬)

তাঁহার নিকটে যে অসংখ্য ব্যক্তি দর্শনান্বেষী হইয়া আসিত, তাহাদিগকে সুন্দর, সুগন্ধি ফুল উপহার দিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আক্কাতে অবরোধ-জীবন কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে থর্নটন্ চেজ্ নিম্নলিখিত ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—

"সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম এই কারাগারে যে মহাপুরুষ আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহার সঙ্গীরূপে আমরা পাঁচদিন এই নগরের প্রাচীরান্তরালে বাস করিলাম। এ কারাগারের অভ্যন্তরে সততই বিরাজমান শান্তি, প্রেম ও ও সেবাকর্ম্ম। সর্ব্ব-মানব-সমাজের হিতসাধন করা, জগতে শান্তি, ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও তাঁহার সন্তান, সমস্ত প্রাণীকুলের ভ্রাতৃত্ব, সর্ব্ব-সত্ত্ব-মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত করা, এতদপেক্ষা অন্য কোনো বাসনা এই কারাগারে যাঁহারা আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে, প্রকৃত কারাগার এই কারা-প্রাচীরের বাহিরে; কারণ, সেখানকার আবহাওয়াতে শ্বাস রোধ হইয়া আসে, সেখানে হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার প্রকৃত বাসনা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়, শত সহস্র পার্থিব অবস্থার বন্ধনে জর্জ্জরিত হইতে হয়; কিন্তু এই প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে ঈশ্বরের দিব্য প্রকাশ অনির্ব্বাণ জ্যোতি বিকিরণ করিতেছে, আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের স্বরূপ চির-উদ্ভাসিত রহিয়াছে। সর্ব্ববিধ দুঃখ, কষ্ট,

সাংসারিক আবর্ত্ত, ঝঞ্ঝা, এই প্রাচীর ভেদ করিয়া প্রাচীর অভ্যন্তরে শান্তি নষ্ট করিতে পারে না।"—(ইন্ গ্যালিলী, পৃঃ ২৪)

অনেকের নিকটেই এই দুঃসহ কারাগারের কষ্ট সহ্য করা বিষম দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে হইত, কিন্তু আব্‌দুল্‌বাহা তাহাতে নিতান্ত স্থির, অবিচলিত থাকিতেন। কারাবাসের সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

আমার এই কারাবাসরূপ বিপত্তির জন্য তোমরা শোক করিও না; এই কারাগারই আমার নিকটে সুশোভিত উদ্যানবৎ; ইহাই আমার স্বর্গ-নিবাস, ইহাই আমার মানব সমাজে সম্মানের উত্তুঙ্গ সিংহাসন। কারাগারে আমি যে দুঃখ-ভোগ করিতেছি, তাহাই আমার গৌরবের মুকুট, সাধু-জন-সমাজে সেই মুকুট পরিহিত হইয়াই আমি পরম উল্লাস করিতেছি।

"সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সাফল্য, স্বাস্থ্য, আনন্দ প্রভৃতি পরিতৃপ্তিকর পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সুখী হইতে সকলেই পারে; কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি দুঃখ, কষ্ট, অভাব, রোগ, অত্যাচার, নির্যাতনের মধ্যেও চিত্তের আনন্দ ও নিরুদ্বিগ্নতা অটুট রাখিতে পারে, তখন তাহাই তাহার ঐশ্বর্য্যের, তাহার আভিজাত্যের চরম পরিচয়।"—(আব্‌দুল্‌বাহার ফলকলিপি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫৮, ২৬৩)

তুর্কী অনুসন্ধান-সমিতি

১৯০৪, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তুর্কী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুসন্ধান-সমিতি নিযুক্ত হইল, আব্‌দুল্‌বাহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহা সত্য কিনা, নির্দ্ধারণ করিবার জন্য। আব্‌দুল্‌বাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদত্ত হইল। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত

অভিযোগ আনীত হইয়াছিল, তাহা খণ্ডন করিলেন, কিন্তু বলিলেন, তাহারা তাঁহার যে শাস্তি বিধান করিবে, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত; যদি তাহারা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে, রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যায়, অভিশাপ দেয়, তাঁহার উপর থুথু ফেলে, পাথর নিক্ষেপ করে, সর্ব্বপ্রকারের অপযশ, অসম্মান তাঁহার উপর স্তূপীকৃত করে, তাঁহাকে উদ্বন্ধনে হত্যা করে, অথবা গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে, তাহাতেও তিনি দুঃখিত হইবেন না।

এই অনুসন্ধান-সমিতি যখন তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সম্বন্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করিতেছিল, নানা বিভিন্ন দিনে মোকদ্দমার শুনানি হইতেছিল, তখন মধ্যবর্ত্তী সময়ে আব্‌দুল্‌বাহা অতীব নিঃশঙ্ক-চিত্তে, ঔদাসীন্য-সহকারে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কোনো প্রকারের চাঞ্চল্য লক্ষিত হইত না, তিনি পূর্ব্বের মত সৌম্য-প্রশান্ত ভাবে উদ্যানে ফলের চারা লাগাইতেন, এমন কি আধ্যাত্মিক মুক্তির আনন্দের নিঃশঙ্ক গৌরবে, তিনি একটি বিবাহ-ভোজে নেতৃত্ব করিলেন। ইটালীর "কন্‌সাল্" বলিলেন, যে তাঁহার নির্ব্বাচিত যে কোনো বিদেশী বন্দরে তিনি আব্‌দুল্‌বাহাকে সানন্দে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবেন; কিন্তু আব্‌দুল্‌বাহা ধন্যবাদসহকারে দৃঢ়-চিত্ততার সহিত এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন; তিনি বলিলেন যে তাঁহার বিচারের ফল যাহাই হউক না কেন, তিনি প্রভু বা'ব ও স্বর্গের আশীষপূত সুন্দর পুরুষের মতই অবিচলিত চিত্তে সেই চরম বিপদের প্রতীক্ষায় থাকিবেন, শত্রুগণের ভয়ে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট, আচরিত পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। কিন্তু তিনি বাহাইগণের প্রায় সমস্তকেই আক্কা নগরী ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র কোনো নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতে

উপদেশ দিলেন; কারণ, আক্কা তাহাদিগের পর অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মাত্র কয়েকজন বিশ্বস্ত, অনুরক্ত শিষ্য লইয়া তাঁহার ভাগ্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বশেষে যে অনুসন্ধান-সমিতি, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শীতকালের প্রথমাংশে আক্কাতে আসিল, তাহার সদস্য-সংখ্যা চারিজন; ইঁহারা রাজ-কর্ম্মচারী হইলেও অতিশয় দুর্নীতিপরায়ণ। তাঁহারা আক্কাতে একমাস কাল থাকিয়া তাঁহাদের তথাকথিত 'অনুসন্ধান' শেষ করিয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে ফিরিয়া গেলেন এবং তুর্কী সরকারকে রিপোর্ট করিয়া জানাইতে উদ্যত হইলেন যে আব্‌দুল্‌বাহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ হইয়াছে এবং তাঁহাকে হয় প্রাণদণ্ডে না হয় নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হউক। কিন্তু তাহারা তুর্কীতে ফিরিয়া যাইতে না যাইতে সেখানে বিপ্লব আরম্ভ হইল ও ঐ চা'র জন প্রাচীনপন্থী রাজকর্ম্মচারী তাহাদের জীবন-রক্ষা করিবার জন্য পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। "যুবক তুর্কীদল" তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিল ও তুর্কী সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম মতের জন্য যাহারা বন্দী অবস্থায় কারাগারে বাস করিতেছিল, তাহাদিগকে মুক্তি দান করিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আব্‌দুল্‌বাহা কারাগার হইতে মুক্তি-লাভ করিলেন। তাহার পরবৎসর তুর্কীর সোল্‌তান আব্‌দুল্‌হামিদ্ স্বয়ং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

পাশ্চাত্য-জগতে ভ্রমণ

মুক্তিলাভের পর আব্‌দুল্‌বাহা অবিশ্রান্তভাবে পূর্ব্ববৎ কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে তাঁহার পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। ধর্ম্মোপদেশ

দেওয়া, চিঠিপত্র লেখা, রোগী, দীনদরিদ্রের তত্ত্বাবধান ইত্যাদিরূপ যাবতীয় সেবা-কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছিল। মাত্র এই পার্থক্য হইল যে তিনি কখনো আক্কা হইতে হাইফায় যাইতেছেন, আবার কখনো সেখান হইতে আলেকজেন্দ্রিয়ায়। এইরূপে তিনবৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি পাশ্চাত্য জগতে ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন; ইহাই তাঁহার প্রথম পাশ্চাত্য-ভ্রমণের আরম্ভ। পশ্চিমে ভ্রমণ করিবার সময়ে তিনি নানা বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের সহিত মেলা মেশা করিতেন; বাহাউল্লা' বলিয়াছিলেন যে সমস্ত ব্যক্তির সঙ্গে আনন্দ সহকারে মিলিতে, মিশিতে হইবে; আব্‌দুল্‌বাহা তাহা করিয়া সে বাণী সার্থক করিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমাংশে তিনি লণ্ডন মহানগরীতে পদার্পণ করিলেন। সেখানে তিনি একমাস কাল ছিলেন ও প্রত্যহ সত্যান্বেষী ব্যক্তিদিগের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা ব্যতীত, তিনি অন্য নানাবিধ কার্য্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। "সিটি টেম্পল"এ পাদ্রী রেভারেণ্ড আর, জে, ক্যাম্পবেলের ভক্ত, উপাসক সম্প্রদায়ের নিকটে তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের সে'ণ্ট জোন্‌স নামক গির্জ্জাতে আর্চ ডীকন্ উয়িলবার ফোর্সএর উপাসক সম্প্রদায়ের নিকটেও তিনি প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি লণ্ডনের লর্ড মেয়রের সঙ্গে 'প্রাতরাশে নিমন্ত্রিত হইলেন। তিনি লণ্ডন হইতে প্যারিসে গেলেন। সেখানে তিনি প্রত্যহ প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিতেন ও নানা জাতির নানাবিধ ব্যক্তির বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ও তাহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি মিসর দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার পরের বৎসরে, বসন্ত কালে, তিনি তাঁহার আমেরিকান বন্ধুগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া আমেরিকাতে গেলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি নিউইয়র্ক নগরীতে পৌঁছিলেন। তাহার পরবর্ত্তী সাতমাস ধরিয়া তিনি সমগ্র আমেরিকায় পরিভ্রমণ করিলেন ও সর্ব্বপ্রকারের ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিলেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সমিতি, সোসিয়ালিষ্ট, মর্মন, য়িহুদী, খৃষ্টীয়াণ, ঈশ্বরের অনস্তিত্ববাদী, এস্পেরাণ্টো-ভাষা-প্রচার-সমিতি, শান্তি-স্থাপন-সমিতি, নূতন-চিন্তাধারা-প্রবর্ত্তক-সমিতি, নারী-ভোটাধিকার-সমিতি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের সভা-সমিতির সমক্ষেই তিনি বক্তৃতা দিলেন; নানাপ্রকার সম্প্রদায়ের গির্জ্জাতেও তিনি শ্রোতা-স্থান-উপলক্ষ্য-ভেদে যথোপযুক্ত বক্তৃতা দিলেন। ৫ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবার তিনি ইংলণ্ডে ছয় সপ্তাহ কাল বাস করিলেন; তিনি এই সময়ের মধ্যে লিভারপুল, লণ্ডন, ব্রিষ্টল ও এডিনবরা নগরীতে গিয়াছিলেন। এডিনবরাতে অবস্থান করিবার সময়ে তিনি এস্পেরাণ্টো ভাষা-প্রচার সমিতির সমক্ষে একটি অতীব উল্লেখ-যোগ্য বক্তৃতা দিলেন; তাহাতে তিনি ঘোষণা করিলেন যে প্রাচ্য-প্রতীচ্য-সম্মেলন-কল্পে তিনি এসিয়াবাসী বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে এস্পেরাণ্টো ভাষা শিক্ষা করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। প্যারিসে দুই মাস কাল অবস্থান করিবার পর, তিনি ষ্টুটগার্ট নগরীতে গিয়া জার্ম্মান্ বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিলেন। তাঁহার প্যারিসে অবস্থান-কাল পূর্ব্ববৎ প্রত্যহ দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা, মন্ত্রণা প্রভৃতিতে অতিবাহিত হইত। ষ্টুটগার্ট হইতে বুডাপেষ্ট ও ভিয়েনা নগরীতে গিয়া এই সমস্ত স্থানে নূতন বাহাই-ধর্ম্মের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি মিশরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; ৫ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি হাইফাতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

পুণ্যভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন

তখন তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর : দীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ পরিশ্রমের ফলে, বিশেষতঃ তাঁহার পাশ্চাত্য জগতে ভ্রমণ ও নিরন্তর আলাপ-আলোচনা-বক্তৃতা ও লিখন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার ফলে তাঁহার শরীর সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি এই নিম্নলিখিত মর্ম্মস্পর্শী বাণী প্রাচ্য-প্রতীচ্য বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সম্বোধন করিয়া লিখিলেন :—

"বন্ধুগণ, সময় সমাগতপ্রায়, আমি শীঘ্রই তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইব। আমার যাহা সাধ্য ছিল, আমি তাহা সমস্তই করিয়াছি। বাহাউল্লা'র ধর্ম্ম প্রচার-কল্পে আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া নিঃশেষ করিয়াছি। আমার জীবনের আদ্যোপান্ত আমি নিশি দিন কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছি।

"এখন আমি দেখিতে চাই, বিশ্বাসীগণ বাহাউল্লা'র ধর্ম্মের প্রচার-ভার গ্রহণ করুক। এখন সর্ব্ব-প্রভাময় "আব্‌হা"র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় আসিয়াছে। মিলন ও প্রেমের দিন সমাগত হইয়াছে। ঈশ্বরের বন্ধুগণের আধ্যাত্মিক একপ্রাণতা স্থাপিত হইবার শুভদিনের আর বিলম্ব নাই। * * * আমি পূর্ব্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে, দশদিকে কাণ পাতিয়া রহিয়াছি, কোথা হইতে বিশ্বাসীগণের সমাজে প্রেম-মৈত্রীর তন্ত্রীতে আত্মার আনন্দ-সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে, আমি তাহাই শুনিব, এই আশায়। আমার দিন ফুরাইয়াছে, সুতরাং এই আনন্দ ব্যতীত আর কোনো আনন্দই আমার অদৃষ্টে অবশিষ্ট নাই।"

"ঈশ্বরের বন্ধুগণকে মিলিত, একত্রিত দেখিতে আমার হৃদয়ের যে একান্ত বাসনা, তাহা কি পূর্ণ হইবে না? একগুচ্ছ উজ্জ্বল মুক্তার

মত, আকাশে সপ্তর্ষি নক্ষত্রের মত, সূর্য্যের রশ্মির মত, একই ক্ষেত্রে বিচরণশীল হরিণকুলের মত বিশ্বাসীগণ কি সঙ্ঘবদ্ধ হইবে না? গূঢ়তত্ত্বের বুলবুল পাখী তাহাদের উদ্বোধনের জন্য গান ধরিয়াছে, তাহারা কি অবধান করিবে না? স্বর্গের বিহগরাজ কাকলি করিতেছে, তাহারা কি শুনিবে না? "আব্‌হা" রাজত্বের স্বর্গদূত তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছে; তাহারা কি তবু নীরব থাকিবে, সাড়া দিবে না? "অঙ্গীকারের বার্ত্তাবহ" কাকতি করিতেছে; তাহারা কি গ্রাহ্য করিবে না, মনোযোগী হইবে না।

"বিশ্বাসীগণ সততা, ঐকান্তিকতা ও ভক্তির মূর্ত্তিমান্‌ প্রকাশরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, প্রেম-মৈত্রী, সঙ্ঘবদ্ধতা ও মিলনের অবতার রূপে তাহারা প্রতিভাত হইয়াছে, এই আনন্দ-সংবাদ শুনিবার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি।

"তাহারা কি আমার হৃদয় আনন্দিত করিবে না? তাহারা কি আমার আগ্রহ সার্থক করিবে না, আমার কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিবে না, আমার আশা মিটাইবে না, আমার আহ্বান শুনিবে না? আমি অপেক্ষা করিতেছি, সহিষ্ণুতা সহকারে অপেক্ষা করিতেছি।"—(মীর্জ্জা আহ্‌মদ সোহ্‌রাবের রোজ্‌নামচা, ২রা এপ্রিল, ১৯১৪)

বাহাই ধর্ম্মের শত্রুগণ বা'বের প্রাণ দণ্ডের সময় আশা করিয়াছিল বা'বী ধর্ম্ম সমূলে বিনষ্ট হইবে। যখন বাহাউল্লা' স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত ও যাবজ্জীবন কারাবরুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহার তিরোধানের পর তাহারা পুনরায় হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে যখন আবদুল্‌বাহা আমেরিকা, য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেহে, মনে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন তাহারা আবার আনন্দিত হইয়া মনে করিল, এবারে বাহাই ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু,

পুনরায় তাহাদিগকে নিরাশ হইতে হইল; কিছুদিনের মধ্যেই আব্দুল্‌বাহা ঘোষণা করিলেন:—

"আমার এই দুর্ব্বল শরীর এবং আমার এই মানবীয়-শক্তি ধর্ম্ম-প্রচারের গুরুতর কর্ত্তব্য-সম্পাদনে নিশ্চয়ই অক্ষম হইত, যদি না সেই পরমকাম্য পুরুষের আশীর্ব্বাদ ও সহায়তা এই দীনাতিদীন, দুর্ব্বল আব্দুল্‌বাহাকে বর্ম্মের মত আচ্ছাদন করিয়া থাকিত; তিনি আমার অভিভাবক, সেই জন্যই আমি আছি, নতুবা নিশ্চয়ই এই গুরুভার বহন করা আমার সাধ্যাতীত হইত। অনেকে বলিয়াছেন, আব্দুল্‌বাহার পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় লইবার অধিক কাল বিলম্ব নাই, তাহার শারীরিক শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছে, এই সমস্ত আবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া শীঘ্রই তাহার জীবনান্ত ঘটিবে। এই সমস্ত কথা নিতান্ত অসত্য। যদিও "অঙ্গীকার ভঙ্গকারী" দুর্ব্বল-চিত্ত ব্যক্তিগণের নিকট আপাতদৃষ্টে মনে হইতেছে, ধর্ম্ম-প্রচারের নিমিত্ত শ্রমাধিক্য হেতু ও নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে বলিয়া আমার দেহ রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি, ঈশ্বর ধন্য হউক, বাহাউল্লা'র কৃপানুসারে আমার আধ্যাত্মিক শক্তি অক্ষুণ্ণ, অব্যাহত রহিয়াছে, বরঞ্চ তাহা নব-জীবন লাভ করিয়াছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বাহাউল্লা'র আশীর্ব্বাদে ও শুভেচ্ছায়, এক্ষণে আমি আমার দৈহিক স্বাস্থ্যও পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, স্বর্গীয় আনন্দে আমি আপ্লুত, চরম আনন্দ-বার্ত্তা প্রোজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে, আদর্শ আনন্দ আমার হৃদয়-পাত্র হইতে উপচাইয়া পড়িতেছে।"—(পশ্চিমের তারকা, পঞ্চম খণ্ড, ১৪ নং পৃঃ ২১৩)

গত মহাযুদ্ধের সময় ও তাহার অব্যবহিত পরে মহাযুদ্ধ মিটিয়া গেলে আবদুল্‌বাহা শত সহস্রবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও অবিশ্রান্ত ধারায় পৃথিবীর সর্ব্ব-দেশে পত্র প্রেরণ করিতেন। যখন শান্তি

ফিরিয়া আসিল, ভাবের আদান-প্রদানে কোনোরূপ বাধা থাকিল না, তখন এই সমস্ত পত্রাবলীর প্রভাবে বিশ্বাসীগণ সেবা-ব্রতে নূতন উৎসাহ, নূতন প্রেরণা প্রাপ্ত হইল; বাহাই ধর্ম্মের প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সর্ব্বত্রই এই নবধর্ম্মের আন্দোলন বিশেষরূপ শক্তি ও সঞ্জীবনী ক্ষমতাপন্নরূপে দেখা দিল।

মহাযুদ্ধের সময়ে হাইফা

মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে আবদুলবাহার অসীম জ্ঞান ও ভবিষ্য-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল নিম্নলিখিত এই ঘটনাটিতে।

পারস্য ও পৃথিবীর সমস্ত বিভিন্ন অংশ হইতেই তীর্থ-যাত্রীগণ হাইফাতে সমাগত হইতেন। মহাযুদ্ধ ঘোষণার প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে হাইফাবাসী একজন বৃদ্ধ বাহাই, আবদুল্‌বাহার নিকট একটি আবেদন-পত্র উপস্থিত করিল; এই আবেদন-পত্রে পারস্য দেশবাসী কয়েকজন বাহাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল। আবদুল্‌বাহা এই আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না, অধিকন্তু তিনি যে সমস্ত তীর্থ-যাত্রীগণ হাইফাতে ছিল তাহাদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন; ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের পূর্ব্বে কেহই হাইফাতে রহিল না। যখন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যুদ্ধ ঘোষিত হইল, তখন সকলেই বুঝিতে পারিল, প্রভুর ঐরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি ছিল।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, আবদুল্‌বাহা, যিনি নির্ব্বাসনে ও কারাগারে জীবনের ৫৫ বৎসর কাল কাটাইয়াছিলেন, পুনরায় তুর্কী গবর্ণমেণ্টের বন্দীবৎ হইয়া পড়িলেন। সিরিয়া রাজ্যের বাহিরে যে সমস্ত বন্ধুগণ ও বিশ্বাসীগণ থাকিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার পত্র-ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল; তিনি ও তাঁহার সঙ্গে যে একটি ক্ষুদ্র অনুগামী দল থাকিত,

সেই দলের সকলেই, পুনরায় অতি শোচনীয় অবস্থায় কাল কাটাইতে লাগিলেন, খাদ্য-দ্রব্যের অভাব, গুরুতর ব্যক্তিগত অসুবিধা ও বিপদ ইত্যাদি দুর্বিপাকে তাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু, আব্‌দুল্‌বাহা তত্রাপি তাঁহার চতুর্দ্দিকের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি টাইবেরিয়াস্ নামক স্থানের সন্নিকটে স্বয়ং একটি বিরাট কৃষি-ক্ষেত্রে কাজকর্ম্ম সুনিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন; ইহাতে প্রভূত পরিমাণে ময়দা পাওয়া গেল, তাহাতে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইল, এবং মাত্র বাহাইগণ নহে, সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বী হাইফা এবং আক্কা-বাসী জনসাধারণের খাদ্য-সংস্থান হইল। তিনি প্রত্যহ দরিদ্র ব্যক্তি-দিগকে অর্থ-সাহায্য করিতেন, সর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদেরই কষ্ট লাঘব করিবার জন্য যথাসাধ্য করিতেন, অর্থের সঙ্গে খাদ্য-দ্রব্য-দানে দরিদ্রদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন। মাঝে মাঝে হাইফা হইতে আক্কা নগরে গিয়া সেখানকার বিশ্বাসীগণকে ও সাধারণ দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিতেন ও বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে লইয়া প্রত্যহ সভা-সমিতি করিয়া তাহাদিগকে উপদেশ-প্রদানে সুখী করিতেন। মহাযুদ্ধের দারুণ দুঃসময় এইরূপে কাটিল।

সার আব্‌দুল্‌বাহা আব্বাস, কে-বি-ই

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে যখন ২৪ ঘণ্টা যুদ্ধের পর হাইফা নগর ব্রিটিশ ও ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল, তখন হাইফা নগরে বিপুল আনন্দ উদ্বেল হইয়া উঠিল; কারণ, তুর্কী শাসনে যুদ্ধের কারণে যে ভীষণ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহার অবসান ঘটিল।

ব্রিটিশ অধিকার হইতেই সর্ব্বশ্রেণীর সৈনিক ও রাজকর্ম্মচারীগণ আব্দুল্‌বাহার দর্শনভিক্ষা করিত ও তাঁহার অতিথি-পরায়ণতা, অভিজাত ভদ্র ব্যবহার, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা, দৃষ্টির প্রসার ও সারগর্ভ আলোচনাতে মুগ্ধ হইত। তাঁহার শান্তিস্থাপনের জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা, তাঁহার জন-সেবা, তাঁহার উদারহৃদয়বত্তা দর্শনে গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ তাঁহার প্রতি এতই সশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল যে তাহাদের ইচ্ছাক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের "নাইট্" অর্থাৎ "স্যার" উপাধি আব্দুল্‌বাহাকে দেওয়া হইল। এই উপাধি-প্রদান ব্যাপার, ১৯২০ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে হাইফার সামরিক শাসনকর্ত্তার উদ্যানে নিষ্পন্ন হইল।

শেষ কয়েক বৎসর

১৯১৯-২০ সালের শীতকালে বর্ত্তমান লেখক আব্দুল্‌বাহার অতিথি-রূপে হাইফাতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; সেই সময়ে তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রা পদ্ধতি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার আমার সুযোগ হইয়াছিল। যদিও তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৭৬ বৎসর, তিনি অদ্ভূত তৎপরতার সহিত অবিশ্বাস্য পরিমাণের অধিক কাজ প্রত্যহ সম্পন্ন করিতেন। যদিও তিনি প্রায় সময় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু এক অলৌকিক উপায়ে ক্লান্তি অপসারিত করিয়া দুঃস্থব্যক্তিদের অভাব মোচনার্থে সকল সময়ে প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা, নম্রতা, দয়াশীলতা ও কার্য্যকুশলতার দরুণ তাঁহার উপস্থিতি সর্ব্বক্ষণ সকলের নিকট প্রত্যক্ষ ঈশ্বরানুগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রত্যেক রাত্রির অধিকাংশ সময় প্রার্থনা ও নিদিধ্যাসনে অতিবাহিত করাই তাঁহার নিয়ম ছিল। প্রত্যহ প্রত্যূষ হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বদাই নানাদেশ হইতে আগত চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন বা

অধ্যয়নে নিরত থাকিতেন; কেবল মাত্র মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর তিনি অতি অল্পসময় নিদ্রা যাইতেন। ইহার মধ্যে, সাংসারিক নানারূপ খুঁটিনাটি কাজ তাঁহাকে করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্ম-প্রচারকল্পে তাঁহাকে প্রচেষ্টা করিতে হইত, ইহা ত বলাই বাহুল্য। অপরাহ্নে তিনি সাধারণতঃ হাঁটিয়া বা গাড়ীতে চড়িয়া ভ্রমণার্থ বাহির হইতেন; তখনও তাঁহার সঙ্গে এক বা দুই বা ততোধিক তীর্থযাত্রী থাকিত; তিনি তাহাদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া আলাপ-আলোচনা করিতেন। পথিমধ্যে কোনো দুঃস্থ ব্যক্তির কষ্ট লাঘব করিবার সুযোগ তিনি কখনও ছাড়িতেন না, দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করা তাঁহার সর্ব্বকালের চিরন্তন কর্ত্তব্য ছিল, তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ ছিলেন না। ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি প্রাত্যহিক সান্ধ্যসভায় সমাগত হইবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় ও রাত্রেও তিনি বহু তীর্থযাত্রী ও বন্ধুদিগকে লইয়া আহার করিতেন ও তাঁহার অতিথিদিগকে নানারূপ কৌতুকপূর্ণ উপাখ্যান বলিয়া বা সার-গর্ভ, মূল্যবান্ আলোচনা দ্বারা আপ্যায়িত বা তাহাদের জ্ঞান-বৃদ্ধি করিতেন। তিনি বলিতেন—"আমার গৃহ আমোদ-উল্লাসের আবাস"; বাস্তবিক তদ্রূপই ছিল। তিনি নানা জাতির, নানা বর্ণের, নানা দেশের, নানা ধর্ম্মের ব্যক্তিদিগকে তাঁহার অতিথি সেবার টেবিলের চতুর্দ্দিকে ঐক্য ও মৈত্রী সহকারে সম্মিলিত দেখিতে ভালবাসিতেন। তিনি হাইফার বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীদের ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে তাঁহার অনুগামীদের নিকটে পিতৃবৎ ছিলেন, এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হয় না, তিনি সমগ্র পৃথিবীর বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীদের নিকটেই পিতার মত ছিলেন; কারণ, তিনি সকলকেই পিতার মত ভালবাসিতেন ও শিক্ষা-জ্ঞান-দান করিতেন।

আব্‌দুল্‌বাহার মহাপ্রস্থান

তাঁহার এইরূপ অবিশ্রান্ত কর্ম্মজীবন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিল। ১৯২১ সালের ২৫শে নভেম্বর তারিখে, শুক্রবারে তিনি হাইফার মস্‌জিদে মধ্যাহ্ন-উপাসনা শেষ করিয়া আসিলেন। তাহার পর তিনি, তাঁহার চিরাচরিত রীতি অনুসারে সমবেত দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে স্বহস্তে ভিক্ষা দান করিলেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর, তিনি কয়েকখানি পত্র লিখাইলেন; তিনি পত্রের ভাষা বলিয়া যাইতেন, অপর একজন তাহা লিখিয়া লইত। কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি উদ্যানে গিয়া উদ্যান-পালকের সঙ্গে কিয়ৎকাল আলাপ করিলেন। সায়াহ্নকালে, তিনি তাঁহার পরিবারভুক্ত একজন নববিবাহিত ভৃত্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন; এই ভৃত্যের বিবাহ সেই দিনই হইয়াছিল। তাহার পর, তিনি নিজের কক্ষে বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রাত্যহিক সায়াহ্ন-সভা আহ্বান করিলেন।

ইহার প্রায় তিন দিবস পরে, ২৮শে নভেম্বর তারিখে, সোমবারে, রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় তিনি দেহ-ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দুইটি কন্যা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে জাগিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে হইল যেন তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার দেহ-ত্যাগ এতই শান্ত, সমাহিত।

এই দারুণ শোকসংবাদ নগরের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ও পৃথিবীর সর্ব্বাংশে তার যোগে প্রেরিত হইল। পরদিন (মঙ্গলবার, ২৯শে নভেম্বর তারিখে) দেহ সমাহিত হইল।

"শুধু হাইফাতে নয়, প্যালেষ্টাইনেও এরূপ বিরাট সৎকার-কার্য্য কেহ কোনো দিন দেখে নাই; এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি কোনো

দিন ইতঃপূর্ব্বে কোনো মৃতদেহের সৎকারের সময় উপস্থিত হয় নাই। জাতি-ধর্ম্ম-ভাষা-নির্ব্বিশেষে সকলেই শোক করিতেছিল।

"হাই কমিশনার স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েল, জেরুজালেমের শাসনকর্ত্তা, ফিনিসিয়ার শাসনকর্ত্তা, গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ, নানা দেশের কন্‌সালগণ, যাঁহারা হাইফাতে থাকিতেন, সর্ব্ব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সমূহের নেতা, প্যালেষ্টাইনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি সকলেই, য়িহুদী, খৃষ্টীয়াণ, মুসলমান, ড্রুজ, মিশরী, গ্রীক, তুর্ক, কুর্দ, তাঁহার আমেরিকান ও য়ুরোপীয় 'ও স্বদেশবাসী বন্ধুগণ, নর, নারী, বালক, উচ্চ, নীচ-নির্ব্বিশেষে, মোট প্রায় দশ সহস্র ব্যক্তি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার শবানুগমন করিতে লাগিল। সকলে সমস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—'হে ঈশ্বর, আমাদের পিতা আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন, আমাদের পিতা আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন'।

"তাহারা ধীরে ধীরে ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্র কার্ম্মেল পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পথ চলিয়া তাহারা বা'বের সমাধি উদ্যানে পৌঁছিল,—সকলেই চতুর্দ্দিকে ভিঁড় করিয়া দাঁড়াইল। এই বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্যে মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, য়িহুদী ও অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলেই তাহাদের প্রাণাধিক প্রিয়তমের প্রেমে অনুপ্রাণিত ও বিচ্ছেদে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের শেষ বিদায়কালীন ভক্তি-শ্রদ্ধা ভাষাতে জানাইল—তাঁহার প্রশংসা ও গুণকীর্ত্তন করিল, তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিল। সকলে একমত হইয়া তাঁহাকে মানবজাতির জ্ঞানপূর্ণ শিক্ষাদাতা এবং এই দুঃখময় যুগসন্ধিক্ষণে মানবকুলের ঐক্য ও সমন্বয়ের ভিত্তিস্থাপনকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিল; এবং ঐ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আব্দুলবাহা সম্বন্ধে এত অধিক কথা বলিলেন যে বাহাইদিগের বলিবার

কিছু বাকী রহিল না।"—(আব্দুল্‌বাহার মহাপ্রস্থান, লেডী ব্লমফিল্ড ও শোঘি এফেন্দি প্রণীত)

মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, য়িহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় নয়জন ব্যক্তি আব্দুল্‌বাহার পবিত্র, উদার জীবনের প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, শোকপূর্ণ অথচ সুন্দর ভাষাতে জানাইয়াছিলেন। তাহার পরে সেই অনাড়ম্বর, পবিত্র সমাধি মধ্যে শবাধার ধীরে ধীরে রক্ষিত হইয়াছিল।

নিশ্চয়ই, এই ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে, যে মহাপুরুষ নানা বিভিন্ন ভাষা, জাতি ও ধর্ম্মের ঐক্য স্থাপনের জন্য জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল, এবং ইহাতে এই কথাও প্রমাণিত হয় যে, আব্দুল্‌বাহার জীবন-কর্ম্ম ব্যর্থ হয় নাই, অর্থাৎ বাহাউল্লা'র আদর্শ, যাহা আব্দুল্‌বাহার জীবনের উপজীব্য প্রেরণা ছিল, এমন কি, যাহা তাঁহার জীবনই ছিল, তাহা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছিল এবং জাতি ও সম্প্রদায়ের মিলনের অন্তরায়, যাহা মুসলমান, খৃষ্টীয়াণ, য়িহুদী এবং অপরাপর সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত হইয়া একই মানব-পরিবারকে বহু শতাব্দী ধরিয়া বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা বিলুপ্ত হইতেছিল।

আব্দুল্‌বাহার লেখা ও বক্তৃতা

তাঁহার ফলকলিপির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; সত্য-বিশ্বাসী ও সত্য-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের নিকটে তিনি যে অসংখ্য পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার অনেক আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতাও লিপিবদ্ধ আছে ও প্রকাশিত করা হইয়াছে। হাইফা ও আক্কাতে তাঁহার দর্শনলাভের জন্য যে সহস্র সহস্র তীর্থ-যাত্রী সমাগত হইত, তাহারাও তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়া রাখিয়াছে। এই সমস্ত লিপির

অনেকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে ও পুস্তকাকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপে তাঁহার উপদেশাবলী সমগ্রভাবে রক্ষিত হইয়াছে; তাহা সমস্তই মানবজীবনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সংক্রান্ত। প্রাচ্য-প্রতীচ্য নানারূপ সমস্যা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে উপদেশ প্রদান করিতেন; তাঁহার পিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বিষয়ে অধিকতর বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বাহাউল্লা' যে সমস্ত নিয়ম সাধারণ ভাবে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সেগুলি বিশিষ্টভাবে প্রয়োগ করিতেন। তাঁহার অনেক পুস্তকাবলী এখনও কোনো য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয় নাই, কিন্তু যাহা বিদেশী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার উপদেশাবলীর গভীরতা ও পরিপূর্ণত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে।

তিনি আরবী, পার্শী ও তুর্কী ভাষা জানিতেন। পাশ্চাত্য-জগতে ভ্রমণকালে, তাঁহার আলাপ-আলোচনা-বক্তৃতা, সমস্তই দ্বিভাষী দ্বারা ব্যাখ্যাত হইত। যদিও এইরূপ ব্যাখ্যাত হওয়ার দরুণ তাঁহার বাক্যের সৌন্দর্য্য, শক্তি ও প্রভাব অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হইত, তথাপি তাঁহার বাক্যে পবিত্রাত্মার শক্তি এতই প্রবল ছিল যে তাহাতেই শ্রোতাগণ মুগ্ধ হইয়া যাইত।

আব্দুলবাহার স্থান বা পদবী

বাহাউল্লা' যে অদ্বিতীয় পবিত্র পদবী আব্দুল্‌বাহাকে দান করিয়াছিলেন, তাহা বাহাউল্লা'র নিম্নোক্ত ফলকলিপিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে:—

"তাঁহারই নামে—যিনি শক্তি ও ক্ষমতার দিগমণ্ডল হইতে দীপ্তিমান্ হইয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই প্রাচীনের রসনা (অর্থাৎ ঈশ্বরের রসনা, বাহাউল্লা') জগৎবাসীকে 'মহীয়ান্ নাম' (ইস্‌মে আ'জম)এর আবির্ভাব

সম্বন্ধে আনন্দবার্ত্তা দিতেছেন, যিনি 'তাঁহার অঙ্গীকার' (আব্‌দুল্‌বাহা)কে দান করিয়া জাতিসমাজকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। নিশ্চয়ই সে (আবদুল্‌-বাহা) আমিই (বাহাউল্লা), আমার স্বরূপের উদয়াচল, আমার ধর্ম্মের পূর্ব্বদিক, আমার অনুকম্পার গগনমণ্ডল, আমার অভিপ্রায়ের মহাসাগর, আমার পথ-প্রদর্শনের প্রোজ্জ্বল বর্ত্তিকা, আমার ন্যায় বিচারের পরম পথ, আমার অনুশাসনের চরম নিশান। যে ব্যক্তি তাহার দিকে ফিরিয়াছে সে আমার মুখমণ্ডলের দিকে ফিরিয়াছে, আমার সৌন্দর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়াছে, আমার একত্ব অঙ্গীকার করিয়াছে, আমার একাকীত্ব স্বীকার করিয়াছে। যে ব্যক্তি তাহাকে অস্বীকার করিয়াছে সে আমার প্রেমের 'সল্‌সবীল' (১) হইতে, আমার অনুগ্রহের 'কওস্বর' (১) হইতে, আমার করুণার পান-পাত্র হইতে এবং ঐ মদিরা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, যাহা সাধুজনকে হর্ষোল্লাসে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং একেশ্বরবাদীকে আমার দয়ার বায়ুতে উড্ডীন করিয়াছে,—যাহা সেই একব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই জানে না, যাহাকে আমি নিজেই ঐ সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়াছি যাহা আমার নিহিত ফলক-লিপিতে প্রকটিত হইয়াছে।"—(পারস্যের ত্বেহেরাণ নগরীর মীর্জ্জা ওলিওল্লা' খাঁ ওয়ারকা কর্ত্তৃক অনূদিত)

এই ফলকলিপিতে বাহাউল্লা' এবং আব্‌দুল্‌বাহার মধ্যে ঐ নিগূঢ় একত্ব বিচিত্ররূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই বাক্যটিতে—'সে আমিই'। বাহাউল্লা' বা'বের সম্বন্ধেও এইরূপ বলিয়াছিলেন। "সূরাতুল-হায়কল"এ তিনি বলিতেছেন:—"যদি সেই 'আদিবিন্দু' (বা'ব) আমি ব্যতীত অন্য কেহ হইতেন যেমন তোমরা বলিতেছ, এবং যদি তিনি আমার

(১) সল্‌সবীল্ ও কওস্বর—স্বর্গের দুইটি স্রোতস্বিনীর নাম।

আবির্ভাব সময়ে উপস্থিত ছিলেন, তাহা হইলে তিনি কখনই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিতেন না; বরং আমার দিনে আমরা উভয়েই পরস্পরের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া মিলিয়া মিশিয়া থাকিতাম।”

এই ফলকলিপির ভাষা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে আব্‌দুল্‌বাহা বাহাউল্লা'র শক্তিতে শক্তিমান্, তাঁহার মহান্ ঐশ্বরিক প্রেরণাতে অনুপ্রাণিত; অলঙ্ঘনীয় সিদ্ধান্ত এই যে, আব্‌দুল্‌বাহা যাহাই বলেন বা করেন, তাহা সমস্তই সাক্ষাৎ প্রভু বাহাউল্লা'র বাণীর মত তুল্য মর্য্যাদার যোগ্য।

আব্‌দুল্‌বাহা স্বয়ং স্বাধীন ভাবে কোনো অবতারত্বের দাবী করেন না। তিনি প্রভু বাহাউল্লা'রই ঐশ্বরিক প্রেরণা বিঘোষিত করিতেছেন। তিনি স্বচ্ছ দর্পণ-সদৃশ ছিলেন, যাহাতে বাহাউল্লা'র পুণ্য জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, এবং যে পবিত্র সঞ্জীবনী শক্তি বাহাউল্লা' হইতে নিস্যন্দিত হইতেছিল, তাহা তিনি সমগ্র মানব জগতে প্রবহমান করিবার নিমিত্ত যন্ত্রবৎ হইয়াছিলেন, এই মাত্র। অনেকে তাঁহাকে পুনঃ প্রত্যাগত যীশুখৃষ্টরূপে অভিনন্দিত করিতে চাহিয়াছিল; তাহার উত্তরে তিনি কতিপয় আমেরিকান বাহাইএর নিকটে লিখিয়াছিলেন:—

“আপনারা লিখিয়াছেন, বন্ধুগণের মধ্যে ‘মসীহের দ্বিতীয় আগমন’ সম্বন্ধে মতানৈক্য হইয়াছে। ধন্য ঈশ্বরকে,—বার বার এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, ইহার উত্তর সুস্পষ্ট, বিশদ-ভাষায় আব্‌দুল্‌বাহার লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। স্বর্গের আশীষপূত সুন্দর পুরুষ (বাহাউল্লা') এবং অত্যুন্নত প্রভু (বা'ব)ই ‘বাহিনীগণের প্রভু’ এবং ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’; ইহাই ভবিষ্যদ্বাণীগুলির তাৎপর্য্যার্থ।

“আমার নাম আব্‌দুল্‌বাহা, অর্থাৎ ‘বাহা'র ভৃত্য, আমার গুণ-পণা আব্‌দুল্‌বাহা, আমার প্রকৃতত্ব আব্‌দুল্‌বাহা, আমার প্রশংসা

আব্‌দুল্‌বাহা। স্বর্গের আশীষপূত সুন্দর পুরুষের দাসত্বই আমার মস্তকের গৌরবময় উজ্জ্বল মুকুট, এবং সমগ্র মানবজাতির সেবা-কর্ম্মই আমার সনাতন ধর্ম্ম। স্বর্গের আশীষপূত সুন্দর পুরুষের দয়ায় ও অনুগ্রহে আব্‌দুল্‌বাহা সর্ব্বব্যাপী মহান্ শান্তির ধ্বজাস্বরূপ, যাহা অত্যুচ্চ শৃঙ্গ হইতে আন্দোলিত হইতেছে এবং সেই "মহীয়ান্ নাম"এর প্রসাদে সে বিশ্বজনীন মুক্তি-পথের প্রদীপ স্বরূপ, যাহা ঈশ্বরের প্রেমে প্রোজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে। আব্‌দুল্‌বাহা পরমরাজ্যের আনন্দবার্ত্তা বিতরণকারী, পূর্ব্ব-পশ্চিমের জনসাধারণকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, এবং সে বন্ধুতা, সততা ও একতার নিনাদস্বরূপ, পৃথিবীর ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করিবার জন্য। তাহার নাম আব্‌দুল্‌বাহা—বাহার ভৃত্য, ইহা ব্যতীত তাহার অন্য কোনো নাম, উপাধি, পদবী কি বিশেষণ নাই, ও কখনও থাকিবে না। ইহাই আমার বাসনা, ইহাই আমার বড় আশা, ইহাই আমার চিরস্থায়ী জীবন, ইহাই আমার চরম গৌরব। *** অতএব, ঈশ্বরের বন্ধুগণ আব্‌দুল্‌বাহাকে সত্য-পুরুষের পূজা, আরাধনায়, মানব-জাতির সেবায়, মানব-জগতের হিত-সাধনে এবং স্বর্গীয় প্রেম ও দয়া বিতরণে সাহায্য করিবেন।

"হে ঈশ্বরের বন্ধুগণ! আব্‌দুল্‌বাহা দাসত্বের অবতার, মসীহ নহে, মানব-জগতের সেবক, ইহার অধীশ্বর নহে। সে সত্তা-বিহীন, সত্তা নহে। সে শুদ্ধ শূন্য, সনাতন ঈশ্বর নহে। মসীহ যে আব্‌দুল্‌-বাহা রূপে দ্বিতীয়বার ধরাধামে আগমন করিয়াছেন, এইরূপ কেহই বিশ্বাস করিবেন না, বরং, আব্‌দুল্‌বাহাকে দাসত্বের অবতার ও মানব জগতের একতা ঘোষণাকারী বলিয়াই জানিবেন। সে আধ্যাত্মিক শক্তিসহকারে সমগ্র পৃথিবীতে ঈশ্বরের আনন্দবার্ত্তা বিতরণকারী। সে ঐশ্বরিক ধর্ম্মগ্রন্থের মূল বচন অনুযায়ী তাহার ব্যাখ্যাতা। সে এই

ক্ষণস্থায়ী সংসারে ঈশ্বর বিশ্বাসীগণের প্রত্যেকের জন্য মোচন-মূল্য স্বরূপ।

"আপনারা এই ফলক-লিপি মুদ্রিত করিয়া দেশ দেশান্তরে প্রচার করিবেন।"—(আব্‌দুল্‌বাহার ফলক-লিপি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৯)

বাহাই জীবনের আদর্শ

বাহাউল্লা'ই পরমবাক্যের প্রকাশক। কিন্তু, তিনি তাঁহার চল্লিশ বৎসর কারাবাসের দরুণ বাহিরের লোকের সঙ্গে মিশিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন না। সুতরাং ঈশ্বরের প্রকাশিত পুস্তকের ব্যাখ্যাতা ও ঈশ্বরের বাক্যের কার্য্যকারক-রূপে বর্ত্তমান জগতের বিবিধ কার্য্য কলাপের বিভিন্ন অবস্থায় বাহাই জীবনের মহান্ আদর্শ সপ্রমাণিত করিবার গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যভার আব্‌দুল্‌বাহার উপরেই ন্যস্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে জীবনের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া মানব বিঘূর্ণিত হইতেছে; পৃথিবীর সর্ব্বত্র দৈহিক সুখ এবং পার্থিব ঐশ্বর্য্যলাভের নিমিত্ত মানবকে নিরন্তর যুঝিতে হইতেছে; আব্‌দুল্‌বাহা কার্য্যতঃ দেখাইয়া দিলেন যে এই সকল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও মানব সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে নিবেদিত জীবন হইয়া, মানব-সেবায় নিরত থাকিয়া জীবন যাত্রা করিতে পারে। সমুদ্রে পথ নির্দ্দেশের জন্য যেমন পর্ব্বত-শিখরে আলোক-গৃহ দণ্ডায়মান্ থাকে, যাহার চতুর্দ্দিকে ভীষণ বাত্যা বহিতে থাকে, গ্রীষ্মের সমুদ্র তরঙ্গ ঠোকাঠুকি করে, অথচ তাহাতে আলোক-গৃহ কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত কি প্রকম্পিত হয় না, তদ্রূপ আব্‌দুল্‌বাহাও একদিকে ভাগ্য-পরিবর্ত্তন, নিন্দা-কুৎসা, বিশ্বাসঘাতকতা, অপরদিকে প্রেম, প্রশংসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, এই দ্বিবিধ বিপরীত অবস্থার মধ্যে শান্ত, স্থির ও দৃঢ়চিত্ত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি নিজে ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিতেন, এবং তাঁহার অনুগামীগণকে তদনুরূপ জীবন যাত্রা করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি

এই যুধ্যমান সংসারে শান্তি ও একতার পতাকা এবং এই নবযুগের নিশান উত্তোলন করিয়াছিলেন, এবং যে কেহ তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইত, তিনি এই নবযুগের প্রেরণায় তাহাকে, অনুপ্রাণিত করিয়া লইতেন,—ইহাই সেই পরম পবিত্র প্রেরণা যাহা প্রাচীনকালের অবতার ও সাধু মহাপুরুষগণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, মাত্র এই পার্থক্য যে, এই নবযুগের প্রয়োজনোপযোগী ইহার আলোকরশ্মিগুলি এক অভিনব-ভাবে নূতন।

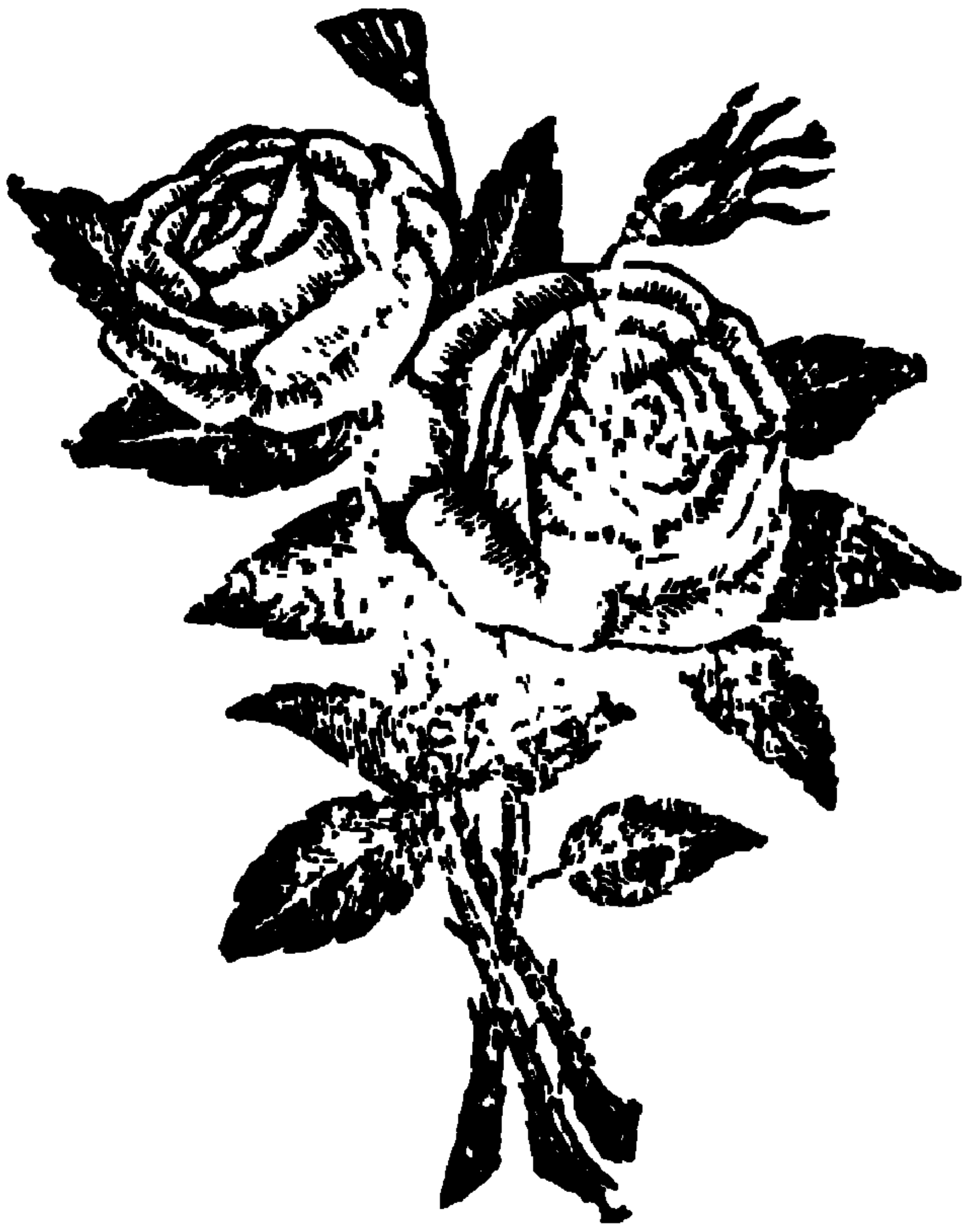

পঞ্চম অধ্যায়

বাহাই কাহাকে বলে?

বাহাউল্লা' বলিতেছেন :—"বনস্পতির ন্যায় মানবেরও পরিচয় ফলদানে। যীশুখৃষ্টের ভাষায়, নিষ্ফল মানব নিষ্ফল বৃক্ষ সদৃশ, এবং নিষ্ফল বৃক্ষ ইন্ধনের যোগ্য।"—(স্বর্গের বাণী)

হার্বার্ট স্পেন্সার কোনো এক উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন, অপরসায়নবিৎ যেমন সীসাকে সুবর্ণে রূপান্তরিত করিতে পারে না, তেমনি কোনো রাষ্ট্রনৈতিকই সীসক বা নিশ্চেষ্ট মানব হইতে সুবর্ণ মানবসমাজ গঠন করিতে পারে না। বাহাউল্লা' তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারগণের ন্যায় এই সত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, প্রথমে মানবের চিত্ত-ক্ষেত্রে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই কারণে, আমি বাহাই উপদেশা-বলীর সেই অংশেরই সমালোচনা করিব, যাহা মানবের ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার ও নৈতিক আচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট, এবং পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব—বাহাই কাহাকে বলে, তাহার যথাযথ চিত্র।

বাহাই জীবন

কোনো এক উপলক্ষ্যে আব্‌দুল্‌বাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল :—"বাহাই কাহাকে বলে?" আব্‌দুল্‌বাহা উত্তর দিয়াছিলেন—"সমস্ত

পৃথিবীকে ভালবাসা; সমগ্র মানব-জাতিকে ভালবাসা ও সেবা করিতে চেষ্টা করা; সর্ব্বব্যাপী মহান্ শান্তি ও সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ থাকা;—বাহাই হওয়ার অর্থ প্রাঞ্জল ভাষায় এই।" অপর এক উপলক্ষ্যে তিনি বাহাই শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন—"যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কর্ম্ম-জীবনের মাঝ দিয়া পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে, সে ব্যক্তিই বাহাই।" লণ্ডনের এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন:—"যে ব্যক্তি বাহাউল্লা'র উপদেশ-অনুসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, সেই বাহাই। অপর পক্ষে, যে ব্যক্তি পঞ্চাশ বৎসর বাহাই ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও বাহাইএর মত আচরণ না করে, সে বাহাই নহে। একজন কুৎসিৎ ব্যক্তি নিজেকে সুশ্রী বলিতে পারে, কিন্তু সে কাহাকেও ঠকাইতে পারে না; একজন কৃষ্ণ ব্যক্তি নিজেকে শুভ্র বলিতে পারে, কিন্তু সেও কাহাকে ঠকাইতে পারে না, এমন কি তাহার নিজকেও নহে। (লণ্ডনে আব্‌দুল্‌বাহা, পৃঃ ১০৯)

কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অবতারকে জানে না, সে ছায়ায় উপজাত বৃক্ষতুল্য। এই বৃক্ষ যদিও সূর্য্যকে জানে না, তথাপি ইহা সূর্য্যের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। মহান্ অবতারগণের সকলেই আধ্যাত্মিক সূর্য্য বিশেষ; কিন্তু বাহাউল্লা'ই আমাদের এই বর্ত্তমান "দিন"এর (অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের) সূর্য্য। পূর্ব্ববর্ত্তী 'দিন'এর সূর্য্য সমূহ পৃথিবীকে উত্তপ্ত ও সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন। যদি এই সমুদয় সূর্য্য উদিত না হইতেন, পৃথিবী এতদিনে শীতল ও গতায়ু হইত। এবং এই সমুদয় সূর্য্য যে সকল ফলে প্রাণ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, একমাত্র অন্তকার 'দিনের' সূর্য্যের আলোক-উত্তাপেই তাহারা পরিপক্কতা লাভ করিতে পারে।

ঈশ্বর আরাধনা

গোলাপ বা উৎপল প্রস্ফুটিত হইবার পক্ষে সূর্য্যরশ্মির প্রয়োজনীয়তা যেমন একান্ত ও অপরিহার্য্য, বাহাই জীবনের পরিপূর্ণতম পরিণতির পক্ষে বাহাউল্লা'র সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ সেইরূপ নিতান্ত আবশ্যক। "বাহাই" বাহাউল্লা'র মানবীয় ব্যক্তিত্বকে পূজা করে না, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্বের মাঝ দিয়া প্রকাশিত "ঈশ্বরের প্রভা"কে পূজা করিয়া থাকে। যীশুখৃষ্ট, মোহাম্মদ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারদিগকে তাহারা ভক্তি করে, বাহাউল্লা'কে আমাদের এই নবযুগে ঈশ্বরের প্রেরিত বার্ত্তাবহ বলিয়া জ্ঞান করে, তাঁহাকে সেই মহান্ বিশ্ব-শিক্ষক বলিয়া বিশ্বাস করে,—যিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত অবতারগণের আরব্ধকার্য্য প্রচল করিবার জন্য এবং তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

কোনো ধর্ম্ম-মতবাদে মাত্র মস্তিষ্ক গত সম্মতি জানাইলেই বাহাই হওয়া যায় না, মাত্র বাহ্য আচরণের সুসঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিলেই, বাহাই পদবীর উপযুক্ততা জন্মে না। বাহাউল্লা' তাঁহার অনুগামীদের নিকট হইতে দাবী করেন, তাহাদের ঐকান্তিক, একমুখী ভক্তি। একমাত্র ঈশ্বরই এত ব্যাপক ভাবে সর্ব্বস্ব দাবী করিবার অধিকার-সম্পন্ন, কিন্তু বাহাউল্লা' তাঁহারই অবতার, তাঁহারই প্রতিনিধিরূপে ইহা বলিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারগণও এইরূপ বলিয়াছেন: যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন—"যে ব্যক্তি আমার অনুগামী হইবে, সে নিজের সত্তা সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন দিয়া নিজের ক্রুশ তুলিয়া নিয়া আমাকে অনুসরণ করুক। যে ব্যক্তি তাহার জীবন রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিবে, সে তাহার জীবন হারাইবে এবং যে ব্যক্তি আমার জন্য জীবন দান

করিবে, সে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইবে।" পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারগণের প্রত্যেকেই তাঁহাদের অনুগামীগণের নিকটে বিভিন্ন ভাষায় এই একই দাবী করিয়াছিলেন; এবং ধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, অবতারগণের এই দাবী যতদিন পর্য্যন্ত সরল ও অকপট ভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছে, ততদিন সর্ব্বপ্রকারের পার্থিব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অগণন দুঃখ-ক্লেশ, অত্যাচার-উৎপীড়নের মধ্য দিয়া—বিশ্বাসীগণের সকলকে হত্যা করা হইলেও ধর্ম্মের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অপর পক্ষে, যখন সেই দাবীর কাটছাট আরম্ভ হইতে থাকে এবং "মাননীয়তা", রক্ষাকবচরূপ মিথ্যা সতর্কতা পূর্ণ আত্মাহুতি ও পূর্ণ আত্মসমর্পণের স্থান অধিকার করিয়া বসে, অর্থাৎ যখন মাত্র ধর্ম্মের দেহরক্ষা করিয়া চলিবার উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তখনই ধর্ম্মের অধঃপতন ঘটিয়াছে, ধর্ম্ম ব্যবহার-সিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু পৃথিবীকে মুক্ত ও রূপান্তরিত করিবার তাহার অলৌকিক শক্তি হারাইয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্মে ব্যবহার-সিদ্ধ বলিয়া কিছুই নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে একদিন ঐরূপ হইতে পারে। কিন্তু, যেমন যীশুখৃষ্টের দিনে তদ্রূপ এখনও ইহা সত্য যে "সত্য-জীবনের পথ সঙ্কীর্ণ, তোরণ-দ্বার অপ্রশস্ত, ইহা অতি অল্প লোকেই পাইয়া থাকে"। পার্থিব জন্মের দ্বার-পথের ন্যায় আধ্যাত্মিক জন্মের দ্বারপথ দিয়া সর্ব্বপ্রকার বোঝাবিমুক্ত হইয়া, এক এক জন করিয়া সত্য-জীবনে প্রবেশ করিতে পারে। যদি ভাবীকালে বিগত কাল অপেক্ষা অধিক লোক এই পথে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে যে মানবকুল ঈশ্বরের দাবী অনুযায়ী ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য অধিক উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু কখনও এই কারণে নহে যে তোরণদ্বার অধিক প্রশস্ত করা হইয়াছে। মানব তাহার বহুদিনের কঠোর অভিজ্ঞতার ফলে

বুঝিতে পারিয়াছে যে ঈশ্বরের পথ পরিত্যাগ করিয়া আপন পথে চলা মূর্খতা বই আর কিছুই নহে।

সত্যান্বেষণ

প্রভু বাহাউল্লা' তাঁহার সমস্ত অনুগামীদিগকে সত্য ও ন্যায়-পরায়ণ হইতে আদেশ দিয়াছেন। ন্যায়-পরতা কাহাকে বলে, সে সম্বন্ধে তিনি এই বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন :—

"সর্ব্বপ্রকারের কুসংস্কার ও অন্ধ অনুকরণ-বুদ্ধি হইতে মানবের মুক্তি, যাহাতে ঈশ্বরের অবতারগণকে একত্বের চক্ষে দেখিবার ও তীক্ষ্ন বুদ্ধি-সহকারে যাবতীয় বিষয় নিরীক্ষণ করিবার তাহার সমর্থতা লাভ হয়।"—(জ্ঞানবাণী)

প্রত্যেক ব্যক্তিই বাহাউল্লা'র মানবীয় দেহমন্দিরে ঈশ্বরের প্রভাকে স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়া জানিয়া লইবে, তাঁহাকে না জানিলে, বাহাই ধর্ম্মে বিশ্বাস, তাহার পক্ষে অর্থশূন্য নাম মাত্র। অবতারগণ মানবজাতিকে এই কারণে আহ্বান করিয়াছিলেন যে তাহারা তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত করিবে, মুদ্রিত করিবে না, তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি পরিচালিত করিবে, নিষ্ক্রিয় করিবে না। সম্পূর্ণ অনাবিল দৃষ্টি ও মানসিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিলেই, তাহারা কুসংস্কারের কৃষ্ণ-মেঘরাশি ভেদ করিয়া, অন্ধ অনুকরণ-প্রচেষ্টার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া নব-ধর্ম্মের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে, কিন্তু বিচার বুদ্ধিহীন, দাস-সুলভ মনোভাব লইয়া তাহা কখনও সম্ভব নহে। বাহাই ভয়লেশ শূন্য হইয়া সত্যের অন্বেষণ করিবে। তাহার অন্বেষণ প্রচেষ্টা মাত্র এই পার্থিব পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবে না। যেমন শারীরিক, সেইরূপ মানসিক, আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমূহও সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিবে। সে ঈশ্বর-প্রদত্ত সমুদয় শক্তি

সত্যান্বেষণে প্রযুক্ত করিবে, এবং অকাট্য যুক্তিযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত সে কিছুই বিশ্বাস করিবে না। প্রত্যেক সত্যান্বেষী, যাহার অন্তর নির্ম্মল, মন কুসংস্কারবিহীন সে "ঈশ্বরের প্রভা"কে চিনিতে পারিবে,—তিনি যে কোনো দেহে প্রকাশিত হউন না কেন। বাহাউল্লা' বলিয়াছেন :—

"স্বকীয় সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য; কোন্ পথে মহত্ব, সম্ভ্রম, বিভব লাভ হয় ও কোন্ পথে ক্ষুদ্রপ্রাণতা, অসম্মান, দারিদ্র্য লাভ হয়, সে সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।" —('ত্বরাজাৎ'এর ফলকলিপি)

ঈশ্বরজ্ঞানই সর্ব্বজ্ঞানের মূলাধার—(তাঁহার প্রভা ধন্য হউক!); অবতারের মধ্যস্থতা ব্যতীত ঈশ্বরোপলব্ধি অসম্ভব।"—(জ্ঞানবাণী)

ঈশ্বরের অবতারই পূর্ণ-মানব, তিনিই মানবের মহান্ আদর্শ, তিনিই মানব-বৃক্ষের সর্ব্বপ্রধান ফল। যে পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার জ্ঞানপ্রাপ্ত না হই, আমাদের মধ্যে কি অসীম শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যীশুখৃষ্ট আমাদিগকে পদ্মফুলগুলি কিরূপে জন্মলাভ করে তাহা চিন্তা করিবার জন্য উপদেশ দিয়া বলিতেছেন যে সোলায়মান সর্ব্বপ্রকার বিভবের অধিকারী হইয়াও তাহাদের একটির তুল্য সুশোভিত হইতে পারেন নাই। সামান্য পিণ্ডাকার মূল হইতে পদ্মের জন্ম হয়। আমরা যদি কখনও প্রস্ফুটিত পদ্ম না দেখিতাম, তাহার পল্লবের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ না করিতাম, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম না যে বাস্তবিক পক্ষে ঐ সামান্য শালুক হইতে এইরূপ সুন্দর ফুলের জন্ম সম্ভব হইতে পারে। শালুকটিকে কাটিয়া তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিলেও সেই সুপ্ত সৌন্দর্য্যের দর্শন মিলিবে না। উদ্যান-পালকের নিকট জানা আছে সেই সৌন্দর্য্যকে জাগাইয়া তুলিতে হয় কিরূপে। আমরা যেই পর্য্যন্ত ঈশ্বরের অবতারের মধ্যে ঈশ্বরের প্রভাকে প্রকাশিত দেখিতে

না পাই, আমাদের নিজের মধ্যে এবং অপরের মধ্যে কি আধ্যাত্মিক শক্তি ও সৌন্দর্য্য সুপ্তাবস্থায় লুক্কায়িত আছে, তাহা আমরা কখনও বুঝিতে পারি না। ঈশ্বরের অবতারকে জানিতে পারিয়া, তাঁহার প্রেমিক হইয়া ও তাঁহার উপদেশাবলী অনুসরণ করিয়াই, আমরা আমাদের জীবনের অপর্য্যাপ্ত সম্ভাবনা সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতন হইয়া উঠি; তাঁহার উপদেশ হৃদয়ে ধারণ না করিলে বিশ্বের মর্ম্মনিহিত সত্য, বিশ্ব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য, বিশ্বের জীবন-প্রবাহের তাৎপর্য্য, কিছুই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না।

ঈশ্বরপ্রেম

ঈশ্বরের অবতারকে জানা অর্থে তাঁহাকে প্রেম করাও বুঝায়। জ্ঞান ও প্রেম অভিন্ন; একটি ছাড়া অপরটি হইতে পারে না। বাহাউল্লা'র বাণী অনুসারে, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরকে জানা ও প্রেম করা। তিনি এক ফলকলিপিতে বলিতেছেন:—

"প্রেমেই সমস্ত জীব সৃষ্ট হইয়াছে, প্রেমেই তাহাদের স্থিতি; একটি সুপরিচিত প্রবাদ বাক্যে (হাদিছে) কথিত আছে, 'আমি গুপ্ত ছিলাম, গুহানিহিত রত্নের মত; পরিচিত হইবার পরম আগ্রহে আমি ব্যাকুল হইলাম; আমি সৃষ্ট চরাচর সৃষ্টি করিলাম, পরিচিত হইবার জন্য।'"

"নিহিত বাক্য"এ তিনি বলিতেছেন:—"হে অস্তিত্বের সন্তান! তুমি আমাকে প্রেম নিবেদন ক'র, আমি তাহা হইলে তোমাকে ভালবাসিব; তুমি যদি আমাকে ভাল না বাস, আমার প্রেম তোমাকে পৌঁছিতে কখনই পারিবে না। সুতরাং, হে ভৃত্য, সবিশেষ জানিয়া রাখ।"

"হে সর্ব্বোচ্চ দৃশ্যের সন্তান! আমি তোমার মধ্যে আমা হইতে এক প্রাণশক্তি নিহিত করিয়াছি, তুমি আমাকে ভালবাসিবে, এইজন্য। তুমি আমাকে ছাড়িয়া কি কারণে অপরকে ভালবাসিতেছ?"

বাহাইএর জীবনের একমাত্র উপজীব্য ও উদ্দেশ্য ঈশ্বরের প্রেমিক হওয়া, অর্থাৎ ঈশ্বরকে ঘনিষ্ট সঙ্গী, অন্তরঙ্গ বন্ধু, অতুলনীয় প্রেমাস্পদরূপে প্রাপ্ত হওয়া ও তাঁহার সমীপে পূর্ণ-আনন্দ লাভ করা।

ঈশ্বরকে প্রেম করার অর্থ প্রত্যেকটি সৃষ্ট পদার্থ ও প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীবের প্রতি প্রেমপূর্ণ হওয়া, কেননা সমস্তই ঈশ্বরের সৃষ্ট। প্রত্যেক বাহাই পূর্ণ প্রেমিক হইবে, অকপট চিত্তে, পরম আগ্রহ সহকারে সকলকেই ভালবাসিবে—কাহাকেও ঘৃণা করিবে না, কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না, কারণ প্রত্যেক মুখমণ্ডলে সে তাহার প্রেমাস্পদের মুখমণ্ডল দেখিতে শিখিয়াছে, প্রত্যেক স্থানে তাহার প্রেমাস্পদের পদ-চিহ্ন দেখিতেছে। তাহার প্রেম জাতি, সম্প্রদায়, বর্ণ, শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবসমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। বাহাউল্লা' বলিতেছেন:—

"পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত যুগে বলা হইয়াছে—'নিজের স্বদেশকে ভালবাসাই বিশ্বাসের প্রধান কথা'; কিন্তু এই পরম-প্রকাশের দিনে 'মহত্ত্বের রসনা' বলিতেছেন—'যে ব্যক্তি নিজের দেশকে ভালবাসে, প্রশংসার্হ বা মহিমা-সম্পন্ন সে ব্যক্তি নহে; যে ব্যক্তি মানব-মাত্রকেই ভালবাসে, সে ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষে ধন্য।'"—(বিশ্বের ফলকলিপি)

তিনি পুনরায় বলিতেছেন:—

"যে ব্যক্তি নিজের প্রতি উদাসীন থাকিয়া নিজের ভ্রাতার কথা আগে চিন্তা করে, সে ব্যক্তি পরম সৌভাগ্যশালী; এইরূপ ব্যক্তিই বাহাই।"—(স্বর্গের বাণী)

আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন যে "আমাদিগকে বহু শরীরে এক আত্মাসদৃশ হইতে হইবে, কেননা আমরা পরস্পর পরস্পরকে যতই অধিক ভালবাসিব, ততই অধিক ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিব।" একজন খৃষ্টান পাদ্রীকে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"প্রেমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, প্রেমের বিধানকে জয়যুক্ত করিবার জন্য, অবতারগণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন, ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ পৃথিবীতে প্রচারিত হইল। * * * যে প্রেম সমস্ত বিরোধভাব অপসারিত করিতে পারে, শত্রুদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগকে মিত্র করিতে পারে, সমস্ত বিভেদমূলক বাধা প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া লইতে পারে, যে প্রেম, দয়া, মমতা, পূর্ণহৃদয়তা, সহনশীলতা ও মুক্তি-সাধনাকে সার্থক করে, যে প্রেম সমস্ত বিঘ্ন দূর করিতে সমর্থ, আমরা সেই অসীম, অনিবার্য্য, সর্ব্বোপপ্লবকারী প্রেম যাচ্ঞা করি।"—(মীর্জ্জা আহ্‌মদ সোহ্‌রাবের রোজ্‌-নাম্‌চা, ৯ই জুন, ১৯১৪)

আবার তিনি বলিয়াছেন :—

"প্রত্যেক বাহাই অন্য সকলের প্রতি প্রেমযুক্ত হইবে, নিজের সর্ব্বস্ব, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইবে না, সর্ব্বোপায়ে সকলকে সুখী করিবার জন্য সে যথাসাধ্য করিবে। কিন্তু এই সমস্ত ব্যক্তি যাহাদের জন্য সে যথাসাধ্য করিবে, স্বার্থ-বুদ্ধিহীন হইবে ও আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকিবে। এমতে এই সূর্য্যোদয় সকল দিগ্বলয় উদ্ভাসিত করিতে পারে, এই মনোহর সঙ্গীত সমগ্র মানবকুলকে পরম সুখ-শান্তি দান করিতে পারে, এই আধ্যাত্মিক ঔষধ সর্ব্ব-ব্যাধি দূর করিতে পারে, এই সত্যের প্রেরণা প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের কারণ হইতে পারে।"— (আব্দুল্‌বাহার ফলকলিপি, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭)

বিযুক্ততা

ঈশ্বরকে আরাধনা করিবার অর্থ, ঈশ্বর ব্যতীত সকল বস্তু হইতে বিযুক্ত হওয়া; অর্থাৎ, স্বার্থবুদ্ধিজনিত ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার ভোগ-লিপ্সা হইতে বিযুক্ততা। ঈশ্বরের পথ ঐশ্বর্য্য, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, অস্বাস্থ্য, নানারূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়া গিয়াছে; পথের পার্শ্বে প্রাসাদ আছে, কারাগার আছে, গোলাপফুলের উদ্যান ও নির্য্যাতন কক্ষ, সমস্তই আছে। যাহাই থাকুক না কেন, বাহাই সমস্তই হর্ষোৎফুল্ল মনে সম্মতি সহকারে স্বীকার করিয়া লইবে। বিযুক্ততার অর্থ ইহা নহে যে নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি বাহাই সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিসাধন কল্পে আদৌ কোনো চেষ্টাই করিবে না, নির্ব্বিচারে তাহা মানিয়া লইবে; তাহার অর্থ ইহাও নহে যে, ঈশ্বর যে সমস্ত সুন্দর বস্তু পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেগুলি সম্বন্ধে বাহাই অতি হীন ধারণা পোষণ করিবে, ঘৃণ্য মনে করিবে। প্রকৃত বাহাই পার্থিব পারিপার্শ্বিকের প্রতি উদাসীন হইবে না, বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইবে না বা সন্ন্যাসী মনোভাবাপন্নও হইবে না। ঈশ্বরের পথে সে প্রচুর কর্ম্ম, প্রভূত কল্যাণ, অপরিসীম আনন্দ প্রাপ্ত হইবে; সে সুখের অন্বেষণে বা ঈশ্বর তাহাকে যে বস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার জন্য লালায়িত হইয়া, ঈশ্বরের পথ হইতে কেশাগ্রও বিচ্যুত হইবে না। যখন কোনো ব্যক্তি "বাহাই" হয়, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাহার ইচ্ছা এক হইয়া যায়; কেননা ঈশ্বরের সহিত অনৈক্য হওয়া, বাহাইএর পক্ষে নিতান্ত অসহনীয়। ঈশ্বরের পথে ভ্রান্তি তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, দুঃখ-কষ্ট-উপদ্রব তাহাকে সন্ত্রস্ত করিতে অক্ষম হয়। প্রেমের অনির্ব্বাণ জ্যোতিতে

তাহার চরম দুঃখের দিনও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাহার নিকটে, কষ্ট-ভোগ, সুখভোগে রূপান্তরিত হয়, আত্মোৎসর্গ বিপুল পুলকের সঞ্চার করে, জীবন বীরোচিত সাহসিকতার স্তরে উন্নীত হয়, মৃত্যু আনন্দদায়ক অভিযানে পরিণত হয়। বাহাউল্লা' বলিতেছেন :—

"যে ব্যক্তির হৃদয়ে আমার প্রতি ভালবাসা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর প্রতি সর্ষপ-বীজ-পরিমাণ, বিন্দুমাত্রও ভালবাসা আছে, সে কখনও আমার রাজত্বে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে না।"—(সুরাতুল হায়্কল্)

"হে মানব-সন্তান! যদি তুমি আমাকে ভালবাস, তোমার আপন সত্তা হইতে বিমুখ হও। যদি আমার ইচ্ছা বাসনা কর, তোমার নিজের অভিলাষ পরিত্যাগ ক'র, যেন তুমি আমাতে প্রাণান্ত হইতে পার এবং আমি তোমাতে জীবন্ত থাকি।"

"হে আমার ভৃত্য! এই জগতের অসংখ্য বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ক'র, স্বকীয় সত্তার কারাগার হইতে নিজেকে মুক্ত ক'র। সময়ের মূল্য উপলব্ধি করিতে শিক্ষা ক'র; কারণ সুযোগ আর আসিবে না, তুমি আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না।"—(নিহিত বাক্য)

বাধ্যতা

আদেশের কারণ যুক্তিদ্বারা বুঝিতে অসমর্থ হইয়াও যেমন জাহাজের নাবিক জাহাজের অধ্যক্ষ বা ক্যাপ্টেনের আদেশ মানিয়া লইয়া থাকে ও সেই আদেশানুযায়ী কাজ করিয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরে নিবেদিত-জীবন ভক্ত তাঁহার আদেশ-বাণীর তাৎপর্য্য সর্ব্বস্থলে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও, তাঁহার আদেশের কারণ না বুঝিলেও তাঁহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে। ইহাকে অন্ধমূঢ়তা মনে

করা কখনই চলে না। জাহাজের নাবিক বিলক্ষণ জানে, যে যিনি জাহাজের ক্যাপ্টেন্ হইয়াছেন, তিনি বহু পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার শিক্ষানবিসীর কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, তিনি তাঁহার সমর্থতার ও জাহাজ-পরিচালন-ক্ষমতার অসংখ্য প্রমাণ দিয়াছেন। সেইরূপ, বাহাই অবিচলিতভাবে তাহার মুক্তি-পোতের অধ্যক্ষের আদেশ মানিয়া চলিবে, কিন্তু যদি সে তাঁহার উপযুক্ততা সম্বন্ধে পূর্ব্বে নির্ণয় না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে তাঁহার আদেশ মানিয়া চলা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইবে; আবার তাঁহার উপযুক্ততার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াও যদি সে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী না হয়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ আর কিছুই হইতে পারে না; কারণ, বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিয়া, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া অভিজ্ঞ অধ্যক্ষের আজ্ঞানুবর্ত্তী না হইলে আমরা তাঁহার জ্ঞানের ফল লাভ করিতে পারি না, তাঁহার জ্ঞান-সম্ভার হইতে বঞ্চিত হই। জাহাজের ক্যাপ্টেন্ যথোপযুক্ত জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও যদি নাবিকগণের কেহই তাঁহার আদেশ পালন না করে, তাহা হইলে জাহাজ কি প্রকারে নিরাপদে বন্দরে পৌছিতে পারে, নাবিকগণই বা কিরূপে নৌচালনের কৌশল শিক্ষালাভ করিতে পারে? যীশুখৃষ্ট স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, জ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায় একান্ত-বাধ্যতা। তাঁহার বাণী এইরূপ:—

"আমি যে উপদেশ দিতেছি, তাহা আমার নিজের কথা নহে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা তাঁহারই বাণী। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবে সে নিজেই জানিতে পারিবে, এই উপদেশ ঈশ্বরের, না আমি আপনা হইতে বলি।"—(যোহন ৭, ১৬-১৭)

সেইরূপ বাহাউল্লা' বলিতেছেন:—

"ঈশ্বর যাহা আদেশ করিয়াছেন এবং যাহা 'প্রভা'র লেখনীমুখে

পরমগ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পালন না করিলে, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান বা তাঁহার প্রতি আস্থা, কিছুই জন্মিতে পারে না।—("তজল্লিয়াৎ"এর ফলকলিপি)

বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক যুগে নিরবচ্ছিন্ন বাধ্যতা প্রশংসনীয় গুণ বলিয়া স্বীকৃত হয় না, সত্য; আর, কোনো সাধারণ মানবের প্রতি একান্ত-অখণ্ড বাধ্যতা সর্ব্বনাশের কারণ হইতে পারে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ পালন করিয়াই সমগ্র মানবকুল ঐক্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে; এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো পন্থা নাই। সকলে "ঈশ্বরের ইচ্ছা" অনুসারে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একই আদেশ-বাণী পালন করিবে, তাহা না হইলে পৃথিবীতে সাম্য-মৈত্রী স্থাপিত হইতে পারে না। যতদিন পর্য্যন্ত "ঈশ্বরের ইচ্ছা" সম্যক প্রকাশিত না হয়, যতদিন সমগ্র মানবকুল অন্য সমস্ত জননায়ক, নেতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের অবতারের আজ্ঞানুবর্ত্তী না হয়, ততদিন যুদ্ধ-বিগ্রহ-কলহ-বিবাদ, বিসম্বাদের অবসান ঘটিবে না, অবিরাম চলিতে থাকিবে; পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিবে এবং নিজেদের সমস্ত শক্তি ঈশ্বরসেবায় জনসাধারণের হিতার্থে প্রয়োগ করিবার পরিবর্ত্তে অপরের উদ্যম, প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত ব্যয়িত করিবে।

সেবা

ঈশ্বরের আরাধনা বা সেবা করিবার আর এক অর্থ সমগ্র মানবকুলের সেবা করা। ঈশ্বরকে সেবা করিতে হইলে তাঁহার সৃষ্ট মানবকুলের সেবা করিতে হয়; ঈশ্বর-সেবার অন্য কোনো উপায় নাই। যদি আমরা মানবকুল হইতে বিমুখ হই, ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইতেছি।

যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন :—"যদি তুমি আমার এই সমস্ত ভ্রাতাগণের ক্ষুদ্রতমটির সেবা না করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি আমার সেবাও কর নাই।" তদ্রূপ বাহাউল্লা'ও বলিতেছেন :—

"হে মানব-সন্তান! যদি তুমি পরম করুণার প্রার্থী হও, তাহা হইলে কিসে তোমার কল্যাণ হইবে সেই দিকে লক্ষ্য করিও না, কিন্তু কিসে মানবকুলের কল্যাণ হইবে সেজন্য সচেষ্ট থাক। যদি তুমি নিজের প্রতি ন্যায়পর আচরণ পাইতে চাও, তাহা হইলে নিজের জন্য তুমি যাহা নির্ব্বাচন করিবে, অপরের জন্যও তুমি তাহাই নির্ব্বাচিত করিবে।"—(স্বর্গের বাণী)

আব্‌দুল্‌বাহা বলিয়াছেন :—

"বাহাই ধর্ম্মে কলা-বিজ্ঞানসাধনা, সর্ব্ব-প্রকারের শিল্প-চর্চ্চাই ঈশ্বর সেবার বিবিধরূপ। যে ব্যক্তি যথাসাধ্য উৎকর্ষ সাধন করিয়া, যথোপযুক্ত পরিশ্রম সহকারে সামান্য একখণ্ড পত্র-লিখনোপযোগী কাগজ প্রস্তুত করে, সেও তদ্বারা ঈশ্বরেরই সেবা করিতেছে, বুঝিতে হইবে। পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া, মানবসেবার অপরিসীম আগ্রহে অনুপ্রাণিত হইয়া, উচ্চতম মানসিক বৃত্তিসমূহ দ্বারা পরিচালিত হইয়া, যে ব্যক্তি যাহাই করুক না কেন, তাহার সেই প্রচেষ্টা, সেই পরিশ্রমই ঈশ্বর-সেবার একটি বিশিষ্ট উপায় বলিয়া গণ্য হইবে। মানব-সেবা ও মানবের প্রয়োজনীয় বস্তুর বিধান-ব্যবস্থা করা, ইহাকেই ঈশ্বর-সেবা বলে। সেবা ও উপাসনা, এক ও অভিন্ন। যে চিকিৎসক, করুণার্দ্রচিত্তে, মমতা-সহকারে, সর্ব্বপ্রকারের কুসংস্কার বর্জ্জিত হইয়া, সমগ্র মানবকুলের ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া, সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া রোগীর সেবা করিতে থাকে, সে চিকিৎসক চিকিৎসার দ্বারাই ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে।"—(প্যারিসে কথাবার্ত্তা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৬৪)

প্রচারকার্য্য

প্রকৃত বাহাই' মাত্র স্বয়ং বাহাউল্লা'র উপদেশাবলীর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আস্থা-সম্পন্ন হইবে, তাহা নহে, সে বাহাউল্লা'র উপদেশবাণী দ্বারা তাহার সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবে এবং যে জ্ঞানালোকে তাহার সত্তা উন্নত হইয়াছে সে তাহা পরম আনন্দ ও উৎসাহসহকারে অপর সকলকে বিতরণ করিবে। একমাত্র এই উপায়ে সে পরমাত্মার শক্তি, সহায়তা পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হইবে। সকল ব্যক্তি দক্ষ-লেখক বা বাগ্মী না হইতে পারে, কিন্তু সকলেই বাহাউল্লা'র উপদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারে। বাহাউল্লা' বলিতেছেন ঃ—

" 'বাহা'র জনগণ জ্ঞান-বুদ্ধিসহকারে ঈশ্বরের সেবাতে নিযুক্ত থাকিবে, তাহারা তাহাদের জীবন-যাত্রা-পদ্ধতির আদর্শে অপর সকলকে শিক্ষা দান করিবে। তাহারা তাহাদের কার্য্যকলাপে ঈশ্বরের অনির্ব্বাণ জ্যোতিঃ প্রকাশিত করিবে। বাক্য অপেক্ষা কর্ম্মের প্রভাব অনেক অধিক। * * * প্রচারকের কথিত বাক্যের ফল, তাহার উদ্দেশ্যের পবিত্রতা ও ত্যাগের উপর নির্ভরশীল। কোনো কোনো ব্যক্তি বাক্যেই সন্তুষ্ট, কিন্তু বাক্যের যথার্থতা কর্ম্মের দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে এবং জীবনে প্রতিফলিত হয়। কর্ম্ম মানুষের প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত করে। বাক্য, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা'র রসনা হইতে নিঃসৃত, ফলকলিপিতে লিপিবদ্ধ বাক্যের অনুযায়ী হইতে হইবে।"—(জ্ঞান-বাণী)

কিন্তু যাহারা উপদেশ গ্রহণে অনিচ্ছুক, বাহাই কদাচ তাহাদের উপর জোর করিয়া নিজের ভাব, নিজের কথা চাপাইতে চেষ্টা করিবে না। সে জগদ্বাসীকে ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে আকৃষ্ট করিবে, তাড়া করিয়া লইয়া যাইবে না। সে ঐ উত্তম মেষপালক সদৃশ হইবে,

যে তাহার মেষকুলকে পথ-প্রদর্শন করিতে থাকে ও আপন সঙ্গীতের দ্বারা তাহাদিগকে উল্লাসিত করে, কিন্তু এমন এক ব্যক্তির ন্যায় হইবে না যে কুকুর ও যষ্টির দ্বারা তাহাদিগকে পিছন হইতে তাড়া করে।

বাহাউল্লা' "নিহিত বাক্য"এ বলিতেছেন ঃ—

"হে মৃত্তিকার সন্তান! জ্ঞানীব্যক্তি কখনও শ্রোতা না মিলিলে কথা বলেন না, যেমন পেয়ালাবাহী কখনও প্রার্থী ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে পেয়ালা দান করিতে উদ্যত হয় না।"

"ইশরাকাৎ"এর ফলকলিপিতে তিনি বলিতেছেন ঃ—"হে 'বাহা'র জনমণ্ডলী! তোমরা ঈশ্বরের প্রেমের উদয়াচল, তাঁহার করুণারই দিব্য-প্রস্রবণ। কাহাকেও অভিসম্পাত দিয়া বা কাহাকেও মন্দ কথা বলিয়া তোমাদের রসনা কলঙ্কিত করিও না। অযোগ্য দৃশ্য হইতে তোমাদের চক্ষু আবৃত করিয়া রাখিও, তোমাদিগকে যেন সে সমস্ত দেখিতে না হয়। যে সত্য-বস্তু তোমাদের আছে, তোমরা তাহাই জনসমাজে অভিব্যক্ত করিবে। যদি তাহা গৃহীত হয়, তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল। যদি তাহা গৃহীত না হয়, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি সত্য-বস্তু প্রত্যাখ্যান করিল, তাহার সঙ্গে কলহ করা বা তাহাকে মন্দ কথা বলা একান্ত নিরর্থক। তাহাকে তাহার মতই থাকিতে দাও এবং তোমরা তোমাদের প্রভু সনাতন ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হও। তোমরা কখনও কাহারও কষ্টের কারণ হইও না, রাজদ্রোহ, যুদ্ধ-বিগ্রহের ত কথাই নাই। আমি আশা করি, তোমরা ঈশ্বরের করুণা-বৃক্ষের ছায়া-তলে লালিত পালিত হইবে ও তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবে। তোমরা একই বৃক্ষের পত্রনিচয়, একই সমুদ্রের বারিবিন্দু।"

সৌজন্য ও শ্রদ্ধা

বাহাউল্লা' বলিতেছেন :—

'হে 'বাহা'র জনমণ্ডলী ! সৌজন্য সর্ব্ব অন্যান্য গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি তোমাদিগকে সৌজন্য-সমন্বিত হইতে উপদেশ দিতেছি। যে ব্যক্তি সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচ্ছদে সুশোভিত, সৌজন্যের আলোকে উদ্ভাসিত, সে ব্যক্তি ধন্য। সৌজন্য-শ্রদ্ধা-সমন্বিত ব্যক্তির মর্য্যাদা অতুলনীয়। আমি আশা করি, এই অত্যাচারিত ব্যক্তি এবং অপর সকলেই এই গুণে ভূষিত হইবে, ইহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে, ইহাকে রক্ষা করিয়া চলিবে। ইহা ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় আদেশ,—যাহা মহীয়ান্ নামের লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে।"—(বিশ্বের ফলকলিপি)

তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন :—

"পৃথিবীর জাতিসমুহ পরস্পরের সহিত আনন্দ-উল্লাসে মিলিবে মিশিবে। হে জনমণ্ডলী ! তোমরা সকল ধর্ম্মের জনগণের সহিত আনন্দ-উল্লাসে সম্মিলিত হও।"

আব্দুল্‌বাহা আমেরিকান বাহাইদিগকে এক ফলকলিপিতে বলিতেছেন :—

"সাবধান ! সাবধান ! তোমরা কদাচ কাহারও মনে লেশমাত্র কষ্ট দিও না।
সাবধান ! সাবধান ! তোমরা কখনো কোনো আত্মাকে আহত করিও না।
সাবধান ! সাবধান ! তোমরা কাহারো সহিত অকরুণ আচরণ করিও না।
সাবধান ! সাবধান ! কদাচ কোনো প্রাণীর নৈরাশ্যের কারণ হইও না॥

"যদি কেহ কোনো একটি আত্মারও নৈরাশ্যের হেতু হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে পৃথিবীতে বিচরণ করা অপেক্ষা পৃথিবীর গভীরতম গহ্বরে লুক্কায়িত থাকা শ্রেয়ঃ।"

তিনি উপদেশ দিয়া বলিতেছেন যে, পুষ্প যেমন মুকুলের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ এক ব্যক্তি বাহ্যতঃ যতই কুৎসিত কি অপ্রিয় হউক না কেন তাহার অন্তরে ঈশ্বরপ্রদত্ত এক প্রাণময় শক্তি বিরাজ করে। এই কারণে প্রকৃত বাহাই সকলের সঙ্গে এইরূপ সাবধানতা সহকারে আচরণ করিবে, যেমন উদ্যান-পাল একটি দুর্লভ সুন্দর চারা-গাছের যত্ন লইয়া থাকে। সে জানে যে, সে জোর করিয়া তাড়াতাড়ি কলীকে ফুটাইয়া ফুলে পরিণত করিতে পারে না, সূর্য্যোত্তাপে যথা-সময়ে ফুল প্রস্ফুটিত হইবে। সুতরাং, প্রত্যেক অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে ও বাসগৃহে সেই প্রাণপ্রদ সূর্য্যরশ্মিগুলি পৌঁছাইয়া দেওয়াই বাহাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আব্দুল্‌বাহা অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন ঃ—

"বাহাউল্লা'র উপদেশাবলীর একটি উপদেশে তিনি বলিয়াছেন যে সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য, ক্ষমাশীল হওয়া, শত্রুকে ভালবাসা ও মন্দ-চিন্তক ব্যক্তিকে শুভানুধ্যায়ী মনে করা। এই কথার অর্থ ইহা নহে যে শত্রুকে শত্রু মনে করিয়া, তাহাকে সহ্য করিয়া, তাহাকে ক্ষমা করিয়া চলিতে হইবে; কারণ, এইরূপ মনোভাব ত মিথ্যাচরণের নামান্তর মাত্র, প্রকৃত প্রেম ইহাকে বলা যাইতে পারে না। ইহার অর্থ এই যে শত্রুদিগকে মিত্র মনে করিতে হইবে, যাহারা তোমার অনিষ্ট-চিন্তা করে, তাহাদিগকে তোমার ইষ্টচিন্তাকারী বন্ধু মনে করিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। তোমার প্রেম অকৃত্রিম হইবে, তোমার করুণা সত্যসত্যই তোমার হৃদয় হইতে উৎসারিত হইবে। কেবলমাত্র সহনশীলতাকে প্রেম বলা যায় না; হৃদয় হইতে যদি সহন-শীলতা না আসে, তাহা হইলে সে ত মিথ্যাচরণ মাত্র।"— (পশ্চিমের তারকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯১)

এই উপদেশাবলী আপাততঃ অবোধগম্য, পরস্পরবিরোধী মনে

হইতে পারে। কিন্তু যদি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লই যে বহিঃস্থ ভৌতিক মানুষ শত্রুভাবাপন্ন, অনিষ্ট-চিন্তক হইলেও প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এক আধ্যাত্মিক সত্তা বিরাজমান রহিয়াছে, ইহাই প্রকৃত মানুষ, ইহা হইতে একমাত্র প্রেম ও ইষ্টচিন্তা ব্যতীত আর কিছুই উৎসারিত হয় না, তাহা হইলে এই উপদেশাবলী বুঝিতে আমাদের কোনো কষ্ট হইবে না। আমাদের প্রত্যেক প্রতিবেশীর এই প্রকৃত অন্তঃস্থ সত্তার দিকেই আমাদের চিন্তা ও প্রেম পরিচালিত করিতে হইবে। যখন এই অন্তঃস্থ সত্তা উত্তিষ্ঠিত ও জাগ্রত হইবে, তখন বহিঃস্থ মানুষ রূপান্তরিত ও নবীভূত হইবে।

পাপ-আচ্ছাদনকারী চক্ষু

অপরের দোষ-অনুসন্ধান হইতে বিরত হইবার জন্য বাহাউল্লা' প্রত্যেক বাহাইকেই বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন।

যীশুখৃষ্ট তাঁহার বিখ্যাত "পর্ব্বত শিখরে প্রদত্ত উপদেশাবলীতে" এসম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন; কিন্তু খৃষ্টানগণের ধারণা, যীশুখৃষ্টের এসমস্ত উপদেশ-বাক্য বাস্তব জীবনে অনুসৃত হইবার জন্য উক্ত হয় নাই, এইগুলি আদর্শ-বাদ-মূলক কথা। কিন্তু বাহাউল্লা' এবং আব্দুল্‌বাহা উভয়েই সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন যে তাঁহারা যাহা বলিতেছেন, তাহা প্রাত্যহিক জীবনে অনুসৃত হইবার জন্যই বলা হইয়াছে।

"নিহিত বাক্য"এ আমরা পাঠ করি :—

"হে মানব-সন্তান! যতদিন তুমি পাপকর্ম্মা থাকিবে, ততদিন তুমি অপরের দোষ কীর্ত্তন করিও না। যদি তুমি আমার এই আদেশের বিপরীত কার্য্য কর, তাহা হইলে তুমি আমার নও,—আমি এই কথার স্বয়ং সাক্ষী।"

"হে অস্তিত্বের সন্তান! তোমার নিজের প্রতি যাহা তুমি আরোপ করিতে ইচ্ছা কর না, তাহা কোনো প্রাণীর প্রতিও আরোপ করিও না। * * * ইহাই আমার আদেশ তোমার প্রতি, এই আদেশ পালন ক'র।"

আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন :—

"অপরের দোষ সম্বন্ধে নীরব থাকা, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করা, তাহাদিগকে সাহায্য করা, মমতা সহকারে তাহাদের দোষ সংশোধন করা, ইহাই বাহাইএর কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা ভাল দিকটাই দেখিতে হইবে, মন্দ দিকটা কখনও দেখিবে না। যদি কোনো ব্যক্তির দশটি সদ্‌গুণ ও একটি দোষ থাকে, তাহার গুণগুলির দিকেই তুমি দেখিবে, দোষটির কথা ভুলিয়া যাইও, তাহা মনেও আনিও না। যদি কোনো ব্যক্তির দশটি দোষ থাকে ও একটি গুণ, তাহার গুণটির দিকেই তুমি দেখিবে, দোষগুলি ভুলিয়া যাইও। কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধেই একটি নিষ্ঠুর কথাও কদাচ বলিবে না, সে ব্যক্তি যদি তোমার শত্রু হয়, তাহা হইলেও নহে।"

একজন আমেরিকান বাহাইএর নিকটে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"অপরের অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা করা বা কুৎসা রটান মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয় দোষ ও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ; বিশেষতঃ যখন কোনো বাহাইএর রসনা ঐরূপে কলঙ্কিত হয়, তখন অপরাধ অমার্জ্জনীয়। যদি নিন্দা-কুৎসার জন্য রসনা কদাচ ব্যবহৃত না হইয়া কেবলমাত্র অপরের প্রশংসা-বাদ, সাধুবাদেই নিরত থাকে, তাহা হইলে প্রভু বাহাউল্লা'র পবিত্র উপদেশাবলী অচিরেই বহুল-প্রচারিত হইবে, চিত্তসমূহ আলোকিত হইবে, আত্মাসমূহ জ্যোতির্ম্ময় হইবে, পৃথিবী

চিরস্থায়ী আনন্দ-শান্তির রাজ্যে পরিণত হইবে।"—(পশ্চিমের তারকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯২)

দীনতা

অপরের দোষ সম্বন্ধে যেমন নীরব থাকিতে হইবে, অপর পক্ষে তেমনই নিজের দোষ, ত্রুটী, অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে হইবে। নিজের গুণগুলির সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া নিজের দোষগুলি আবিষ্কার করিয়া তাহার সংশোধন করিতে হইবে। বাহাউল্লা' "নিহিত বাক্য"এ বলিতেছেন ঃ—

"কি জন্য তুমি নিজের দোষ, নিজের অসম্পূর্ণতা বিস্মৃত হইয়া অপরের দোষকীর্ত্তনে তৎপর হইয়াছ? যে ব্যক্তি তাহা করে, আমি তাহার দণ্ড বিধান করি।"

"রসনা আমার নাম উচ্চারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। কুৎসা ছড়াইবার জন্য নিন্দাবাদ উচ্চারণ করিয়া রসনা কলঙ্কিত করিও না। আত্ম-প্রমত্ততার অগ্নিতে তুমি যদি কখনও দগ্ধ হও, অহঙ্কার যদি তোমার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া বসে, তুমি তখন তোমার দোষাবলীর কথা চিন্তা করিবে, আমার ভৃত্যগণের নিন্দা কদাচ করিবে না; কারণ, তোমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিষয়ই অপরের বিষয় অপেক্ষা বেশী জান। যাহার সম্বন্ধে অল্প জ্ঞান, তাহার সম্বন্ধে নিন্দা করিবার তোমার কোনো অধিকার নাই।"

আব্দুল্‌বাহা খৃষ্টীয়ানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

"তোমাদের জীবন খৃষ্ট-রাজ্যের নিঃসৃত জীবন হউক। তিনি আসিয়াছিলেন সেবা করিতে, সেবিত হইতে আসেন নাই। * * * বাহাউল্লা'র ধর্ম্মে সকলেই সেবক-সেবিকা, ভ্রাতা-ভগ্নি। যে দণ্ডে কেহ মনে করিল, সে অন্যান্য সকলের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও

উৎকৃষ্ট, সেই দণ্ডেই তাহার অবস্থা বিপদসঙ্কুল হইল। যতক্ষণ সে এই পাপ চিন্তার বীজ চিত্ত-ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে সমর্থ না হয়, ততক্ষণ পরমরাজ্যের সেবকত্বে তাহার উপযুক্ততা জন্মে না।

"নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্টিই প্রগতির জনয়িতা, অগ্রগতির চিহ্ন। যে আত্মা নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট, আত্মপ্রসন্ন, আত্মপরিতৃপ্ত, সে ত শয়তানের অবতার। যে ব্যক্তি নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে, সে-ই কৃপাময়ের প্রকাশ। যদি কোনো ব্যক্তির সহস্র গুণ থাকে, তথাপি সেগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা তাহার পক্ষে অকর্ত্তব্য; নিজের দোষ, অসম্পূর্ণতা খুঁজিয়া বাহির করাই তাহার কর্ত্তব্য। * * * একটি ব্যক্তি যতই কেন প্রগতিশীল, উন্নত না হউক, সে কখনও পরিপূর্ণতম অবস্থায় পৌছিতে পারে না, তাহার সম্মুখে পথ প্রসারিত থাকিবেই। প্রসারিত পথের সুদূর একটি গন্তব্য-স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহার আত্ম-পরিতৃপ্ত ভাব কাটিয়া যাইবে, অধিকতর অগ্রগতির জন্য তাহার প্রেরণা আসিবে। আত্মপ্রশংসা আত্মম্ভরিতার চিহ্ন।"—
(মীর্জ্জা আহ্মদ সোহ্রাবের রোজ্নাম্চা, ১৯১৪)

যদ্যপি বাহাউল্লা' আমাদিগের পাপস্বীকার করিতে ও সেজন্য অনুতপ্ত হইতে বলিয়াছেন, পুরোহিতদিগের নিকট বা অন্য ব্যক্তির নিকটে দীর্ঘ অনুতপ্ত বিবৃতি প্রদান প্রভৃতি তিনি একেবারে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি "আনন্দ-বার্ত্তা"তে বলিতেছেন ঃ—

"পাপী যখন সকল চিন্তা পরিহার করিয়া একমাত্র ঈশ্বর-চিন্তায় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া অবস্থান করে, তখন সে একমাত্র ঈশ্বরের নিকটেই ক্ষমা-ভিক্ষা করিবে। মানুষের নিকটে দোষ স্বীকার বা ক্ষমা-ভিক্ষা করা অনুমোদিত নহে; কারণ, মানুষের নিকটে ক্ষমা-ভিক্ষা বা দোষ-স্বীকার করিলে ঈশ্বরের করুণা বা ক্ষমা লাভ করা যায় না।

ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের নিকটে আত্মদোষ স্বীকার করিলে, মাত্র নিজেরই দৈন্য প্রকাশিত হয়, নিজেরই অপমান হয়; ঈশ্বর—তাঁহার প্রভা অত্যুজ্জ্বল হউক—তাঁহার ভৃত্যগণের অপমান কাম্য মনে করেন না। নিশ্চয়ই তিনি পরম দয়ালু ও কৃপাবান। পাপী কেবলমাত্র সেই পরমকরুণানিধান, দয়ার সাগর ঈশ্বরের নিকটেই মার্জ্জনা ও দয়া ভিক্ষা করিবে।"

বিশ্বস্ততা ও সাধুতা

"তরাজাৎ"এর ফলকলিপিতে বাহাউল্লা' বলিয়াছেন :—

"নিশ্চয়ই বিশ্বস্ততা ও সাধুতা পৃথিবীর সমগ্র অধিবাসীবৃন্দের শান্তির দ্বারস্বরূপ এবং পরমকরুণাময়ের স্বীয় মহিমার নিদর্শন। যে ব্যক্তি বিশ্বস্ততা অর্জ্জন করিয়াছে, সে ধনৈশ্বর্য্যের গুপ্তভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশ্বস্ততা ও সাধুতা মানবকুলের শান্তি ও নিরাপত্তার সর্ব্বপ্রধান উপায়। সকল বিষয়-কর্ম্মের স্থায়িত্ব, স্থিরতা ইহার উপর নিরন্তর নির্ভরশীল। ধন, মান, প্রতিপত্তির জগৎ-সংসার ইহার আলোকেই আলোকিত হয়।

"হে 'বাহা'র জনমণ্ডলী! বিশ্বস্ততা ও সাধুতা তোমাদের দেহ মন্দিরের জন্য শ্রেষ্ঠ ভূষণ, তোমাদের মস্তকের জন্য অত্যুজ্জ্বল মুকুট। সর্ব্বশক্তিমান্ আদেশকারীর আদেশক্রমে তোমরা ইহাতে অনুরক্ত থা'ক।"

পুনরায় তিনি বলিয়াছেন :—

"বাগাড়ম্বর না করিয়া নিরন্তর কার্য্য করিয়া যাওয়াই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রধান কথা। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত কথা বলে, কিন্তু কাজে কিছুই করে না, তাহার জীবনধারণ নিষ্ফল, বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ"—(জ্ঞান-বাণী)

আব্দুল্‌বাহা বলিয়াছেন :—

“সর্ব্বগুণের ভিত্তীভূত গুণ, সত্যবাদিতা। সত্যবাদিতা ব্যতিরেকে, উন্নতি ও সফলতা, কিছুই লাভ করা যায় না। ইহা এই নশ্বর পৃথিবীতে যেমন সত্য, সর্ব্বলোকেই ইহা সমানভাবে সত্য। কোনো স্থানেই সত্যাচরণ ব্যতীত কিছুই সম্ভব হয় না। যখন এই পবিত্র গুণ মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্যান্য স্বর্গীয় গুণাবলীও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।” —(আব্দুল্‌বাহার ফলকলিপি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৯)

“সত্যপরায়ণতা ও সততার জ্যোতি তোমাদের বদন-মণ্ডলে উদ্ভাসিত, দীপ্যমান্ হইয়া উঠুক, সকলে জানুক যে ব্যবসায়-ক্ষেত্রেই হউক আর অন্যত্রই হউক, তোমাদের কথা বিশ্বাস করিবার মত, তোমাদের কথা নির্ভরযোগ্য। নিজের সত্তা ভুলিয়া যাও ও সকলের জন্য কর্ম্ম ক’র।”—(লণ্ডন বাহাইদিগকে প্রদত্ত বাণী, অক্টোবর, ১৯১১)

আত্মোপলব্ধি

সঙ্কীর্ণ বহিঃসত্তার গণ্ডী বা কারাগার অতিক্রম করিয়া অন্তরতম প্রদেশে নিহিত পূর্ণসত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য বাহাউল্লা’ তাঁহার শিষ্যদিগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেছেন। মানুষের জীবনে যে অসীম শক্তি, অসীম সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে, তাহাকে কাজে লাগাইয়া বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য বাহাউল্লা’ তাঁহার শিষ্যদিগকে দিব্য-প্রেরণা-বলে অনুপ্রাণিত করিতেছেন। “নিহিত বাক্য”এ তিনি বলিতেছেন :—

“হে অস্তিত্বের সন্তান! পরমশক্তির হস্তের দ্বারা আমি তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছি, পরমবলের অঙ্গুলীর দ্বারা আমি তোমাকে সৃজন করিয়াছি। আমার আলোকের উপাদান আমি তোমার মধ্যে নিহিত

করিয়াছি। তুমি তাহারই উপর নির্ভর ক'র, অপর বস্তুর উপর নির্ভর করিও না; কারণ, আমার কার্য্য পূর্ণতা-সম্পন্ন এবং আমার আদেশ অব্যর্থ; ইহাতে অবিশ্বাস করিও না, কি অনিশ্চয়তার স্থান দিও না।"

"হে পরমাত্মার সন্তান! আমি তোমাকে অসীম-বিভবশালী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি, তুমি কেন নিজেকে এত দীন, হীন করিতেছ? আমি তোমাকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছি, তুমি কেন নিজেকে হীনরূপে প্রতিপন্ন করিতেছ? জ্ঞানের উপাদানে আমি তোমাকে প্রকাশ করিয়াছি, কেন তুমি আমাকে ছাড়িয়া অপরকে খুঁজিতেছ? প্রেমের মৃত্তিকায় আমি তোমাকে সিক্ত করিয়াছি, কেন তুমি অপরের অন্বেষণে নিরত রহিয়াছ? তোমার মধ্যে তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'র, যেন তুমি আমাকে শক্তিমান্, ক্ষমতাপন্নরূপে তোমার মধ্যে অত্যুন্নত বিরাজমান্ দেখিতে পাও।"

"হে আমার ভৃত্য! তুমি রত্নখচিত তরবারিসদৃশ,—যাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কৃষ্ণবর্ণ একটি তরবারির আধার, যাহার দরুণ তাহার মাহাত্ম্য মণিকারের নিকটে অজ্ঞাত রহিয়াছে। সুতরাং আত্মম্ভরিতা ও আত্মপ্রসাদের কোষাগার হইতে বহির্গত হও, যেন তোমার রত্নসমূহ দেদীপ্যমান্ হইয়া জগজ্জনের নিকটে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।"

"হে আমার বন্ধু! তুমি আমার পবিত্রতার নভোমণ্ডলের ভাস্বর সূর্য্য বিশেষ, পৃথিবীর আবিলতার দ্বারা তোমার দীপ্তি আচ্ছন্ন হইতে দিও না। অনবধানতার পর্দা বিদীর্ণ ক'র, যেন তাহার অন্তরাল হইতে জাজ্বল্যমান্ হইয়া বহির্গত হইতে পার এবং সমগ্র পৃথিবীকে জীবনের পরিচ্ছদে সুশোভিত করিতে পার।"

বাহাউল্লা' তাঁহার অনুগামীগণকে যে জীবনে অনুপ্রাণিত করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই এত উন্নত ও গৌরবময় যে মানবীয়

শক্তির অপরিসীম সম্ভাবনার মধ্যে মহত্ব ও সৌন্দর্য্যে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানবজীবনের আকাঙ্ক্ষী হওয়া সম্ভব নহে। আমাদের মধ্যে আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তার উপলব্ধি অর্থে, এই মহান্ সত্যকে উপলব্ধি করা বুঝায়—আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি, পুনরায় তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইব। ঈশ্বরের নিকটে এই ফিরিয়া যাওয়াই, বাহাই-দিগের একমাত্র গৌরবময় লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছিবার একমাত্র পথ, ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত অবতারগণের আদেশ-উপদেশ মানিয়া চলা; বিশেষরূপে ঈশ্বরের ঐ অবতারের আজ্ঞানুবর্ত্তীতাই একমাত্র পথ, যাঁহার যুগে আমরা অবস্থান করিতেছি; এবং তিনিই বাহাউল্লা', এই নবযুগে ঈশ্বরের অবতার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রার্থনা

"প্রার্থনারূপ সোপান বাহিয়া প্রত্যেকেই স্বর্গে আরোহণ করিতে পারে।"—(মোহাম্মদ)

ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন

আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন :—" 'নমাজ' অর্থাৎ প্রার্থনা ঈশ্বরেব সঙ্গে কথোপকথনের একটি বিশিষ্ট রূপ।" ঈশ্বর তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য মানবের সহিত মানবের ভাষায় কথা বলেন ও তাঁহার অবতারগণের মুখ দিয়াই তিনি তদ্রূপ করিয়া থাকেন। যতদিন অবতারগণ পৃথিবীতে সশরীরে অবস্থিতি করেন, ততদিন তাঁহারা মানবের সঙ্গে মুখামুখি কথা বলেন, তারপর, অবতারগণের তিরোভাব ঘটিলে, তাঁহাদের লিপিবদ্ধ বাণী ও গ্রন্থরাজীর মধ্য দিয়া ঈশ্বরের বার্ত্তা মানবের নিকটে পৌঁছিয়া থাকে। কিন্তু, ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের ভাব-বিনিময়ের উপায় এতদ্ব্যতীত আরও আছে। উচ্চারিত বা লিখিত ভাষা হইতে বিভিন্ন একটি বিশেষ "আধ্যাত্মিক ভাষা" আছে, তদ্দারাও ঈশ্বর সত্যান্বেষীদের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত করেন; তাহারা যে দেশেই থাকুক না কেন, তাহাদের যে মাতৃভাষাই হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায়

না। এই ভাষার সাহায্যে ঈশ্বরের অবতার তাঁহার তিরোভাবের পরেও সত্য-বিশ্বাসীগণের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া থাকেন। যীশুখৃষ্টের তিরোধানের পরও তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে অনুপ্রাণিত ও তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন; বরঞ্চ, তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার যে প্রভাব ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে, তাহা অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছিল। অন্যান্য অবতারগণের সময়েও তদ্রূপ হইয়াছিল। আব্‌দুল্‌বাহা এই আধ্যাত্মিক ভাষা সম্বন্ধে বিশেষরূপে বলিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার নিম্নলিখিত বাণী উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:—

"আমাদিগকে স্বর্গের ভাষায়, আধ্যাত্মিক ভাষায় কথা বলিতে হইবে। আত্মার একটি বিশিষ্ট ভাষা আছে, তাহা হৃদয়ের ভাষা। আমাদের সাধারণ ভাষা যেমন পশুদিগের ভাষা হইতে উন্নত ও বিভিন্ন, আধ্যাত্মিক ভাষাও সেইরূপ আমাদের সাধারণ ভাষা হইতে উন্নত ও বিভিন্ন। পশুগণ অর্থহীন শব্দ ব্যতীত অন্য উপায়ে নিজেদের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না।

"আধ্যাত্মিক ভাষাতেই ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা যায়। প্রার্থনার সময় আমরা যখন সমস্ত বহির্জগৎ হইতে অন্তঃকরণ অপসারিত করিয়া, আত্মস্থ হইয়া ঈশ্বরোপাসনায় নিমগ্ন হই, তখন এইরূপ উপলব্ধি হয় যেন আমরা আমাদের অন্তঃকরণে ঈশ্বরের রব শুনিতেছি। শব্দ উচ্চারণ না করিয়াও আমরা ঈশ্বরের সমীপে আমাদের কথা গোচর করিতেছি, তাঁহার সঙ্গে আমাদের ভাব-বিনিময় করিতেছি, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছি, তাঁহার উত্তর শুনিতেছি। * * * প্রকৃত আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নীত হইলে, আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের রব শুনিতে পারি।" (মিস্ এথেল্ জে রোজেন্‌বার্গ কর্ত্তৃক অনুলিখিত আব্‌দুল্‌বাহার একটি আলাপ হইতে)

বাহাউল্লা' বলিতেছেন, উচ্চতর স্তরের আধ্যাত্মিক সত্যগুলি কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ভাষাতেই ব্যক্ত করা সম্ভব, কথিত বা লিখিত ভাষা এ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। "সপ্ত অধিত্যকা" নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তকে তিনি এই মর্ত্ত্য-জগৎ হইতে স্বর্গীয় আবাসে পথিকের যাত্রা-পথের বর্ণনা দিয়াছেন। এই পথের শেষ-প্রান্ত সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

"রসনা এই সমস্তের বর্ণনা দিতে অক্ষম, বাক্য ইহার অনেক পূর্ব্বেই নীরবিত হয়। লেখনীর সাহায্যে এখানে কিছুই হয় না, মসী কৃষ্ণতা ব্যতীত অন্য কোনোরূপ অঙ্কিত করিতে পারে না। * * * তত্ত্বজ্ঞ যাহারা তাহাদের অবস্থা কেবলমাত্র হৃদয় হইতে হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে পারে। বার্ত্তাবহের মুখে বা পত্রে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব নহে।"

অর্চ্চক-মনোভাব

যে আধ্যাত্মিক অবস্থাতে উন্নীত হইলে ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন সম্ভব হয়, সেই অবস্থাতে আমরা যাহাতে পৌছিতে পারি, আব্দুল্‌বাহা সেই জন্য বলিতেছেন :—

"পৃথিবীর সমস্ত বস্তু হইতে, পৃথিবীর সমস্ত মানবকুল হইতে বিচ্ছিন্ন, যোগবিমুক্ত হইয়া, একমাত্র ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া আমরা সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিব। তাহা উদ্যম ও চেষ্টা-সাপেক্ষ; সেজন্য আমাদিগকে কষ্ট-স্বীকার ও শ্রম করিতে হইবে। পার্থিব পারিপার্শ্বিকের কথা আমরা যত অল্প মনে স্থান দিব, ততই আমরা অধ্যাত্ম জগতের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। উভয়ের মধ্যে কাম্য-নির্ব্বাচন আমাদেরই হস্তে, আমাদের পার্থিব আসক্তি যত বাড়িবে,

অধ্যাত্মতা তত কমিবে, অধ্যাত্মতা যত বাড়িবে, পার্থিব আসক্তি তত কমিবে।

"আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, আমাদের অন্তর-চক্ষু উন্মুক্ত করিতে হইবে, যেন আমরা সর্ব্ব-বস্তুতে পরমাত্মার নিদর্শন দেখিতে পাই। প্রত্যেক বস্তুই আমাদিগকে পরমাত্মার আলোকরশ্মি দেখাইতে পারে।" —(মিস্ এথেল্ জে রোজেন্‌বার্গ কর্ত্তৃক অনুলিখিত আব্‌দুল্‌বাহার একটি আলাপ হইতে)

অপর একস্থলে তিনি বলিতেছেন :—

"আমাদের মন সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও সুন্দর অবস্থাপন্ন হয় তখনই, যখন আমরা প্রার্থনা করিতে থাকি। কারণ, প্রার্থনা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ-স্থাপন, তাঁহার সঙ্গে যোগ-যুক্ত হওয়া। * * * অনাসক্তভাবে সমগ্র মানসিক বৃত্তি আকৃষ্ট করিয়া, এক কেন্দ্রীভূত করিয়া, আধ্যাত্মিক উল্লাসে একান্ত আগ্রহসহকারে প্রার্থনাকারী প্রার্থনা নিবেদন করিবে। * * * নিতান্ত যন্ত্র-চালিতভাবে প্রার্থনার বাণী উচ্চারণ করিয়া গেলে কোনো ফল হয় না; যে প্রার্থনা হৃদয়-স্পর্শ করে না, কেবলমাত্র কথা বলাতেই পর্য্যবসিত, তাহার কোনো মূল্য নাই।

"মধ্য-রাত্রে ঈশ্বরের উপাসনা করা কি মধুর, কি পরিতৃপ্তিকর, কি আধ্যাত্মিক পুষ্টিকর! যখন সমস্ত চক্ষু নিদ্রায় মুদ্রিত, উপাসকের চক্ষু তখন বিনিদ্র, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। যখন সমস্ত কর্ণ নিদ্রায় অভিভূত, উপাসকের কর্ণদ্বয় ঈশ্বরের বিরল সঙ্গীত-তানে একতন্ত্রীকৃত। যখন সকলে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন আদর্শ-প্রেমাস্পদের উপাসক তখন জাগিয়া রহিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর, মধুর, প্রশান্তি, স্থির, নিঃস্পন্দ— তাহার মাঝখানে উপাসক, প্রকৃতির সঙ্গে ও প্রকৃতির বিধাতা-পুরুষ;

ঈশ্বরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে রত।"—(মীর্জ্জা আহ্‌মদ সোহ্‌রাবের রোজ্‌-নাম্‌চা ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৪)

মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজনীয়তা

আব্‌দুল্‌বাহা বলিতেছেন :—

"মানব ও তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা, এতদুভয়ের মধ্যে একজন মধ্যবর্ত্তী মহাপুরুষের আবশ্যকতা রহিয়াছে, যিনি ঈশ্বরের সমগ্র দীপ্তি স্বয়ং গ্রহণ করিয়া মানব-সমাজে তাহা বিতরণ করিবেন; পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল যেমন সূর্য্যরশ্মির তেজ, উষ্ণতা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দেয়, ইহাও সেইরূপ।"—(স্বর্গীয় দর্শন, পৃঃ ৮)

"প্রার্থনা করিবার সময় আমাদের এমন একটি বস্তুর প্রয়োজন হয়, যাহার উপরে আমাদের মানসিক সমস্ত শক্তি এক কেন্দ্রীভূত করিয়া নিবদ্ধ করিতে পারি। যখন আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রের দিকে আমাদের মন পরিচালিত করিতে হয়। যদি কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরের অবতারের মধ্য-বর্ত্তীতা ব্যতিরেকে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাকে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি ধারণা করিতে হইবে; এইরূপ ধারণা তাহার আপন মনের সৃষ্টি বই আর কিছুই হইতে পারে না। যখন সসীম নিঃসীমকে বেষ্টন করিতে পারে না, তখন ঈশ্বর এই ধরণে এক সসীম ধারণার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইতে পারে না। মানব-মন যাহা ধারণা করিতে পারে, সে তাহা জানিতে বুঝিতে পারে। যাহা সে জানিতে বুঝিতে পারে, তাহা ঈশ্বর হইতে পারে না। মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে, তাহা স্বকপোলকল্পিত, আপন মনেরই

প্রতিচ্ছবি। বিরাট-পুরুষ ঈশ্বরের সঙ্গে এই ধারণার কোনো সম্পর্কই নাই।

"যদি কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরকে জানিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সে, যীশুখৃষ্ট বা বাহাউল্লা'রূপ পরিপূর্ণ মুকুরে তাঁহাকে দেখুক। সে এই সমস্ত পরিপূর্ণ মুকুরেই ঈশিত্বের সূর্য্যকে জ্যোতিষ্মান্ দেখিতে পাইবে।

"যেমন আমরা প্রাকৃতিক সূর্য্যকে জানিতে পারি, তাহার দীপ্তি, তাহার আলোক, তাহার উত্তাপের দ্বারা, তেমনই আধ্যাত্মিক সূর্য্য ঈশ্বরকে আমরা জানিতে পারি, যখন তিনি তাঁহার পূর্ণ গুণাবলীর সহিত, তাঁহার নামের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের সহিত, তাঁহার স্বর্গীয় আলোকের সমগ্র দীপ্তির সহিত তাঁহার প্রকাশ মন্দিরে আত্মপ্রকাশ করেন।"—(আক্কাতে, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে, মিষ্টার পার্চি উড্‌ককের সহিত আব্‌দুল্‌বাহার আলাপ হইতে)

অপর একস্থলে তিনি বলিয়াছেন:—

"ঈশ্বরের অবতার মধ্যবর্ত্তী না হইলে, কেহই সোজাসুজি ঈশ্বরের করুণা লাভ করিতে পারে না। এই সাধারণ কথাটি তোমরা বিস্মৃত হইও না যে শিক্ষক ব্যতীত বালক শিক্ষালাভ করিতে পারে না ও শিক্ষালাভ ঈশ্বরের দয়ারই একটি বিশিষ্টরূপ মাত্র। মেঘ হইতে বৃষ্টি না হইলে, আকাশ জলদান না করিলে, ভূমি শস্য-শষ্পে আবৃত হইতে পারে না; এস্থলে ঈশ্বরের করুণা ও ভূমির মধ্যবর্ত্তী ঐ মেঘ। *** আলোকের একটি কেন্দ্র আছে, যদি কেহ কেন্দ্র ব্যতীত অন্য স্থান হইতে আলোক প্রয়াসী হয়, সে কখনও আলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না। *** তোমরা যীশুখৃষ্টের যুগের কথা স্মরণ ক'র; তখন অনেকে মনে করিয়াছিল, মসীহের প্রসাদ ব্যতীত সত্য-বস্তু লাভ করা

সম্ভব; কিন্তু তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা সর্ব্বশেষে সত্য-বস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল।"—(আব্‌দুল্‌বাহার ফলক-লিপি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৯১, ৫৯২)

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অবতারের দিকে না ফিরিয়া, তাঁহার প্রতি অনুরক্ত না হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতে চেষ্টা করে, সে ঠিক ঐ ব্যক্তি সদৃশ, যে পাতালঘরের অন্ধকারে থাকিয়া স্বীয় কল্পনার মধ্যস্থতায় সূর্য্যোত্তাপে বিলাস-উৎসবের প্রত্যাশী হয়।

"নমাজ" অর্থাৎ প্রার্থনা
অবশ্য-কর্ত্তব্য

বাহাইএর পক্ষে প্রার্থনা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত করা হইয়াছে। বাহাউল্লা' "কিতাবুল-আক্‌দাস্"এ বলিয়াছেন:—

প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা বাক্য গান বা আবৃত্তি করিবে। যে ব্যক্তি এই কাজ করিতে অবহেলা করে, বুঝিতে হইবে, সে ঈশ্বরের নিকটে যে সত্য-প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহা ভঙ্গ করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি অদ্য ইহা হইতে মুখ ফিরাইয়াছে, সে তাহাদের মধ্যে গণ্য—যাহারা ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থান করিতেছে। হে "বাহা"র জনমণ্ডলী, তোমরা ঈশ্বরকে ভয় ক'র। পুণ্য বাণী বহুবার পাঠ করিয়া বা তদনুসারে দিবারাত্রি কর্ম্ম করিয়া অহঙ্কারী বা উদ্ধতস্বভাব হইও না। অবহেলা সহকারে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সমস্ত পুণ্যবাণীগুলি পাঠ করা অপেক্ষা গভীর আনন্দসহকারে তাঁহার একটি মাত্র শ্লোক উচ্চারণ করা শ্রেয়ঃ। পুণ্য-ফলকলিপিগুলি এত অধিকবার আবৃত্তি বা গান করিবে না, যাহাতে তোমার ক্লান্তি বা অবসাদ ঘটিতে পারে।

ক্লান্তি বা অবসাদের সৃষ্টি করে এইরূপ প্রার্থনা-ভারে আত্মাকে ভারাক্রান্ত করিও না, বরঞ্চ প্রার্থনা-সাহায্যে আত্মাকে পুনঃসঞ্জীবিত ক'র, যেন তাহা 'প্রকাশের' পাখা সহকারে 'প্রমাণের' উদয়াচলের দিকে উড্ডয়মান হইতে পারে। প্রার্থনা-বলে তোমরা ঈশ্বরের নৈকট্য প্রাপ্ত হইবে,—যদি তোমরা 'যাহারা বুঝিতে পারে' তাহাদের মধ্যে হও।"

আবদুল্‌বাহা তাঁহার এক পত্রে এক ব্যক্তিকে বলিতেছেন :—

"হে আধ্যাত্মিক বন্ধু, তুমি জানিয়া রাখ যে প্রার্থনা বা 'নমাজ' অবশ্য-কর্ত্তব্য; কোনো কারণেই সাধারণ অবস্থায় প্রার্থনা বাদ দেওয়া যাইতে পারে না, কেননা প্রার্থনা বাদ দেওয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ। অবশ্য যদি কেহ বিকৃত-মস্তিষ্ক হয় বা যদি অনতিক্রম্য কোনো বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা।"—(আবদুল্‌বাহার ফলকলিপি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৮৩)

এক ব্যক্তি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কেন প্রার্থনা করিব? প্রার্থনার আবশ্যকতা কি? ঈশ্বর সর্ব্ববিষয়েই সুব্যবস্থা করিয়াছেন, সকল ব্যাপারই সুচারুরূপে সম্পাদন করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার নিকটে প্রার্থনাবনত হইয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করার ও নিজের অভাব-অভিযোগের কথা তাঁহাকে নিবেদন করিবার সার্থকতা কি? তাঁহার বিধান সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, ইহা মানিয়া লইলে প্রার্থনা নিরর্থক হইয়া পড়ে না কি?"

আবদুল্‌বাহা তাহাকে উত্তর দিয়াছিলেন :—

"জানিয়া রাখ, দুর্ব্বলের পক্ষে শক্তিশালীর নিকটে সানুনয় প্রার্থনা করা স্বাভাবিক এবং দান-প্রার্থীর পক্ষে ঐশ্বর্য্য ও বিভবশালীর নিকটে যাচক হওয়া বাঞ্ছনীয়। যখন কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট মিনতি নিবেদন করে, তাঁহার অপার করুণার দিকে চাহিয়া তাঁহার

করুণা-কণা সাগ্রহে যাচ্ঞা করে, তখন এই প্রার্থনা বলে তাহার হৃদয় আলোকিত হয়, তাহার দৃষ্টি জ্যোতিষ্মান্, তীক্ষ্ণ হয়, তাহার আত্মা সঞ্জীবিত হয় এবং তাহার সমস্ত সত্তা উন্নত হয়।

"যখন তুমি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবার সময় আবৃত্তি করিতে থাক, 'তোমার নামই আমার আরোগ্য-নিদান',—লক্ষ্য করিয়া দেখ, তোমার হৃদয় তাহাতে কেমন হর্ষোৎফুল্ল হয়, তোমার আত্মা ঐশ্বরিক প্রেমের আনন্দে কেমন শতধা বিকাশ লাভ করে, তোমার মন কেমন স্বর্গরাজ্যের দিকে আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণী-শক্তির প্রভাবে নিজের ক্ষমতা, উপযুক্ততা বিশেষরূপ বর্দ্ধিত হয়। পাত্রের আয়তন বড় হইলেই জলের পরিমাণ অধিক হয়, পিপাসা বাড়িলেই মেঘের দান মানবের রুচিকর হয়। ইহাই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার ও তাঁহাকে নিজের অভাব-অভিযোগ নিবেদন করিবার সার্থকতা।"—(একজন আমেরিকান বাহাইএর ফলকলিপি হইতে, আলীকুলী খাঁ কর্ত্তৃক অনূদিত, অক্টোবর, ১৯০৮)

প্রার্থনা প্রেমের ভাষা

আর একব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে ঈশ্বর যখন সমস্ত মানবের হৃদয়ের কথাই জানেন, তখন প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে আমাদের হৃদয়ের কথা পুনরায় জানাইবার আবশ্যকতা কি। তাহাকে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন:—

"যদি কোনো ব্যক্তি তাহার কোনো বন্ধুকে বাস্তবিকই ভালবাসে, সে তাহাকে তাহার ভালবাসার কথা বলিতে চাহিবে। যদিও সে ব্যক্তি জানে যে তাহার বন্ধু তাহার ভালবাসার কথা অবগত আছে, তথাপি সে ব্যক্তি তাহার বন্ধুকে জানাইতে চাহিবে। ইহাই স্বাভাবিক।

* * * সেইরূপ যদিও ঈশ্বর সকলের হৃদয়ের কথাই জানেন, তথাপি তাঁহাকে প্রার্থনা নিবেদন করিবার ইচ্ছা মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি; ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হইতেই উহা উদ্ভূত হয়।

"প্রার্থনা বাক্যের সাহায্যেই প্রকাশ করিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই; ভাবে ও আচরণেই তাহার সম্যক্ প্রকাশ। যদি প্রেম ও বাসনা না জন্মিয়া থাকে, তাহা জোর করিয়া সৃষ্টি করা নিরর্থক। প্রেম-বিহীন বাক্যের কোনো অর্থ নাই। যদি কোনো ব্যক্তি অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য মনে করিয়া আপনার সঙ্গে এইভাবে আলাপ করে, যেন সে আপনার সঙ্গে আলাপ করিতে অনিচ্ছুক এবং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তাহার কোনো আগ্রহ, স্পৃহা নাই, তখন আপনি কি তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছুক হইবেন?"—(ফর্টনাইট্‌লি রিভিউ পত্রে প্রকাশিত, মিস্ ই ষ্টিভেন্‌স্ লিখিত প্রবন্ধ হইতে, জুন, ১৯১১)

আর এক উপলক্ষ্যে তিনি আলাপ-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন:—

"সর্বোচ্চস্তরের প্রার্থনা তাহাই, যাহাতে মানুষ কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রেম যাচ্ঞা করিয়া থাকে; ঈশ্বরকে ভয় করে বলিয়া বা নরক যন্ত্রণা সহ্য করিবার ভয়ে বা পুরস্কার বা স্বর্গলাভ করিবার আশায় যে প্রার্থনা করা যায়, তাহা নিম্নস্তরের। * * * যখন কোনো ব্যক্তি কাহারও প্রেমে পতিত হয়, সে তাহার প্রেমাস্পদের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারে না। যখন কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেমে পতিত হয়, তাহাকে ঈশ্বরের নামকীর্ত্তনে বাধা দেওয়া কতই না অসম্ভব। * * * অধ্যাত্মবোধে-সম্বুদ্ধ মানব ঈশ্বরের পুণ্য-নাম-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কিছুতেই প্রকৃত আনন্দ পায় না।"—(মিস্ আল্‌মা রবার্টসন ও অন্যান্য যাত্রিক কর্ত্তৃক অনুলিখিত স্মারকলিপি হইতে, নভেম্বর ও ডিসেম্বর, ১৯০০)

সঙ্ঘবদ্ধ প্রার্থনা

অনেক ব্যক্তি মিলিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকে। এসম্বন্ধে আব্‌দুল্‌বাহা এইরূপ বলিতেছেন:—

"কেহ কেহ বলিতে পারে: 'যখনই আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখনই ত আমি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে পারি; আমার ইচ্ছামত যে কোনো সময়েই আমি তাঁহার নিকটে আমার নিবেদন করিতে পারি; আমি যেখানেই থাকি না কেন, নগরে বা বনে, তাহাতেও প্রার্থনা সম্বন্ধে কোনো তারতম্য হইতে পারে না। কোনো বিশেষ দিনে, কোনো বিশেষ সময়ে, যেস্থানে অন্য সকলে একত্রিত হইয়াছে, সেই সময়ে সেইস্থানে যাইয়া সকলের প্রার্থনার সঙ্গে মিলাইয়া আমার প্রার্থনা করিবার সার্থকতা কি? আমি হয়ত সেই বিশেষ সময়ে প্রার্থনা-মনোভাব-সম্পন্ন নাও থাকিতে পারি।"

"এরূপ মনে করা অবাস্তব কল্পনামাত্র; কারণ, যেখানে অনেক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া থাকে, সেখানে সকলের সমবেত শক্তি প্রত্যেকের বিভক্ত শক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক ও অনেক বেশী কার্য্যকরী। সঙ্ঘবদ্ধ সেনা-বাহিনীর শক্তি অপেক্ষা প্রত্যেকে পৃথকভাবে যুধ্যমান্ সৈনিকের শক্তি কত অল্প! এই আধ্যাত্মিক যুদ্ধে যদি সমস্ত সৈনিক-গণ সমবেত হইয়া অভিযান করে, তাহা হইলে তাহাদের সম্মিলিত আধ্যাত্মিক ভাবগুলি তাহাদের পরস্পরকে সাহায্য করিবে, সকলের প্রার্থনাই গৃহীত হইবে।"—(মিস্ এথেল্ জে রোজেন্‌বার্গ কর্ত্তৃক অনুলিখিত)

মন্বন্তর-সঙ্কট ও নানাবিধ বিপত্তি হইতে পরিত্রাণ

অবতারগণের বাণী অনুসারে, রোগ, ভোগ ও অন্যান্য সর্ব্ব-প্রকারের বিপাকের কারণ, জগদীশ্বরের স্বর্গীয় আদেশগুলি অমান্য করা। আব্‌দুল্‌বাহা বলেন, ঐ একই কারণে, যদিও পরোক্ষভাবে, জলপ্লাবন, ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প প্রভৃতিও ঘটিয়া থাকে। এক স্থানে তিনি বলিতেছেন :—

"এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইবার কারণ এই যে বিশ্বের অংশ সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, প্রত্যেক ছোট অংশের সহিত প্রত্যেক বড় অংশের সংযোগ রহিয়াছে, এক অংশে কিছু ঘটিলে তাহার ফল অপর সকল অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সম্বন্ধ আছে বলিয়াই মানুষের কার্য্যের ফল পরস্পর ফলিয়া থাকে। যখনই কোনো স্থলে কোনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হয়, তখনই পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, কোনো দুই জাতির মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে। এই মতানৈক্য শুধু মতেরই প্রভেদ, কোনো ভৌতিক বস্তু নহে, অর্থাৎ ইহা এমন কোনো বস্তু নহে যাহাকে আমরা স্পর্শ করিতে পারি, কি দেখিতে পাই। তত্রাচ, এই মতানৈক্যের ফল ভৌতিক জগতে ফলিয়া থাকে, অর্থাৎ ইহার ফলে মানুষে মানুষে লড়াই করে এবং সহস্র সহস্র লোকের দেহ খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হইয়া যায়। সেইরূপ, মানুষ যখন ঈশ্বরের নিকটে তাহার কৃত-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, অর্থাৎ যখনই সে 'পরম অঙ্গীকার ভঙ্গ করে', তখনই তাহার ফলস্বরূপ বস্তু-জগতে নানা দুর্দ্দৈব, অশান্তির আবির্ভাব হয়।"—(আক্কাতে গৃহীত দৈনিক পাঠ, পৃঃ ২৫)

কিন্তু, আদেশ অমান্য অর্থাৎ পাপ করিবার ফলে যে শাস্তি-বিধান করা হয়, তাহা শত্রুতামূলক কি নির্দ্দয়তা প্রযুক্ত নহে, তাহা সংশোধন-কল্পেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে; শিক্ষাদানই তাহার উদ্দেশ্য। শাস্তির মধ্য দিয়া ঈশ্বর বজ্রনির্ঘোষে মানবকে বলিয়া দেন যে, সে সত্য-পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। যখন দুঃখ-ক্লেশ ভীষণরূপ ধারণ করে, বুঝিতে হইবে, পাপের ভোগ আরও অধিক ভয়ঙ্কর, কেননা "মৃত্যুই পাপের শাস্তি"।

অবাধ্যতার জন্য যেমন এই সমস্ত বিপদ ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ বাধ্যতার দ্বারা এই সমস্ত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। মুক্তিলাভ করিবার অন্য উপায় নাই। ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত না হইলে, বিপদ অনিবার্য্য এবং ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হইলে, শুভ সুনিশ্চিত। ইহাতে কোনো সন্দেহ, সংশয়ের কারণ থাকিতে পারে না।

যেহেতু সমগ্র মানবজাতি একটি জীব-দেহ-সদৃশ ও সমগ্র মানবকুল সেই বিরাট দেহের বিভিন্ন অংশের মত, তাহাই কোনো এক ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য শুধু তাহার নিজের আচরণের উপর নির্ভর করে না, তাহার প্রতিবেশীর আচরণের উপরেও তাহা নিয়ত নির্ভরশীল। যদি কোনো এক ব্যক্তি অন্যায় করে, তাহার ফল অপর সকলকে ন্যূনাধিক ভোগ করিতে হয়। আবার, একের সুকৃতির ফলে অপর সকলেই উপকৃত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার প্রতিবেশীর দুঃখের বোঝা কিছু না কিছু বহন করিতে হয়; যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বোঝা বহন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মানব। সাধু-সন্ত-মহাত্মা পুরুষগণ ঘোরতর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন; অবতারগণ যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন। বাহাউল্লা' ঈকান গ্রন্থে বলিতেছেন:—

"আপনি নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন, প্রত্যেক অবতার ও তাঁহাদের

সঙ্গীগণ কি দুঃসহ দারিদ্র্য, রোগ-শোক, অপমান সহ্য করিয়াছেন, কি প্রকারে তাঁহাদের অনুগামীগণের মস্তক নগরে নগরে উপঢৌকন-স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল।”

ইহার কারণ, সিদ্ধপুরুষ ও অবতারগণ শাস্তির যোগ্য, এরূপ নহে। ইহার কারণ এই যে তাঁহারা অপরের জন্য নিজে শাস্তি ভোগ করেন, এই স্বেচ্ছাবৃত শাস্তি-গ্রহণেই তাঁহাদের অপার আনন্দ। তাঁহারা নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য নহে, পৃথিবীর স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য ব্যগ্র, চিন্তিত। প্রকৃত মানব-প্রেমিক কখনও নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক প্রভৃতি অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানান না; কিন্তু একান্তভাবে প্রার্থনা করেন, সমগ্র মানবজাতি যেন পাপ ও অজ্ঞানতামূলক সর্ব্ব-প্রকার অমঙ্গলের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। তিনি যদি নিজের স্বাস্থ্য কি অর্থের জন্য প্রার্থনা করেন, তাহা শুধু পরমরাজ্যের সেবা করিবার জন্য। তাঁহাকে শারীরিক স্বাস্থ্য কি পার্থিব ঐশ্বর্য্য দেওয়া না হইলেও তিনি “উজ্জ্বল সম্মতি” সহকারে তাঁহার ভাগ্য অঙ্গীকার করিয়া ল'ন; কারণ, তিনি সম্যকরূপে জানেন যে ঈশ্বরের পথে তাঁহার উপর যাহা ঘটে, তাহা সমস্তই মঙ্গলের জন্য।

আব্দুলবাহা বলিতেছেন:—

“আমাদের দুঃখ-ক্লেশ হঠাৎ বিনা কারণে আসে না, আমাদের পূর্ণতালাভের জন্যই ঈশ্বর কৃপাপরবশ হইয়া তাহা প্রেরণ করিয়া থাকেন। দুঃখ-ক্লেশ উপস্থিত হইলেই, মানব তাহার পরমপিতাকে স্মরণ করিয়া থাকে—যিনি স্বর্গে অবস্থিতি করেন এবং তাহাকে সমুদয় হীনতা হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। মানুষ যতই অধিক দুর্দ্দশা-

গ্রস্ত হইবে, তাহার আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য ততই অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করিবে।" (প্যারিসে কথাবার্ত্তা, পৃঃ ৪৫)

নির্দ্দোষী ব্যক্তি দোষীদের জন্য কষ্টভোগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, আপাতদৃষ্টে এই নিয়ম অন্যায় মনে হইতে পারে। কিন্তু আব্দুল্‌বাহা আমাদিগকে নিশ্চিত করিয়া বলিতেছেন যে ঈশ্বরের বিধান পক্ষপাতশূন্য, আপাততঃ যাহাই হউক না কেন, পরিশেষে পরিপূর্ণতম ন্যায়পরতা অক্ষুণ্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তিনি বলেন :—

"শিশু, বালক, দুর্ব্বল, নিপীড়িত, অত্যাচারিত ব্যক্তিগণ অপর এক জগতে সান্ত্বনা ও তাহাদের ন্যায্য অংশ পাইবে। অত্যাচার, নির্য্যাতন, পীড়ন, দুঃখ, অসম্মান, ইহাই তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের করুণার সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট পরিচয়, ঈশ্বরের দয়ার অভিজ্ঞান। বাস্তবিক ঈশ্বরের এই করুণা এ নশ্বর জগতের সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে কতই না শ্রেষ্ঠ।"—(আব্দুলবাহার ফলকলিপি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭)

প্রার্থনা ও প্রাকৃতিক বিধান

অনেকে প্রার্থনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারে না, এই কারণে, যে তাহারা মনে করে, যে প্রার্থনার উত্তরে ঈশ্বর যখন প্রার্থীর অভিলাষ পূর্ণ করেন, তখন প্রাকৃতিক নিয়মগুলির অলঙ্ঘনীয়তা নষ্ট হয়। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি যদি অলঙ্ঘনীয় হয়, তাহা হইলে যথেচ্ছরূপে ঈশ্বর সেগুলি লঙ্ঘন করিতে পারেন কিরূপে এবং যদি তাহা পারেন, তাহা হইলে প্রাকৃতিক বিধানের চিরাচরিত সত্য মিথ্যায় পরিণত হয়।

কিন্তু যাহারা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে চিন্তা করে, তাহাদিগকে নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে তাহাদের ভ্রান্তি বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে :—

যদি কয়েকটি লোহার টুক্‌রার উপরে একখণ্ড চুম্বক ধরা যায়, তাহা হইলে লোহার টুক্‌রাগুলি চুম্বকের দিকে ছুটিয়া যাইবে। কিন্তু, লৌহ-খণ্ডের এই উর্দ্ধগতি মাধ্যাকর্ষণ-বিধির সঙ্গে কুত্রাপি বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহে। মাধ্যাকর্ষণের বিধি যেমন পূর্ব্বে ছিল, তেমনই রহিয়া গেল, কেবলমাত্র এমন একটি শক্তি সঞ্চারিত হইল, যাহার প্রভাবে লৌহখণ্ডগুলি নিম্নগামী না হইয়া উর্দ্ধগামী হইল, এইমাত্র। চুম্বকের প্রভাবে লৌহ-খণ্ডের উর্দ্ধগতি, ইহাও মাধ্যাকর্ষণ-বিধির মতই সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম। সেইরূপ, বাহাই মতানুসারে, প্রার্থনা এমন একটি শক্তি সঞ্চারিত করে, যাহার প্রভাবে প্রাকৃতিক বিধান অপেক্ষা উচ্চতর স্তরের অধিকতর ক্ষমতাপন্ন নিয়ম কার্য্যক্ষেত্রে পরিচালিত হইয়া পড়ে। এই উচ্চতর স্তরের নিয়ম বা বিধান সম্বন্ধে অতি অল্পই অদ্যাপি জানিতে পারা গিয়াছে; কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক শক্তি যথেচ্ছভাবে ক্রিয়া করে, তাহার নিয়মানুবর্ত্তিতা নাই, এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত, নিয়মবদ্ধরূপে আলোচনা করা হইয়াছে, আধ্যাত্মিক ঘটনাগুলি তেমন বিস্তৃতভাবে পর্য্যালোচিত হয় নাই; আধ্যাত্মিক নিয়ম-বিধান সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাহেতুই মনে হয় আধ্যাত্মিক জগতে কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ম নাই।

অনেকের নিকটে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার বিষয় মনে হয় এই যে সামান্য কয়েকটি প্রার্থনা বাক্যের প্রভাব, যত অধিক বলিয়া দাবী করা হয়, এত অসীম কিরূপে হইতে পারে। কিন্তু স্মরণ করিতে

হইবে যে একটি বৃহৎ জলাধারের জল-প্রবেশ-নির্গম-পথে সামান্য একটু শক্তি প্রযুক্ত হইলে কি অদ্ভুতরূপে জলরাশির প্রবল শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়, আর বিরাট সমুদ্রগামী জাহাজের চালনা-যন্ত্রে ঐরূপ সামান্য শক্তি প্রযুক্ত হইলে কি বিরাট ফলই ফলিয়া থাকে। বাহাই মতানুসারে, ঈশ্বরের অব্যয় শক্তিবলেই প্রার্থীর প্রার্থনা সফলতা লাভ করে। প্রার্থনাকারীর কর্ত্তব্য এই যে, সে ঈশ্বরের করুণা-নির্ঝর প্রবহমান করিবার নিমিত্ত তাহার আপন ক্ষুদ্রশক্তি নিয়োজিত করিবে। নিশ্চয়ই ঈশ্বরের করুণা সর্ব্বক্ষণ ঐ সকল লোকের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, যাহারা উহা কি প্রকারে লাভ করিতে হয় তাহার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাহাই প্রার্থনা

বাহাইগণের বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, নানা বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করিবার জন্য বাহাউল্লা' এবং আবদুল্‌বাহা অসংখ্য প্রার্থনা প্রকটিত করিয়াছেন। এই সমস্ত পুণ্যবাক্যের গুরুত্ব এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক নিগূঢ়তা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির চিত্তাকর্ষক হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু দৈনন্দিন জীবন-যাপন কালে প্রার্থনাগুলিকে প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের মধ্যে না করিয়া লইলে, তাহাদের তাৎপর্য্য-গ্রহণ সম্ভব হইবে না, প্রার্থনাগুলি কি অশেষ-হিত-সাধন-শক্তিসম্পন্ন, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

এই প্রার্থনাবলীর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল; স্থানাভাবে দীর্ঘ প্রার্থনাগুলি উদ্ধৃত করা গেল না; নাতিদীর্ঘ কয়েকটি প্রার্থনা উদ্ধৃত করিয়াই এই অধ্যায় শেষ করা হইল। আশা করি, পাঠকবর্গ বাকী প্রার্থনাগুলি মূল গ্রন্থ হইতে পাঠ করিবেন।

"হে পরমেশ্বর, তোমার অপার সৌন্দর্য্যই আমার খাদ্যস্বরূপ হউক; তোমার সর্ব্বব্যাপিত্বই আমার পানীয়স্বরূপ হউক। তোমার অভিপ্রায়েই আমার অখণ্ড বিশ্বাস অবিচলিত থাকুক; তোমার আদেশেই আমার জীবনের সমস্ত কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হউক। প্রভু, তুমি আমার সেবা, আমার অর্চ্চনা গ্রহণ ক'র; আমার কর্ম্মে, আমার চিন্তায় তোমার জয়বার্ত্তাঘোষণা, তোমার প্রশংসা মুখরিত হইয়া উঠুক। তুমিই আমাকে সর্ব্বকর্ম্মে প্রযুক্ত ক'র, আমাকে প্রেরণা দাও, তোমার পবিত্র নিকেতনে আমার আবাস নির্দ্দিষ্ট ক'র। তুমি চিরপ্রেমময়, সর্ব্বব্যাপী, তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ নিধি।"—(বাহাউল্লা')

"প্রভু, স্বামিন্, তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ, তোমার উদ্দেশ্য, আমি তোমাকে জানিবার চেষ্টা করিব, তোমাকে অর্চ্চনা করিব; আমার অস্তিত্বই তোমার করুণার সাক্ষী। আমি আমার দৈন্য স্বীকার করিতেছি; স্বীকার করিতেছি, আমি দীন-হীন, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, স্বীকার করিতেছি, আমি দরিদ্র, তুমি অশেষ ঐশ্বর্য্যশালী। তুমি ছাড়া অন্য কোনো ঈশ্বর নাই, তুমিই সকলের রক্ষাকর্ত্তা, তুমি স্বয়ংসিদ্ধঃ।"
—(বাহাউল্লা')

"হে পরমেশ্বর, তোমার সমস্ত সেবকগণের হৃদয় এক, অভিন্ন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ক'র, তাহাদের নিকটে তোমার মহান্ উদ্দেশ্য প্রকটিত ক'র; তাহারা যেন তোমার আদেশানুসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম হয়, তাহারা যেন তোমার নিদিষ্ট বিধিনিষেধ-অনুসারে জীবন-পথে প্রযুক্ত হয়; প্রভু, তাহাদের এই মহৎ প্রচেষ্টায় তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত ক'র, তাহাদিগকে তোমার সেবা করিবার অপ্রমেয় শক্তির অধিকারী ক'র। তাহাদিগকে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে দিও না, জ্ঞানের আলোকে তাহাদের পথ-রেখা উদ্ভাসিত ক'র, তাহাদের প্রতি-

পদক্ষেপে তাহাদিগকে সাহায্য ক'র, তোমার প্রেমে তাহাদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত ক'র। তুমিই তাহাদের প্রভু, তুমিই তাহাদের পরম-সহায়ক।"—(বাহাউল্লা')

"হে পরমদয়ালু পরমপ্রভু, তুমি সমগ্র মানবজাতিকে একই উপাদান হইতে সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি নির্দ্দেশ করিয়াছ, তাহারা সকলেই একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে। তোমার পুণ্য সমীপে সকলেই তোমার সেবক, তোমার 'অঙ্গীকারের' ছায়াতলে সকলেই তোমার আশ্রিত; তোমার অনুকম্পা-ভোজে তাহারা সকলেই সম্মিলিত, তোমার অনুগ্রহের আলোকে সকলেই আলোকিত।

"হে ঈশ্বর, তুমি সকলের প্রতি দয়ালু, তুমি সকলেরই প্রতিপালক, তুমি সকলেরই আশ্রয়দাতা, তুমিই সকলকে জীবন দান করিয়া থাক। তুমি সকল প্রাণীকে বিশেষ শক্তি ও ক্ষমতায় বিভূষিত করিয়াছ এবং সকলেই তোমার করুণাসাগরে নিমজ্জিত রহিয়াছে।

"হে পরমকরুণানিধান পরমেশ্বর, তুমি মানবকুলকে একত্র ক'র, তোমার ধর্ম্মসমূহকে জাতিগণের একতা ও মিলনের উপায়স্বরূপ ক'র, তাহারা যেন পরস্পরকে এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং সমগ্র ভূমণ্ডলকে এক আবাস সদৃশ মনে করে। হে প্রভু, তুমি তাহাদের সকলকে একতাবদ্ধ হইয়া, মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে শক্তি প্রদান ক'র।

"হে ঈশ্বর, তুমি মানবজাতির একত্বের পতাকা উত্তোলন ক'র। হে ঈশ্বর, তুমি সার্ব্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠিত ক'র। হে ঈশ্বর, তোমার ভৃত্যগণের হৃদয় একতায় সংযুক্ত ক'র। হে পরম-কারুণিক পরম-পিতা পরমেশ্বর, তোমার প্রেমের সৌরভে আমাদের হৃদয়ে পুলক সঞ্চারিত ক'র, তোমার পথ-প্রদর্শনের আলোকে আমাদের চক্ষু জ্যোতিষ্মান্ ক'র, তোমার বাক্যের মাধুর্য্যে আমাদের কর্ণ উল্লাসিত

ক'র, তোমার বিধানের সুরক্ষিত দুর্গে আমাদিগকে আশ্রয় দান ক'র। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বনিয়ন্তা, তুমি পরম-ক্ষমা-শীল ও সর্ব্বমানবকুলের ভ্রান্তি-ত্রুটি-মার্জ্জনাকারী।"—(আব্‌দুল্‌বাহা)।

"হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, আমি পাপী, কিন্তু তুমি ক্ষমাশীল, তোমার করুণা অপার। আমার অসম্পূর্ণতা অশেষবিধ, আমি ভ্রান্তি এবং দোষে পরিপূর্ণ, কিন্তু তুমি পরমকারুণিক। আমি মোহান্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছি, কিন্তু তুমিই মার্জ্জনার আলোক।

"হে করুণানিধান পরমেশ্বর, তুমি আমার সমস্ত পাপ, সমস্ত দোষ, সমস্ত অসম্পূর্ণতা মার্জ্জনা ক'র, তোমার দান-গ্রহণের জন্য আমাকে উপযুক্ত, প্রস্তুত করিয়া লও, তুমি আমার জন্য আশ্রয়-স্থানের ব্যবস্থা ক'র, তোমার পরম-সহিষ্ণুতার প্রস্রবণে অভিষিক্ত করিয়া তুমি আমাকে সর্ব্বব্যাধি হইতে নিরাময় ক'র।

"আমাকে শোধন করিয়া লও, আমাকে দোষমুক্ত করিয়া পবিত্র করিয়া লও। পবিত্রতার উচ্ছ্বসিত অমৃতধারার একটি অংশের অধিকারী হইবার উপযুক্ততা তুমি আমাকে দাও; দুঃখ, দারিদ্র্য, মলিনতা যাহাতে বিদূরিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে পবিত্রতা, প্রফুল্লতা, অখণ্ড-বিশ্বাস-পরায়ণতা মানসিক বৃত্তিসমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়, তজ্জন্য তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'র। ত্রাসের নিরাকরণ করিয়া তুমি আমাতে শক্তি, সাহস সঞ্চারিত ক'র। তুমিই পরম-মার্জ্জনা-শীল, পরম-দয়ালু, তুমিই আমার চিরারাধ্য, তুমি পরম-উদার।"—(আব্‌দুল্‌বাহা)

"হে পরমকারুণিক পরমেশ্বর, আমাকে এমন এক হৃদয় দান ক'র, যাহা মুকুরের ন্যায় তোমার প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, আমাকে এমন এক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত ক'র, যাহা তোমার আধ্যাত্মিক প্রসাদবলে এই ভূমণ্ডলকে গোলাপ-উদ্যানে পরিণত করিবে।

তুমিই পরম-কৃপালু, পরম-কারুণিক, তুমিই পরম-দান-শীল।"—(আব্‌দুল্‌বাহা)

যদিও নির্দ্দিষ্ট বাহাই প্রার্থনাবলী একান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহার মধ্যে বাহাই প্রার্থনাকে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই। বাহাউল্লা' বলিয়াছেন, মানবের সমগ্র জীবনই নিরবচ্ছিন্নরূপে প্রার্থনাময় হওয়া উচিত। ঈশ্বরের মহিমা উদ্‌ঘোষিত করিবার মানসে, সর্ব্বমানবকুলের হিতসাধনের নিমিত্ত যাহা কিছু করা যায়, যে বাক্য উচ্চারণ করা যায়, যে কর্ম্মে ব্রতী হওয়া যায়, যাহা কিছু মনন, নিদিধ্যাসন, চিন্তা করা যায়, তাহাই প্রার্থনা বা প্রকৃত অর্চ্চনা। (১)

(১) পাপ-মার্জ্জনার প্রার্থনা সম্বন্ধে এই পুস্তকের একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়

—·—(*)———

স্বাস্থ্য এবং রোগ-মুক্তি

"ঈশ্বরের দিকে মুখ ফিরাইলে দেহ, মন এবং আত্মা ব্যাধিমুক্ত হয়।"—(আব্‌দুল্‌বাহা)

দেহ এবং আত্মা

বাহাই উপদেশ-অনুসারে, মানব-দেহ আত্মার উন্নতি ও উৎকর্ষ-সাধনের নিমিত্ত ক্ষণস্থায়ী উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং সে-উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইলে তাহা পরিত্যক্ত হয়; ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যেমন ডিমের আবরণ ছানাটিকে রক্ষা করে এবং যে মুহূর্ত্তে ছানা বাহির হয় আবরণটি তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত হয়, মানব-দেহের অবস্থাও তদ্রূপ। আব্‌দুল্‌বাহা বলেন, আমাদের এই ভৌতিক দেহ অমরত্ব লাভ করিতে পারে না; কারণ, ইহা অণুপরমাণুর সংমিশ্রণে গঠিত, অন্যান্য যাবতীয় মিশ্রিত বস্তুর ন্যায় ইহাও সময়ে তাহার মৌলিক-পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

দেহ আত্মার ভৃত্য হইয়া থাকিবে, ইহাকে কখনও মুনীব হইতে দেওয়া উচিৎ নহে; দেহকে অনুগত, উপযুক্ত ভৃত্য হইতে হইবে, তাহার প্রতিও কর্ত্তব্য-নিষ্ট ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতে হইবে। তাহার প্রতি যথোপযুক্ত, উচিত আচরণ না করিলে রোগ, শোক, নানা বিপত্তি উপস্থিত হইয়া মুনীব ও ভৃত্য উভয়কে কষ্ট দিয়া থাকে।

সর্ব্ব-প্রকার জীবনের একত্ব বা সংযোগ

হাজার হাজার বিভিন্ন প্রকারে 'গঠিত এবং হাজার হাজার বিভিন্ন স্তরে স্থিত জীবনসমূহ যে একই সূত্রে গ্রথিত, তাহা বাহাউল্লা'র মৌলিক উপদেশাবলীর অন্যতম। আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য, আমাদের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের সহিত, এমন কি, ইতর প্রাণী ও বৃক্ষলতার জীবনের সহিত এতই ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত যে তাহাদের সকলেই প্রত্যেকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, সকলের ভালমন্দ প্রত্যেকের ভালমন্দের উপর নির্ভর করে, প্রত্যেকের শুভাশুভ সকলের শুভাশুভের উপর নির্ভর করে। কিন্তু, সাধারণতঃ আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। এই কারণে, প্রভু বাহাউল্লা' মানব জীবনের যে কোনো দিক লক্ষ্য করিয়া আদেশবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি মানবের শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়। কিন্তু, তাঁহার কোনো কোনো উপদেশ-বাক্যে শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে। এখন আমরা সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

সহজ, সরল জীবন-যাপন

আব্‌দুল্‌বাহা বলিতেছেন :—

"বর্ত্তমান যুগের জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি কি ভীষণ জটিল! অথচ আমরা প্রত্যহই ইহাকে জটিলতর করিয়া তুলিতেছি। মানবজাতির অভাব যেন শেষ হইতে চাহে না, বরঞ্চ উত্তরোত্তর উহা বৃদ্ধি-লাভ করিতেছে। মানব যতই সঞ্চয় করে, ততই যেন সে আরও যাচ্ঞা করে; মুক্তি লাভ করিবার একটি মাত্র উপায় আছে, তাহা চিত্ত-

বিভ্রান্তকারী সমস্ত জঞ্জালের প্রতি গভীর অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া তাহার দিকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখা। * * * সন্তুষ্ট ব্যক্তির হৃদয় শান্তি-পূর্ণ, কিছুতেই তাহার চাঞ্চল্য ঘটে না: সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, সর্ব্ব-প্রকার-বাহুল্য-বর্জ্জিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াই তাহার কি বিপুল শান্তি।" (মীর্জ্জা আহ্‌মদ্ সোহ্‌রাবের রোজ্-নামচা, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ১৯১৩, আগষ্ট, ১৯১৪)

জৈব খাদ্য বাহাইএর পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ নহে, সে মাংস ভোজন করিতে পারে; কিন্তু বলা হইয়াছে যে প্রকৃষ্টতর জীবন-যাত্রার উপায় নিরামিষ-ভোজন; আমিষ খাদ্য অপেক্ষা নিরামিষ খাদ্য অনেক প্রশস্ত।

আব্‌দুল্‌বাহা মাংসভোজন একেবারে নিষেধ করেন নাই; তিনি বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান জগতে বাস করিতে হইলে কোনো কোনো উপলক্ষ্যে মাংসভোজন প্রয়োজনীয়; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন:—

"ভবিষ্যকালের খাদ্য হইবে মাত্র ফল এবং শস্য। আমিষাহার একেবারে উঠিয়া যাইবে। খাদ্য-বিজ্ঞান অদ্যাপি শৈশব অতিক্রান্ত হয় নাই, কিন্তু ইহার মধ্যেই যাহা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ভূমি হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই আমাদের আদর্শ খাদ্য।"—(আক্কার আলোকে দশদিন, জুলীয়া এম্ গ্রাণ্ডি প্রণীত)

মদ্য এবং অন্যান্য নিদ্রাকর্ষক বস্তু

বাহাউল্লা' মদ্য-পান বা অন্যান্য মাদক দ্রব্য-ব্যবহার একান্তভাবে নিষেধ করিয়াছেন। আব্‌দুল্‌বাহা বলিতেছেন:—

"হে ঈশ্বরের বন্ধুগণ, তোমরা স্বকীয় অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে

পার, তাম্রকূট, মদ্য, অহিফেন প্রভৃতি সেবন হইতে বিরত হইলে কি অপূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করা যায়, কি অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত হয়, মস্তিষ্কের অনুধাবনীশক্তি কিরূপ বর্দ্ধিত হয়, বোধশক্তি কিরূপ সঞ্জীবিত হয়, শারীরিক শক্তি কিরূপ বৃদ্ধি-লাভ করে।"—(আব্‌দুল্‌বাহার ফলক-লিপি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮১-৫৮৫)

আমোদ-প্রমোদ

বাহাই উপদেশাবলীর ভিত্তীভূত নীতি সংযত, পরিমিতভাবে আনন্দসম্ভোগ। পার্থিব এবং অপার্থিব, সর্ব্বপ্রকার আনন্দই ভোগ করিতে হইবে, জীবনের কল্যাণকর, সুন্দর বস্তুগুলি হইতে বঞ্চিত থাকা উচিত নহে। বাহাউল্লা' বলিতেছেন :—

"তোমাদিগের জন্য যাহা কিছু সৃষ্টি করা হইয়াছে, তোমরা তাহা ভোগ করিবে, বঞ্চিত থাকিবে না।" পুনরায় অপর একস্থলে বলিতেছেন :— "তোমাদের বদন-মণ্ডলে আনন্দবার্ত্তা ও পরমাহ্লাদ পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশিত হইবে, ইহা অবশ্য-কর্ত্তব্য রূপে তোমাদের উপর অবধারিত করা হইয়াছে।"

আব্‌দুল্‌বাহা বলিতেছেন :—

"পৃথিবীতে যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সমস্তই ঈশ্বরের সর্ব্ব-প্রধান-সৃষ্টি মানবের জন্য। মানবের একান্ত কর্ত্তব্য—ঈশ্বরের এই সমস্ত দানের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া। এই জড়-জগতের সমস্ত বস্তুই আমাদের জন্য কৃত হইয়াছে, আমরা যেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া আমাদের জীবনকে ঈশ্বরের দান বলিয়া উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করি। যদি আমরা জীবনে বিরাগী হইয়া যাই, তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরের নিকটে অকৃতজ্ঞ

হইয়া পড়িতেছি, কেননা আমাদের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন ঈশ্বরের অপার করুণারই প্রত্যক্ষ নিদর্শন। সুতরাং, পরম সন্তোষ-সহকারে জগতের সকল বস্তুর গুণগ্রাহী হইয়া ঈশ্বরের প্রশংসাকীর্ত্তনে আমাদের জীবন-যাপন করা উচিত।"—(স্বর্গীয় দর্শন, পৃঃ ১০৪)

কোনো এক উপলক্ষ্যে আব্দুল্‌বাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে বাহাই ধর্ম্মে জুয়া-খেলা, ভাগ্য-নির্ণয়-মূলক ক্রীড়া ("লটারী") প্রভৃতি সম্বন্ধে যে নিষেধ-বাক্য আছে, তাহা সমস্ত প্রকার ক্রীড়ার প্রতিই প্রযোজ্য কি না। তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন:—

"না, তাহা নহে; অনেক ক্রীড়া নির্দ্দোষ এবং নির্দ্দোষ আনন্দ-সন্তোগের জন্যই যদি সেই সমস্ত ক্রীড়ায় যোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে কোনো দোষ থাকিতে পারে না। কিন্তু সাবধান হইতে হইবে, নির্দ্দোষ আনন্দ-সন্তোগ বৃথা কালহরণে পর্য্যবসিত না হয়। বৃথা কাল-ক্ষেপ ঈশ্বরের ধর্ম্মে বৈধ নহে; ব্যায়াম-মূলক যে সমস্ত ক্রীড়া শারীরিক শক্তির উৎকর্ষ সাধিত করিতে পারে, তাহাই একমাত্র বৈধ।"—(স্বর্গের আভাস, পৃঃ ৯)

শুচিতা

বাহাউল্লা' আক্‌দাস্ গ্রন্থে বলিতেছেন:—

"সমগ্র মানবজাতির মধ্যে তোমরা শুচিতার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ হইয়া বিচরণ করিবে। * * * সর্ব্ব-অবস্থায় তোমরা শুচি, শুভ্র ব্যবহারে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। * * * তোমাদের পরিচ্ছদে বিন্দুমাত্র অশুচিতা প্রকাশ পাইতে দিবে না। * * * তোমরা নির্ম্মল জলে অবগাহন করিবে। একবার যে জল ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার পুনঃ-

ব্যবহার বৈধ নহে। * * * নিশ্চয়ই আমরা তোমাদিগকে ধরাপৃষ্ঠে স্বর্গের প্রকাশরূপে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছি, যেন তোমাদের হইতে এমন (সৌরভ) প্রবাহিত হয় যাহাতে অনুগৃহীতদের হৃদয়ান্তর আনন্দোৎসব করিবে।"

মীর্জ্জা আবুল্‌ফজল্‌ তাঁহার গ্রন্থ "বাহাই প্রমাণ"এ (পৃঃ ৮৯) বলিয়াছেন যে প্রাচ্যদেশে এই সমস্ত অনুশাসন-বাক্যাবলীর অপ্রমেয় মূল্য আছে; কারণ, প্রাচ্য জগতের অনেক স্থানে দূষিত, মলিন জল দিয়া গৃহস্থালার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইয়া থাকে, অত্যন্ত ঘৃণ্য, অপরিচ্ছন্ন জলে লোকে স্নান করিয়া থাকে, এমন কি, সেই জল তাহারা পানীয়রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে, অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর জল ব্যবহার করিয়া তাহারা নানারূপ রোগে কাতর হইয়া পড়ে। অনেকে মনে করে, এই অপরিষ্কার জল ব্যবহার করা ধর্ম্মের বাণী দ্বারা আদিষ্ট। সুতরাং তাহাদের এই ভ্রান্তি দূর করিতে হইলে এমন একজন মহা-মানবের আদেশবাণী একান্ত প্রয়োজনীয়, যিনি ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিমান্‌ বলিয়া বিশ্বসিত হইবেন। পাশ্চাত্য জগতের অনেক স্থানেও বাহাউল্লা'র এই উপদেশ-বাণীর সমধিক আবশ্যকতা আছে; কারণ, সেই সমস্ত স্থানেও অপরিচ্ছন্ন আচার, ব্যবহার বিলক্ষণ বিদ্যমান।

অবতারের আদেশ মান্য করিলে যে ফল হয়

সহজ, সরল জীবন-যাপন, শুচিতা, মাদক-দ্রব্য-বর্জ্জন প্রভৃতি সম্বন্ধে অবতারগণের যে সমস্ত আদেশ-বাণী রহিয়াছে তাহাদের কার্য্য-কারিতা এত সুস্পষ্ট যে তাহাদের সমালোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু অনেক

সময় তাহাদের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার কথা কেহ চিন্তা করিয়া দেখে না। যদি অবতারগণের এই সমস্ত আদেশ-বাণী সচরাচর রক্ষা করা হইত, তাহা হইলে অনেক সংক্রামক ব্যাধি ও দুরারোগ্য রোগ মানবসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইত। স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া এবং সুরা ও অহিফেন পান করিয়া মানুষ যে সমস্ত ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে তাহা বর্ণনাতীত। আর, এই সকল উপদেশ পালন করিয়া চলিলে শুধু যে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, তাহা নহে, বরং চরিত্রের উৎকর্ষসাধনেও ইহা সমধিক প্রভাবশীল। সুরাপায়ীর শরীরে কোনো প্রকার স্পষ্ট বিকৃতি বা রোগ দেখা দিবার পূর্ব্বেই তাহার ভালমন্দ-বিবেচনা-শক্তির লোপ প্রাপ্তি ঘটে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে মদ্য পান না করিলে শারীরিক উন্নতি অপেক্ষা আমাদের মানসিক, আত্মিক ও নৈতিক উন্নতিই বেশী হইয়া থাকে। শুচিতা সম্বন্ধে আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন :—

"বাহ্য শুচিতা শারীরিক হইলেও অধ্যাত্ম জীবনের উপর অত্যন্ত অধিক প্রভাবশীল। * * * পবিত্র, শুচি দেহ মানবাত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।"—(আব্দুল্‌বাহার ফলকলিপি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮৫)

স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে অবতারগণের নির্দ্দিষ্ট সংযমনীতি সাধারণভাবে পালিত হইলে, মানব সমাজ হইতে রোগোৎপত্তির আর একটি প্রধান কারণ অন্তর্হিত হইবে; উপদংশঘটিত যে রোগে আজকাল বালক, বৃদ্ধ, পাপী, নিষ্পাপ হাজার হাজার লোকের স্বাস্থ্য নিরন্তর ধ্বংস হইতেছে, সেই ঘৃণ্য রোগ অচিরেই চিরতরে লুপ্ত হইবে।

অবতারগণের আদেশ অনুসরণ করিয়া মানুষ যদি ন্যায়পরায়ণ হয়, পরস্পরকে সাহায্য করে, প্রতিবাসীকে আত্মবৎ ভালবাসে, তবে একদিকে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও কঠোর দরিদ্রতা এবং অন্যদিকে

অসংযম, অলসতা ও জঘন্য বিলাসিতা, কিছুতেই তাহার মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না।

মুসা, বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, মোহাম্মদ কি বাহাউল্লা'র স্বাস্থ্য রক্ষাসম্বন্ধীয় ও নৈতিক আদেশবাণী যদি সচরাচর সাধারণভাবে পালন করা হইত, তাহা হইলে জগতের সমস্ত চিকিৎসক ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগগুলি রোগ-নিবারণের জন্য যাহা করিতে পারিয়াছেন তাহা হইতে অনেক অধিক ফল লাভ করা যাইত। বাস্তবিক পক্ষে যদি সকলে অবতারগণের ঐ সকল উপদেশ মানিয়া চলে, তাহা হইলে সকলেই সুন্দর স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবে, মানুষ রোগ-ক্লিন্ন হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে না, পক্ক ফলের মত বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সুস্থ দেহে বাঁচিয়া থাকিবে।

চিকিৎসকরূপে অবতারগণ

কিন্তু আমরা এমন এক সংসারে বাস করিতেছি, যেখানে স্মরণাতীত কালের প্রারম্ভ হইতে অবতারের আদেশ মানিয়া চলাকে একপ্রকার নিয়মের বহির্ভূত বলিয়াই মনে করা হইয়াছে। এখানে লোকে ঈশ্বর অপেক্ষা নিজেকেই অধিক ভালবাসে। এখানে ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ অপেক্ষা অধিক বড় করিয়া দেখা হয়; জড়-ঐশ্বর্য্য ও ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাকে মানবের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই জন্যই সংসারে ভীষণ প্রতিযোগিতা, পরস্পর-সংঘর্ষ, অত্যাচার, স্বেচ্ছাচার দারিদ্র্য ও অর্থাভাব প্রভৃতি নানা জঘন্য অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে; এই সকল অবস্থা হইতে নানারূপ মানসিক ও শারীরিক ব্যাধির উৎপত্তি হইতেছে। ফলে সমগ্র মানবসমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে

এবং ইহার প্রত্যেক শাখা, প্রশাখা ও পত্র শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। যিনি সারা জীবন পুণ্য কাজ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকেও অপরের পাপের জন্য কষ্টভোগ করিতে হইতেছে। এই কারণে প্রভু বাহাউল্লা' তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারগণের ন্যায় দেখাইয়া দিতেছেন—কিরূপে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয় এবং কিরূপেই বা নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে হয়। তিনি জগৎবাসীর শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি নিরাময় করিবার জন্য মহান্ চিকিৎসকরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পার্থিব উপায়ে স্বাস্থ্য-লাভ

পাশ্চাত্য জগতে বর্ত্তমান সময়ে মানসিক বা আধ্যাত্মিক উপায়ে স্বাস্থ্য-লাভের উপায় সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, জনসাধারণের এই সমস্ত উপায়ের প্রতি আস্থাও দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে। এমন কি, অনেক ব্যক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদ-মূলক চিকিৎসা-পদ্ধতিতে একান্ত বিরক্ত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা করিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে সাধারণে প্রচারিত স্বাস্থ্য-নীতির আদৌ কোনো মূল্যই নাই। কিন্তু প্রভু বাহাউল্লা' পার্থিব, অপার্থিব, উভয়বিধ চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রতিই বিশেষ পক্ষপাতী। তিনি বলিয়াছেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি বিধান করিতে হইবে, ইহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হইবে—যাহাতে সর্ব্বপ্রকার রোগা-রোগ্যকারী উপায়সমূহ যথাযথভাবে মানবের হিতার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। যখন বাহাউল্লা'র নিজ পরিবারস্থ কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হইয়া পড়িত, তখন একজন চিকিৎসা-ব্যবসায়ীকে আহ্বান করিয়া আনা হইত; তিনি তাঁহার শিষ্য অনুগামীদিগকেও এইরূপ করিতে আদেশ দিয়াছেন। "আক্দাস্ গ্রন্থে" তিনি বলিয়াছেন :—"তোমরা রোগ বা

অস্বাস্থ্য কর্তৃক আক্রান্ত হইলে কোনো পারদর্শী চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবে।"

বিজ্ঞানের প্রতি এবং শিল্পের প্রতি বাহাই মনোভাব সাধারণ, ব্যাপকভাবে বাহাউল্লা'র এই আদেশের অনুরূপ। বাহাই মতানুসারে, যে সমস্ত শিল্প এবং বিজ্ঞান মানবের হিতসাধন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে উৎকর্ষলাভ করিবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানব প্রাকৃতিক শক্তির উপর জয়লাভ করে, সমস্ত পার্থিব বস্তুর উপর তাহার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। বিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকিলে, মানব অন্ধ প্রকৃতিশক্তির দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়। "চিকিৎসকের ফলকলিপি"তে বাহাউল্লা' বলিয়াছেন :—

"যখন চিকিৎসার প্রয়োজন, তখন চিকিৎসার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইও না। যখন হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবে, তখন চিকিৎসা বন্ধ করিবে। খাদ্য-বস্তুর নিয়মবদ্ধতার মধ্য দিয়াই রোগের যথাসম্ভব চিকিৎসা করিতে চেষ্টা করিবে, ঔষধাদি ব্যবহার যথাসম্ভব অল্পই করিবে। যদি কোনো গাছ-গাছড়াতে রোগমুক্তির উপায় পাও, তাহাই অবলম্বন করিবে, নির্য্যাসীকৃত ঔষধকে প্রাধান্য দিও না। * * * যখন স্বাস্থ্য অটুট, অব্যাহত থাকিবে, তখন ঔষধ ব্যবহার করিবে না, কিন্তু যখন ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইবে, তখন ঔষধ ব্যবহার করিবে।"

আব্দুল্‌বাহা এক ফলকলিপিতে বলিয়াছেন :—

"হে সত্যানুসন্ধিৎসু, হে সত্যান্বেষিণ্‌, রোগমুক্তির দ্বিবিধ উপায় আছে; একটি উপায় পার্থিব; অপরটি অপার্থিব, আধ্যাত্মিক। প্রথম উপায়, পার্থিব ঔষধ ব্যবহার করা; দ্বিতীয় উপায়, ঈশ্বরের

নিকটে প্রার্থনা করা ও তাঁহার দয়ার সাগরে আত্মসমর্পণ করা; উভয়বিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, অভ্যাস করিতে হইবে। এই দুই উপায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ-সম্বন্ধ নাই; কারণ, রোগমুক্তির পার্থিব উপায়ও ঈশ্বরের করুণা দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে উপায়ও তাঁহার নিকট হইতেই প্রাপ্ত। তিনিই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের রহস্যগুলি মানবের নিকটে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাঁহার ভৃত্যগণ যেন এই প্রকার ঔষধ-ব্যবস্থা দ্বারাও উপকৃত হইতে পারে।"—(আব্‌দুল্‌বাহার ফলকলিপি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮৭)

আব্‌দুল্‌বাহার মতানুসারে, আমাদের অপ্রকৃত, কৃত্রিম জীবনধারণের জন্য আমাদের রুচি বিকৃত, পর্য্যুষিত না হইলে, আমরা সহজ, সরলভাবে আমাদের উপযুক্ত আহার্য্য, উপযুক্ত খাদ্য, রোগমুক্তির বনজ-ঔষধি, সমস্তই নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিতাম। জীব, জন্তুগণ তাহা অতি অনায়াসেই করিয়া থাকে। "কতিপয় প্রশ্নের উত্তর" নামক গ্রন্থে (পৃঃ ২৯৬), রোগমুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা কালে আব্‌দুল্‌বাহা এই বলিয়া আলোচনা-শেষ করিয়াছেন:—

"ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে আহার্য্য, ফল, মূল প্রভৃতি সহজলভ্য বস্তুর সাহায্যে রোগমুক্তি সম্ভব। কিন্তু অদ্যাপি চিকিৎসা-বিজ্ঞান অপরিণত অবস্থায় আছে, সুতরাং এ-সত্য-তথ্য উপলব্ধ হয় নাই। যখন চিকিৎসা-বিজ্ঞান পূর্ণতালাভ করিবে, তখন, নানারূপ খাদ্য, পুষ্টিকর দ্রব্য, সুগন্ধি ফল-মূল, শীতল ও উষ্ণ নানাবিধ জলের সাহায্যে রোগমুক্তি সম্ভব হইবে।"

যে সমস্ত পার্থিব ঔষধের সাহায্যে রোগমুক্তি হইয়া থাকে, সেগুলি মাত্র নামে "পার্থিব"; কারণ, তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি, যাহার বলে রোগমুক্তি হইয়া থাকে, ঐশ্বরিক; সুতরাং অপার্থিব। "সমস্তই

ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে; ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিবার পক্ষে একটি বাহ্য উপায়, ঔষধ; ঔষধ তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

অপার্থিব উপায়ে রোগমুক্তি

তাঁহার উপদেশ অনুসারে, পার্থিব উপায় ব্যতীত অপার্থিব উপায়ে রোগমুক্তির উপায়ও নানা প্রকার। যেমন অস্বাস্থ্য বা রোগের সংক্রামক শক্তি আছে, সেইরূপ স্বাস্থ্যেরও সংক্রামক শক্তি আছে; যদিও রোগের সংক্রামক শক্তি অতি দ্রুতগতিতে প্রভাব বিস্তার করে, এবং যদিও তাহার ফল অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে অনুভূত হয় তথাপি স্বাস্থ্যের সংক্রামক শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না; এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে উহা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে এবং উহার প্রভাব রোগ-প্রভাবের মত ব্যাপক নহে।

রোগীর নিজের মানসিক অবস্থা হইতে সঙ্কেত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও রোগ-মুক্তির পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। এই 'সাঙ্কেতিকত্ব'ই আধ্যাত্মিক উপায়ে রোগমুক্তির ভিত্তি-স্বরূপ। ভয়, ক্রোধ, বিরক্তি প্রভৃতি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর; অপরপক্ষে, আশা, প্রেম, আনন্দ প্রভৃতি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ শুভফলপ্রদ।

"চিকিৎসকের ফলকলিপি"তে বাহাউল্লা' বলিতেছেন:—

"নিঃসন্দেহ যে সর্ব্বাবস্থায় সন্তোষ, সহিষ্ণুতা মানবের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। মানব তাহাদের সাহায্যে অলসতা ও অন্যান্য কুঅভ্যাস হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। শোক এবং দুঃখের বশীভূত হইও না; কারণ, তাহা অশেষ কষ্টের হেতু; ঈর্ষা বা অসূয়াভাব শরীর ক্ষয় করে এবং ক্রোধ যকৃৎ দগ্ধ করে। তোমরা এতদুভয়কে এমন ভাবে পরিহার করিবে, যেমন তোমরা ব্যাঘ্রকে পরিহার করিয়া থাক।"

আবদুল্‌বাহা বলিতেছেন :—

"আমোদ-উল্লাস আমাদিগকে উড়িবার শক্তি প্রদান করে। আনন্দের সময় আমাদের শারীরিক শক্তি বলবত্তর হয়, আমাদের অনুধাবন শক্তি প্রখরতর হয়। * * * কিন্তু যখন নিরানন্দতা আসিয়া দেখা দে'য়, তখন আমরা শক্তিহীন হইয়া পড়ি।"—(প্যারিসে কথা-বার্ত্তা, পৃ: ১০০)

আর এক প্রকারে মানসিক রোগ-মুক্তি সম্বন্ধে আবদুল্‌বাহা বলিয়াছেন :—

"একজন অতি শক্তিশালী ব্যক্তি একটি অসুস্থ ব্যক্তির উপরে তাহার শক্তিশালী মনের সমস্ত প্রভাব কেন্দ্রীভূত করে এবং অসুস্থ ব্যক্তি তাহার সমস্ত মানসিক আস্থা, বিশ্বাস, ভক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া আশা করিতে থাকে, তাহার রোগ বিদূরিত হইবে, সে নিরাময়, রোগ-মুক্ত হইবে; অসুস্থ ব্যক্তি সমস্ত মনে প্রাণে বিশ্বাস করিবে, শক্তি-শালী ব্যক্তির প্রভাবে তাহার রোগ অপনোদিত হইবে। এইরূপে অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বলবত্তর, শক্তিশালী ব্যক্তির মানসিক সংযোগ স্থাপিত হইবে, ক্রমে তাহা ঘনিষ্ট হইতে ঘনিষ্টতর হইবে। শক্তিশালী ব্যক্তি রোগীকে রোগমুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতে থাকে, রোগী রোগমুক্ত হইবার আশায় আশান্বিত হয়। এইরূপ এককেন্দ্রীভূত দুইটি মনোভাবের সংযোগে স্নায়বিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়; এই স্নায়বিক উত্তেজনা, এই মনোভাবই রোগীর রোগমুক্তির কারণ হইয়া থাকে।" —(কতিপয় প্রশ্নের উত্তর, পৃ: ২৯৪)

এই সমস্ত আরোগ্য লাভের উপায় গুরুতর রোগে নিষ্ফল হইতে পারে, ইহা সত্য; কিন্তু ইহাদের প্রভাব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কার্য্যকরী হইয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

পবিত্র পরমাত্মার শক্তি

রোগমুক্তির প্রকৃষ্টতম উপায়, পরমাত্মার শক্তি।

"ইহা স্পর্শ বা দৃষ্টি বা, এমন কি, উপস্থিতির উপরও নির্ভর করে না। * * * রোগ দুরারোগ্যই হউক আর সহজ আরোগ্যই হউক, সামান্যই হউক আর তীব্রই হউক, শারীরিক স্পর্শ থাকুক আর নাই থাকুক, রুগ্নব্যক্তি এবং চিকিৎসকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হউক আর না হউক, পরমাত্মার শক্তি সাহায্যেই আরোগ্য-লাভ হইয়া থাকে।"— (কতিপয় প্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ২৯৫)

অক্টোবর, ১৯০৪, আব্দুল্‌বাহা মিস্ এথেল্ রোজেন্‌বার্গের সঙ্গে আলাপ-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ঃ—

"পবিত্র পরমাত্মার শক্তি দ্বারা যে রোগমুক্তি ঘটিয়া থাকে, তাহার সঙ্গে বিশেষ একাগ্রতা বা স্পর্শ-সম্বন্ধের কোনো সম্বন্ধ নাই। পবিত্র পুরুষের ইচ্ছানুক্রমে এবং প্রার্থনা-বলেই ইহা ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি রোগী, সে ব্যক্তি হয়ত প্রাচ্য-দেশে রহিয়াছেন, পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ও হয়ত নাই; কিন্তু তথাপি যে মুহূর্ত্তে পবিত্র পুরুষ তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের দিকে নিয়োজিত করিয়া প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করেন, রোগী তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হয়। অবতারগণ এই পরম-শক্তির অধিকারী, এবং যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নীত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও এই শক্তি রহিয়াছে।"

যীশুখৃষ্ট এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ যে সমস্ত রোগ আরোগ্য করিতেন, তাহা এই পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর; পবিত্র পুরুষগণ যুগে যুগে এইরূপে রোগীর রোগ-মুক্তি করিয়াছেন। বাহাউল্লা' এবং আব্দুলবাহা, উভয়েই এই

পরম-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহাদিগের অনুরক্ত শিষ্য-ভক্তগণও এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইতে পারিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইয়াছে।

রোগীর মনোভাব

অধ্যাত্ম-শক্তি সাহায্যে রোগমুক্তি যথাযথরূপে সম্পন্ন হইবার নিমিত্ত, রোগী, তাহার চিকিৎসক, তাহার বন্ধু-বান্ধবগণের, এমন কি, সমাজের সমস্ত ব্যক্তিরই কয়েকটি আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

রোগী তাহার সমস্ত হৃদয়, মন দিয়া ঈশ্বরের চিন্তা করিবে, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তায় রোগীর অখণ্ড বিশ্বাস থাকিবে, তাঁহার পরমকারুণিকতায় প্রগাঢ় আস্থা থাকিবে; রোগীর রোগমুক্তির জন্য রোগীর এইরূপ মনোভাব নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আগষ্ট, ১৯১২ তে আব্দুলবাহা একজন আমেরিকান মহিলাকে বলিয়াছিলেন :—

"তোমার সমস্ত রোগ, সমস্ত প্রকারের ব্যাধি অনায়াসে, অচিরে দূর হইবে, তুমি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য লাভ করিবে। * * * তোমার আত্ম-প্রত্যয় হোক, তুমি নিশ্চিন্ত হও, বাহাউল্লা'র প্রসাদাৎ, প্রভু বাহাউল্লা'র করুণায় তোমার পক্ষে সমস্তই শুভ হইবে। * * * কিন্তু সেজন্য তোমাকে সর্ব্ব-প্রভাময় "আবৃহা" রাজ্যের দিকে চিত্ত নিয়োজিত করিতে হইবে, মেরী ম্যাগ্‌ডালীন্‌ যেরূপ যীশুখৃষ্টের চরণে একান্তভাবে মন-প্রাণ-জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তোমাকেই সেইরূপ করিতে হইবে; আমি নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি, তুমি তাহা করিলেই তুমি তোমার হৃত মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে। তোমার উপযুক্ততা আছে। আমি তোমাকে এই আনন্দ-সংবাদ জানাইতেছি যে তুমি সর্ব্বাংশে

উপযুক্ত, কারণ, তোমার হৃদয় অতি পবিত্র। * * * নিশ্চিন্ত থাক! আনন্দ-উল্লাসে থাক! আশান্বিত থাক!"

যদিও এই উল্লিখিত ক্ষেত্রে আব্দুল্‌বাহা এই মহিলাটির শারীরিক স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তি নিঃসন্দেহরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তথাপি অনেক ক্ষেত্রে তিনি সেরূপ করেন নাই, রোগীর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি থাকা সত্ত্বেও। আক্কাতে একজন তীর্থপর্য্যটককে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"রোগমুক্তির জন্য যে সমস্ত প্রার্থনা-বাণী লিখিত হইয়াছে, তাহা মাত্র শারীরিক আরোগ্য-লাভের জন্য নহে, তাহা আধ্যাত্মিক রোগ-মুক্তির জন্যও প্রযোজ্য। রোগীর পক্ষে রোগ-মুক্তিই যদি প্রকৃত পক্ষে কল্যাণকর হয়, তাহা হইলে প্রার্থনা নিশ্চয়ই শারীরিক রোগ বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু অনেক ব্যক্তির পক্ষে রোগ-মুক্তি অকল্যাণ-কর, কারণ, তাহাতে বহু অন্যান্য রোগের সৃষ্টি হয়। সেইজন্য অনেক প্রার্থনা মঞ্জুর হয় না।

"হে ঈশ্বরের ভৃত্য! অধ্যাত্ম-শক্তির বলে শারীরিক ও মানসিক, পার্থিব ও অপার্থিব সর্ব্ববিধ ব্যাধিরই উপশম হইয়া থাকে।"—(আক্কাতে প্রাত্যহিক পাঠ, পৃঃ ৯৫)

অপর এক উপলক্ষ্যে তিনি এক জন রোগীর নিকটে লিখিতেছেন :—

"ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় যে কি, কেন তাহা ঐরূপ হইল, এ সম্বন্ধে মানুষ সাধারণতঃ কিছু বুঝিতে পারে না। হেতু ও কারণ কালে প্রকাশ হইবে। ঈশ্বরে নির্ভর ও আস্থা রাখিও, তাঁহার অভিপ্রায়ে আত্মসমর্পণ করিও। নিশ্চয়ই তোমার ঈশ্বর পরম-স্নেহকারী, দয়াশীল ও কৃপাময় * * * এবং তিনি তোমার উপর তাঁহার করুণা-ধারা বর্ষণ করিবেন।"—(পশ্চিমের তারকা, ৮ম খণ্ড পৃঃ ২৩২)

আব্‌দুল্‌বাহার উপদেশানুসারে আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য শারীরিক স্বাস্থ্যের সহায়ক, পরিপোষক। কিন্তু শারীরিক স্বাস্থ্য অনেক ব্যাপারের উপর নির্ভর করে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি ব্যক্তি-বিশেষের আয়ত্তাধীন নহে। সেইজন্য কোনো ব্যক্তি প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক-মনোভাব-সম্পন্ন হইলেও সব সময়ে শারীরিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে পারে না। পুণ্যাত্মা নর-নারীগণও অনেক সময়ে রোগ-ভোগ করেন।

কিন্তু তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তির আধ্যাত্মিক-মনোভাবের বিলক্ষণ প্রভাব তাহার শরীরের উপর লক্ষিত হইয়া থাকে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈশ্বরে সমর্পিত-প্রাণ হইতে পারিলে শারীরিক ব্যাধি দূরীভূত হয়। আব্‌দুল্‌বাহা একজন ইংরাজ মহিলাকে লিখিয়াছিলেন:—

"তুমি তোমার দৈহিক দুর্ব্বলতার কথা লিখিয়াছ। আমি দয়ার সাগর বাহাউল্লা'র নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তোমাকে আত্মার শক্তি দান করিবার জন্য,—যেন এই আত্মিক শক্তির প্রভাবে তোমার দৈহিক স্বাস্থ্যও লাভ করিতে পার।"

অপর একস্থলে তিনি বলিতেছেন:—

"পরমেশ্বর মানুষকে এইরূপ আশ্চর্য্য-শক্তি দান করিয়াছেন যে, সে সকল সময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া অন্যান্য দানের সহিত তাঁহার কৃপায় রোগ-মুক্তিও লাভ করিতে পারে। কিন্তু হায়! মানব এই পরম-মঙ্গলের জন্য কৃতজ্ঞ নহে, অনবধানতার ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছে, ঈশ্বর-প্রদত্ত সেই পরম অনুগ্রহকে উপেক্ষা করিয়া, পরম-আলোক হইতে মুখ ফিরাইয়া, অন্ধকারে আপন পথে বিচরণ করিতেছে।"—(প্যারিসে কথাবার্ত্তা, পৃঃ ১৬)

চিকিৎসক

আধ্যাত্মিক শক্তিবলে রোগমুক্তি, ইহা সর্ব্বমানবের সাধারণ সম্পত্তি, সকলেই ইহা অল্পাধিক পরিমাণে আয়ত্ত করিয়া রোগমুক্তি ঘটাইতে পারে বটে, কিন্তু তথাপি, যেমন কোনো ব্যক্তির অঙ্ক শাস্ত্রে বা সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা থাকে, সেইরূপ কোনো কোনো ব্যক্তির চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শিতা লক্ষিত হয়। এই সমস্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিই চিকিৎসা-ব্রতে ব্রতী হইবে, ইহারাই চিকিৎসক হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এই জড়বাদ-প্লাবিত-যুগে আধ্যাত্মিক উপায়ে রোগমুক্তির সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে বিস্মৃতিলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতার ন্যায় রোগ আরোগ্য করার দক্ষতাকেও মূল্যবান্ জ্ঞান করিতে হইবে,—তাহা আয়ত্ত করিতে হইবে, যাহাতে ইহার পরিপূর্ণতম পরিণতি সাধিত হইতে পারে। বর্ত্তমান জগতে এমন অনেক ব্যক্তি বাস করিতেছে, যাহাদের এই চিকিৎসা শক্তির প্রেরণা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু বিকাশ লাভ করে নাই, পরিপূর্ণতম অবস্থায় উন্নীত হয় নাই। এই মানসিক বা আধ্যাত্মিক চিকিৎসার রহস্য পূর্ণতরভাবে উপলব্ধ হইলে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিপ্লব হইবে, তাহার কার্য্যকরী শক্তি শতধা বৃদ্ধি পাইবে। এই নূতন জ্ঞান ও শক্তির সঙ্গে যদি রোগীর ধর্ম্ম-পরায়ণতা, আধ্যাত্মিক আস্থা প্রভৃতি সদ্‌গুণ মিলিত হয়, তাহা হইলে অলৌকিক ফললাভের সম্ভাবনা।

"চিকিৎসকের ফলকলিপি"তে বাহাউল্লা' বলিতেছেন:—

"ঈশ্বরের উপর আমাদের নির্ভর হওয়া উচিত; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই চিকিৎসক, সকলেরই সহায়-সম্বল, তিনি ভিন্ন অপর কেহ

আমাদের ঈশ্বর নহে। *** পৃথিবী অথবা স্বর্গের কিছুই তাঁহার হাত ছাড়া নহে।

"হে চিকিৎসক! পীড়িতের চিকিৎসা করিবার সময়ে প্রথমে 'পরম বিচার'এর প্রভু, তোমার ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবে; তাহার পরে ঈশ্বর তাঁহার ভৃত্যগণের রোগমুক্তির জন্য যে সকল বস্তু নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহা প্রয়োগ করিবে। আমার জীবনের দিব্য করিয়া বলিতেছি,—আমার প্রেমের মদিরাপানে উন্মত্ত চিকিৎসকের উপস্থিতি মাত্রেই রোগী রোগমুক্ত হয়, তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসে আশা ও করুণা সঞ্চারিত করে। শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবে। তিনি চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

"চিকিৎসা-বিদ্যা অন্যান্য বিজ্ঞান-শাস্ত্র অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়; কেননা, যে ঈশ্বর ধূলী-কণাকে সঞ্জীবিত করেন তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বারা মানবের শরীর রক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন, অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরে এই বিজ্ঞানের স্থান দিয়াছেন। কারণ, আমাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য তোমাকে অদ্যই উদ্যোগী হইতে হইবে।

"বল: 'হে পরমেশ্বর, তোমার নামই আমার আরোগ্য-নিদান, তোমার স্মৃতিই আমার প্রতিকার, তোমার নৈকট্যই আমার ভরসা, তোমার প্রেমই আমার আনন্দদায়ক সঙ্গী, তোমার অনুকম্পাই আমার ইহকাল, পরকালের চিকিৎসক ও সহায়ক। নিশ্চয়ই তুমি দাতা, সর্ব্বজ্ঞ ও পরিণামদর্শী।' ***"

আব্দুল্‌বাহা লিখিতেছেন:—

"যে ব্যক্তি 'বাহা'র প্রেমে মগ্ন থাকে এবং পার্থিব সকল বস্তু বিস্মৃত হয়, তাহার ওষ্ঠাধর হইতে পবিত্র পরমাত্মার রব শুনা যাইবে

এবং তাহার হৃদয় জীবন-শক্তিতে পূর্ণ হইয়া থাকিবে। * * * তাহার মুখ হইতে মুক্তাবলীর ন্যায় বাক্য নিঃসৃত হইবে, তাহার হস্তের সংস্পর্শে সর্ব্বপ্রকার রোগ-ব্যাধির উপশম হইবে।”—(পশ্চিমের তারকা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২২৩)

“হে পবিত্র, আধ্যাত্মিক ব্যক্তি! তুমি ঈশ্বরের প্রেমে স্পন্দিত ও তাঁহার গুণগানে মুখর হৃদয় লইয়া, আনন্দ, উল্লাস, প্রেম ও ব্যাকুলতা সহকারে তাঁহার পবিত্রাত্মার সাহায্য-প্রার্থী হইয়া তাঁহার স্বর্গরাজ্যের দিকে তোমার চিত্ত নিবদ্ধ ক'র। তিনি তাঁহার সকাশ হইতে তোমাকে এক শক্তি দিয়া রোগব্যাধি-নিরাময় কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

“তুমি মহীয়ান্ নামের শক্তি সহকারে ঈশ্বরের প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া, সর্ব্বোচ্চ রাজ্যের দিকে ফিরিয়া রোগমুক্তি করিতে থাক এবং শরীর ও মন উভয়ের চিকিৎসা ক'র।”—(আব্দুল্‌বাহার ফলকলিপি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬২৮-৬২৯)

সর্ব্ব-সাধারণ কি উপায়ে রোগমুক্তির সহায়ক হইতে পারে

রোগীর রোগমুক্তি করা এমন একটি ব্যাপার যে তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মাত্র যে রোগী এবং যে চিকিৎসক, তাহারই নহে, সর্ব্ব-সাধারণেরই ইহার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ-সম্বন্ধ বিদ্যমান। সহানুভূতি সেবা, সত্য-পথে প্রচালিত হইয়া জীবন-ধারণ, সচ্চিন্তা করা, বিশেষতঃ প্রার্থনা সাহায্যে সকলেই রোগমুক্তির সহায়তা করিতে পারে। প্রার্থনাই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপায়। আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন:—

"অপরের জন্য প্রার্থনা বা মিনতির উপযোগিতা অসামান্য, নিশ্চয়ই তাহার ফললাভ হইবে।"

রোগীর বন্ধু ব্যক্তিগণের এই বিষয়ে বিশেষ কর্ত্তব্য আছে; তাহাদের সু বা কু প্রভাব রোগীর উপর বিলক্ষণ কার্য্যকর হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে রোগের ফলাফল নির্ভর করে, নিঃসহায় রোগীর পিতামাতা, বন্ধুবর্গ এবং প্রতিবেশীগণের কর্ত্তব্যপালনের উপর। এমন কি, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরও রোগের প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে সেই প্রভাব বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ না হইতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে সমাজ-জীবনে তাহা সামান্য নহে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, প্রফুল্লতা, অপ্রফুল্লতা, এ সমস্ত প্রকার ভাবই ব্যক্তিগত জীবনের উপর নির্ভর করে; ব্যক্তিগত জীবন মিলাইয়া সমাজ-জীবন গঠিত হইয়া থাকে। একজনের ভাল-মন্দে সকলেই সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হইতে বাধ্য; অপর পক্ষে সকলের শুভাশুভের উপর একজনের শুভাশুভ একান্ত নির্ভরশীল। সামাজিক "আবহাওয়া" বা পরিবেষ্টনী কিরূপ হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সকলেরই কিঞ্চিৎ ক্ষমতা আছে। বর্ত্তমান জাগতিক অবস্থায় প্রত্যেকের জন্য পূর্ণ স্বাস্থ্য সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকে পবিত্র পরমাত্মার স্বাস্থ্যদায়ক শক্তি প্রবাহিত করিবার উপায়-স্বরূপ হইতে পারে, এবং এরূপে সে নিজের উপরে এবং যাহারা তাহার সংস্পর্শে আসে তাহাদের উপরেও স্বাস্থ্যকর, আনন্দদায়ক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

রোগীর রোগমুক্তি বিষয়ে বাহাইগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বারংবার জোর দিয়া বলা হইয়াছে, অন্য কোনো বিষয়ে তদ্রূপ জোর দিয়া বলা,

হয় নাই; বাহাউল্লা' এবং আব্দুল্‌বাহা অসংখ্য রোগমুক্তির প্রার্থনাও প্রকটিত করিয়াছেন।

স্বর্ণ-যুগ বা সত্য-যুগ

বাহাউল্লা' নিশ্চিত করিয়া বলিয়াছেন যে রোগী, চিকিৎসক, মানব-সমাজ, এই তিন পক্ষের সমন্বয়ে মানসিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইলে, স্বর্ণ-যুগ সমাগত হইবে। তখন সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের শক্তি সাহায্যে, "সর্ব্ববিধ দুঃখ আনন্দে পরিণতি লাভ করিবে, অস্বাস্থ্য স্বাস্থ্যে রূপান্তরিত হইবে"। আব্দুল্‌বাহা বলিয়াছেন—"যখন ঈশ্বরের বাণী মর্ম্মগত হইবে, পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধ হইবে, তখন সমস্ত প্রকার অশান্তির অবসান হইবে।" অপর একস্থলে বলিতেছেন:—

"যখন পার্থিব এবং অপার্থিব, উভয় জগৎ পরস্পর উত্তমরূপে সম্বন্ধযুক্ত হইবে, যখন হৃদয় পবিত্র, বাসনা বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে, তখন পূর্ণ একতা সংঘটিত হইবে, যাহার শক্তি প্রভাবে এক পরিপূর্ণ অলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষ প্রকাশ হইবে, দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক সর্ব্ব-রোগের পূর্ণ উপশম হইবে।"—(আব্দুল্‌বাহার ফলকলিপি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৯)

স্বাস্থ্যের উচিত ব্যবহার

এই অধ্যায়ের উপযুক্ত সমাপ্তি হিসাবে আব্দুল্‌বাহার ঐ উপদেশ-বাণী স্মরণ করা যাইতে পারে, যাহাতে দৈহিক স্বাস্থ্যের উচিত

ব্যবহার সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি ওয়াসিংটনবাসী বাহাইদিগের এক ফলকলিপিতে বলিতেছেন :—

"স্বাস্থ্য-সম্পদ-বিশিষ্ট দেহের শক্তি যদি ঈশ্বরের পথে প্রযুক্ত হয়, তাহা অপেক্ষা প্রশংসার্হ দেহের ব্যবহার আর কিছুই হইতে পারে না ; যদি মানব দেহের সমস্ত শক্তি সমস্ত মানবকুলের হিতসাধন প্রচেষ্টায় ব্যয়িত হয় এবং তাহা সর্ব্ববিধ মঙ্গলের হেতু হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাও অতীব প্রশংসার্হ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি তাহা আধ্যাত্মিক হিতসাধনের পথে প্রযুক্ত না হইয়া, মাত্র শারীরিক, পার্থিব হিতসাধনের পথে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাও ঈশ্বরের নিকটে গ্রাহ্য। কিন্তু যদি স্বাস্থ্যবান্ দেহের ব্যবহার ইন্দ্রিয়তন্ত্রতা, ভোগ সুখ এবং পাশবিক আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হওয়াতেই নিঃশেষিত হয়, তাহা হইলে সেই স্বাস্থ্য অপেক্ষা অস্বাস্থ্য কল্যাণকর, সেইরূপে জীবনধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। যদি তোমরা স্বাস্থ্যলাভের বাসনা কর, তাহা হইলে তাহা একমাত্র পরমরাজ্যের সেবার নিমিত্তই করিও। আমি আশাকরি, তোমরা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিবে, দৃঢ়-চিত্ততা, পূর্ণ স্বাস্থ্য, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাপ্ত হইবে, যাহাতে তোমরা চিরস্থায়ী জীবনের উৎস হইতে জীবনবারি পান করিয়া ঈশ্বরের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইতে পার।"

অষ্টম অধ্যায়

ধর্ম্মসমূহের একত্ব

"হে পৃথিবীর লোকসমূহ! এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহান্ প্রকাশের বিশেষত্ব এই কারণে যে আমরা সর্ব্বপ্রকার মতবিরোধ, শত্রুভাব ও অনৈক্যের মূলীভূত কারণ উচ্ছেদ করিয়াছি এবং মৈত্রী, সাম্য, মিলন এবং প্রেমের আবাহন পবিত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যাহারা তদনুসারে ঈশ্বর-প্রকটিত সত্য-পথ-রেখা অনুসরণ করে, তাহারাই ধন্য।"—(বিশ্বের ফলকলিপি)

উনবিংশ শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িকতা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ধর্ম্মের একতা পৃথিবী হইতে যেরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ হয়ত ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোনো যুগে হইয়াছিল না। বহু শতাব্দী ধরিয়া জোরোয়াষ্ট্রীয়ান, য়িহুদী, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ পরস্পর পরস্পরের পাশাপাশি বাস করিতেছিল, সত্য; কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে মৈত্রীভাবের সম্পূর্ণ অভাব ছিল, সকলে মিলিয়া এক-তন্ত্রতা রচনা না করিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত শত্রুতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিত। শুধু তাহা নহে, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় পরস্পর-বিরোধমান্ অসংখ্য উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যদিও যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন:—

"তোমরা পরস্পর পরস্পরকে এমন করিয়া ভালবাসিবে, যেন

তোমাদের পরস্পরের ভালবাসা দেখিয়া লোকে জানিয়া লয় যে তোমরা আমার শিষ্য।" কোরাণে বলা হইয়াছে :—

"তোমাদের এই ধর্ম্ম এক ও অভিন্ন। * * * ঈশ্বর তোমাদিগকে ঐ ধর্ম্ম দিয়াছেন—যাহা তিনি নোহাকে দিয়াছিলেন এবং যাহা আমরা তোমাদিগের নিকট প্রকাশিত করিয়াছি। এবং ইহাই আমরা এব্রাহাম, মুসা এবং যীশুকে দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম : 'তোমরা এই ধর্ম্মে বিশ্বাস ক'র, উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িও না।' "

ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রত্যেকেই আপন অনুগামীগণকে প্রেম ও মৈত্রীর উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অসহনশীলতা, অন্ধ-বিশ্বাস, আচার-সর্ব্বস্বতা, মিথ্যাচরণ, মতান্তরতা, প্রতিকূলতা প্রভৃতি ভেদবুদ্ধির নিমিত্ত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছিল। বাহাই যুগের প্রারম্ভে পরস্পর-বিবদমান্ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সংখ্যা যত অধিক ছিল, জগতের ইতিহাসে অন্য কোনো যুগে তত অধিক ছিল না। তখনকার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, মনে হয় যেন মানবজাতি সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম-বিশ্বাস, ক্রিয়া-অনুষ্ঠান, নৈতিক আচার-প্রণালী লইয়া ভাঙ্গাচোরা করিতেছিল,—পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল, কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, কিন্তু লক্ষ্য নিরূপণ করিতে পারিতেছিল না।

অপরপক্ষে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে নানারূপ বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইতেছিল। বহু নরনারী নির্ভীকচিত্তে প্রাকৃতিক নিয়ম ও ধর্ম্ম-তত্ত্বসমূহ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিতেছিল, তাহাদের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিতেছিল। নবলব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে মনুষ্য জীবনের নানা সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হইতে

লাগিল। অর্ণবপোত এবং বাষ্পীয় শকট, ডাক বিভাগ এবং মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অতি বিভিন্ন ধরণের জীবন ও চিন্তাধারার সম্পর্ক এবং ভাবের আদান-প্রদানের সূত্রপাত হইল। তথাকথিত "ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের সংঘর্ষ" ভয়াবহ সংগ্রামে পরিণত হইল। খৃষ্টীয়াণ জগতে বাইবেলের সমালোচনা হইতে লাগিল, বাইবেলের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে জনসাধারণ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল; বিজ্ঞানের দিক হইতে বাইবেলের প্রতি আক্রমণ চলিতে লাগিল, শত শতাব্দী ধরিয়া রচিত বিশ্বাসের সৌধ বিজ্ঞানবাদীর সন্দেহের ফুংকারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সমস্ত ধর্ম্মই এইরূপে ধীরে ধীরে অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল, সন্দেহবাদের বিরোধিতায় ধর্ম্ম-বিশ্বাস সর্ব্বত্রই অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া পড়িল। পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাহাদের আপন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিতে লাগিল।

এইরূপে বিভিন্ন বিশ্বাস ও মতবাদের সংঘর্ষে প্রাচীন ধর্ম্মমত সমূহের অকর্ম্মণ্যতা সম্বন্ধে জন-সাধারণের ধারণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। ধর্ম্মের পূর্ণতর জ্ঞান উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত ঘোরতর চেষ্টা করা হইতেছিল। এই আলোড়ন কেবল খৃষ্টান জগতে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং অল্পাধিক পরিমাণে, নানা বিভিন্ন ধরণে, সর্ব্ব-ধর্ম্মের, সর্ব্ব-দেশের জনসাধারণের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে দেখা দিয়াছিল।

বাহাউল্লা'র প্রত্যাদেশবার্ত্তা

এইরূপে যখন পরস্পর-সংঘর্ষ ও বিশৃঙ্খল-অবস্থা তাহার চরম সীমায় উপনীত হইল, বাহাউল্লা' তাঁহার তূর্য্য-নিনাদে পৃথিবীর সমগ্র মানবকুলকে এই মহিমময় বাণী শুনাইলেন :—

"জাতিসমূহ একই ধর্ম্মে বিশ্বাস-পরায়ণ হইবে, সমগ্র মানবকুলে

ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে; মানব সন্তানের মধ্যে স্নেহ ও একতার বন্ধন বলবত্তর হইবে; ধর্ম্মবিরোধ, জাতিবিরোধ এবং বিভেদ বিলুপ্ত হইবে। * * * এই সকল বিবাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাতের অবসান হইবে, মানবকুল এক জাতি, এক পরিবারবৎ হইবে।”—(অধ্যাপক ব্রাউনের সহিত বাক্যালাপ)

নিঃসন্দেহে ইহা এক উদার বার্ত্তা বটে, কিন্তু কি প্রকারে ইহার প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, ইহাই সমস্যা। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া অবতারগণ এই সমস্তের জন্য উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, কবিগণ কাব্য রচনা করিয়াছেন, মহর্ষিগণ আরাধনা করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মের বিভেদ বিলুপ্ত হয় নাই, বিবাদ-বিসম্বাদ যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে। এখন, এমন কি কথা আছে, সেই অলৌকিক ব্যাপার এখন সম্পন্ন হইবে? এই জগতে কি কোনো নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে? মানব-প্রকৃতি কি পূর্ব্বে যেমন ছিল এখন তাহা নহে, তাহার কি মূলতঃ কোনো পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? যত দিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন মানব-প্রকৃতিও কি যেমন আছে তেমনই থাকিবে না? যখন দুই ব্যক্তি, কি দুই জাতি একই বস্তু পাইতে চাহিবে, তাহারা কি উহার জন্য পূর্ব্বের মত এখনও লড়িবে না? কিন্তু প্রশ্ন এই,—যে ক্ষেত্রে মুসা, বুদ্ধ, যীশু ও মোহাম্মদ মানবজাতির একতা প্রতিষ্ঠিত করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, সেস্থলে বাহাউল্লা' কৃতকার্য্য হইবেন কিরূপে? প্রাচীন ধর্ম্মসমূহ যেমতে কলুষগ্রস্ত হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ে, উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, বাহাই ধর্ম্ম কি সেই একই পরিণতিতে পর্য্যবসিত হইবে না? চল আমরা দেখি,—বাহাই উপদেশাবলী এই প্রশ্নগুলির এবং তদ্রূপ অপর প্রশ্নসমূহের কি উত্তর দে'।

মানব-প্রকৃতি কি পরিবর্ত্তনীয়?

মানব-প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এই বিশ্বাসের উপরেই শিক্ষা ও ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবিকপক্ষে, প্রত্যেক সজীব বস্তু যে প্রতি মুহুর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা কোনো প্রকার গবেষণা না করিয়াও সহজে বুঝিতে পারা যায়। পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর ভিন্ন কোনো জীবনই সম্ভবপর হইতে পারে না, এমন কি, খনিজ পদার্থগুলিও পরিবর্ত্তনের হাত ছাড়া নহে। উচ্চ স্তরের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাদের রূপান্তর ও পরিবর্ত্তন অতি জটিল ও অদ্ভুত। অধিকন্তু, সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তুর ক্রমোন্নতি ও ক্রম-বৃদ্ধি লক্ষ্য করিলে, আমরা দুই প্রকারের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। কতকগুলি জীবের পরিবর্ত্তন এত ধীরে ধীরে হয় যে অনেক সময় তাহা অনুভব করা যায় না; আর কতকগুলি জীবের পরিবর্ত্তন খুব দ্রুত, আকস্মিক, এবং বিরাট আড়ম্বর সহকারে হইয়া থাকে; শেষোক্ত প্রকারের পরিবর্ত্তন ঐ সময়ে ঘটিয়া থাকে, যাহাকে ক্রম-বিকাশের "বিষম সময়" বলা হয়। ধাতু উত্তপ্ত করিলে যখন উহা গলিয়া তরল পদার্থে অথবা বাষ্পে পরিণত হয়, তখনই ধাতব জীবনে সেই বিষম সময়ের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার সময় অথবা অঙ্কুর বিকশিত হইয়া পত্রে পরিণত হওয়ার সময়ে উদ্ভিজ্জীবনে ঐ আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যখন কীট প্রজাপতিতে পরিণত হয়, মুরগী-শাবক ডিম ফুটিয়া বাহির হয়, কি মানব-শিশু মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হয়, প্রাণী জীবনে তখনই সেই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সময়। আত্মার উন্নততর জীবনে মানব যখন নবজীবন লাভ করে, তখন তাহার সঙ্কল্পের, তাহার চরিত্রের, তাহার জীবনের কার্য্যধারার আমূল

পরিবর্ত্তন ঘটে,—তখনই আমরা তাহার মধ্যে ঐরূপ রূপান্তর দেখিতে পাই। বসন্তের সমাগম হইলে, যখন উদ্ভিজ্জগতে নূতন প্রাণের সাড়া জাগে, তখন সর্ব্ব-প্রকারের গাছ-গাছড়ায় ঐ বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

বাহাউল্লা' বলিতেছেন, যেমন অল্প-জীবন-বিশিষ্ট পদার্থ সমূহের নূতন ও পূর্ণতর জীবনে অতিক্রান্ত হওয়ার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইরূপ মানবজাতিরও জীবনের "বিষম সময়"—পুনর্জ্জন্ম লাভের মাহেন্দ্রক্ষণ নিকটবর্ত্তী। এই পুনর্জ্জন্ম লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসের আরম্ভ হইতে যে জীবন-ধারা চলিয়া আসিয়াছে, তাহা সত্বর পরিবর্ত্তিত হইবে, সেই পুরাতন জীবন-ধারা আর পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইবে না। কীট ও প্রজাপতির মধ্যে, ডিম্ব ও পক্ষীর মধ্যে যে পার্থক্য, মানবের পুরাতন ও নূতন জীবনের মধ্যে সেই প্রকারেরই পার্থক্য হইবে। সমগ্র মানবজাতি নব "প্রকাশ"এর আলোকে সত্যের নূতন দর্শন লাভ করিবে। সূর্য্যোদয়ে সমগ্র দেশ আলোকিত হয়; এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, এখন মানুষ সেখানে সব কিছু দেখিতে পায়। আব্‌দুল্‌বাহা বলিয়াছেন:—

"ইহাই মানবীয় শক্তির নব-যুগ। পৃথিবীর দিগমণ্ডলসমূহ আলোকিত হইতেছে; নিঃসন্দেহ যে এই পৃথিবী স্বর্গের নন্দনকাননে অর্থাৎ 'রীজওয়াণ'এ পরিণত হইবে।"

প্রকৃতির সমস্ত রূপ এইরূপ মতেরই সমর্থন করিতেছে; পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারগণ এক বাক্যে এইরূপ প্রভাময় যুগাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। যুগ-লক্ষণ দেখিয়াও স্পষ্ট বুঝা যায় যে মানুষের চিন্তা ধারায় এবং সর্ব্বপ্রকার বিষয়কর্ম্মে এই গভীর বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন এখনও অনবরত চলিতেছে। সুতরাং, দুঃখবাদীগণ যে বলিয়া থাকেন,

যদিও অন্য সমস্ত বস্তুর রূপান্তর হইতে পারে কিন্তু মানবপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না, ইহা হইতে অধিক অসার ও ভিত্তীহীন যুক্তি আর কি হইতে পারে ?

ঐক্যের প্রথম সোপান

বাহাউল্লা' ধর্ম্মসমূহের ঐক্যস্থাপনের জন্য একান্ত সহিষ্ণুতা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সুন্দর মনোবৃত্তিগুলি চর্চ্চা করিতে এবং সরল আনন্দসহকারে সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের সঙ্গে মিলিতে মিশিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি "প্রতিজ্ঞা-পুস্তক"এ বলিতেছেন :—

"তিনি (ঈশ্বর) তাঁহার গ্রন্থ (কিতাবুল-আক্‌দাস্)এ বিবাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন ; তাঁহার বিরাট প্রকাশের দিনে ইহাই তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় আদেশ,—ইহাকে তিনি তাঁহার সমর্থনের সাজে বিশোভিত করিয়াছেন।

"হে পৃথিবীর লোকগণ! ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রেম ও একতার জন্য। ইহাকে শত্রুতা ও যুদ্ধ বিগ্রহের হেতু করিও না। * * * আমি আশা করি, 'বাহা'র লোকগণ—'বল, সকল বস্তুই ঈশ্বরের'—এই পবিত্র বাক্যে চিত্ত-নিবদ্ধ করিয়া থাকিবে,—ইহাই সেই প্রভাময় বাক্য, যাহা দ্বেষ, হিংসার অনলকে জলের ন্যায় নির্ব্বাপিত করে——যাহা সকলের বক্ষোস্থলে এবং হৃদয়াভ্যন্তরে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। একমাত্র এই বাক্যের শক্তির দ্বারাই জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রকৃত একতার আলোক প্রাপ্ত হইবে। নিশ্চয়ই, ঈশ্বর সত্য বলিতেছেন এবং সত্য-পথ প্রদর্শন করিতেছেন,—তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের অধিকারী।

আব্‌দুল্‌বাহা বলিতেছেন :—

"সকলে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার পরিত্যাগ করিবে, পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মায়তনে, গির্জ্জায়, মস্‌জিদে, মন্দিরে গমন করিবে, কারণ, এই সমস্ত স্থানে ঈশ্বরের পুণ্য নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাঁহারই পূজা হইয়া থাকে। যেখানে সকলে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার নিমিত্ত সমাগত হইয়া থাকে, সেখানে ভেদ-বুদ্ধি কেন থাকিবে? তাহাদের কেহই ত শয়তানের উপাসনা করে না। মুসলমানগণ খৃষ্টানের গির্জ্জায় যাইবে, য়িহুদীদের ধর্ম্ম-মন্দিরে যাইবে, এবং অপরপক্ষে অন্য সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীগণও মুসলমানের মস্‌জিদে যাইবে। তাহারা পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, কেবলমাত্র ভিত্তীশূন্য কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা প্রণোদিত হইয়া। আমেরিকায় থাকিবার কালে আমি য়িহুদীদিগের ধর্ম্ম-মন্দিরে গিয়াছিলাম। উহা খৃষ্টানদিগের গির্জ্জা সদৃশ। আমি দেখিলাম, এই সমস্ত স্থানে তাহারা ঈশ্বরেরই উপাসনা করিয়া থাকে।

"ঈশ্বরের ধর্ম্মসমূহের মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি এই সকল স্থানে বক্তৃতা দিয়াছিলাম, ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ এবং তাঁহার পবিত্র প্রকাশগণের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। আমি তাহাদিগকে তাহাদের অন্ধ-অনুকরণ-অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। সেইরূপ সকল ধর্ম্মের নেতাগণ পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্ম-মন্দিরে গমন করিবেন, ধর্ম্মের ভিত্তি এবং ভিত্তীভূত নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিবেন, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করিয়া একান্ত প্রেম ও মৈত্রী সহকারে পরস্পরের ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন।"—(পশ্চিমের তারকা, ৯ম খণ্ড, নং৩, পৃঃ ৩৭)

যদি ঐক্য স্থাপনের নিমিত্ত শুধু এই প্রাথমিক উপায়গুলি অবলম্বন করা হইত এবং প্রেম ও মৈত্রী সহকারে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের

মধ্যে পরস্পর সহনশীলতা প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইত! সে যাহা হউক, প্রকৃত একতা লাভ করিতে হইলে, ইহা অপেক্ষা আরও অধিক কিছুর প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। পরস্পর সহনশীলতা সাম্প্রদায়িক রোগ-নিবারক ঔষধ বটে, কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ রোগমুক্তি হয় না, ইহাতে রোগের কারণ বিদূরিত হয় না।

প্রধানতন্ত্রের সমস্যা

নানা বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অতীত যুগে মিলিত হইতে পারে নাই, তাহার কারণ এই যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভক্তগণ তাহাদের আপন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাকে একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া এবং তাঁহার প্রদত্ত বিধি-নিষেধকে একমাত্র স্বর্গীয় বিধান বলিয়া মনে করিত। সুতরাং, যে কোনো নূতন অবতার ঈশ্বরের নব-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেন, তাঁহাকে সত্যের শত্রু বলিয়া বিবেচনা করা হইত; তাদৃশ কারণে প্রত্যেক ধর্ম্মে নানা বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক উপসম্প্রদায়ের ভক্তগণ কোনো একজন শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ব্যক্তিকে কি কোনো একজন সাধুপুরুষকে মানিয়া লইয়াছে, ধর্ম্মের আদি-প্রবর্ত্তকের কোনো বিশেষ বাক্য বা ব্যাখ্যাকে নিজেদের জন্য বিশ্বাসের ভিত্তি করিয়া লইয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে পথ-ভ্রান্ত, ধর্ম্মদ্রোহী বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং, যতদিন পর্য্যন্ত অবস্থার গতিক এই রূপ থাকিবে, ততদিন কোনো প্রকৃত একতা সম্ভবপর হইতে পারে না।

অপরপক্ষে, বাহাউল্লা' বলিতেছেন, সকল অবতারই ঈশ্বরের পুণ্যবাণী লইয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই মানবকুলকে যুগোপযোগী প্রকৃষ্ট শিক্ষা দান করিয়াছিলেন এবং এইরূপ

শিক্ষাও দিয়াছিলেন যে তাহারা যেন পরবর্ত্তী অবতারগণের উপদেশ গ্রহণে সক্ষম হইতে পারে। তিনি কোনো অবতারেরই প্রত্যাদেশবাণী অস্বীকার করিতে বলেন নাই, বরং সকল অবতারের প্রত্যাদেশবাণী অঙ্গীকার করিতে বারম্বার জোর দিয়া বলিয়াছেন। তিনি এই কথাও বলিতেছেন যে অবতারগণের উপদেশাবলী মূলতঃ এক ও অভিন্ন—তাহা সমগ্র মানব-জাতির ঐক্য ও উন্নতির বিরাট পরিকল্পনার অংশস্বরূপ। প্রত্যেক ধর্ম্মের অনুগামীগণের কর্ত্তব্য, মানবজাতির সেই ঐক্য সংস্থাপনের জন্য তাহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া তাহাদের 'আপন আপন অবতারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা,—যাহার জন্য অবতারগণের প্রত্যেকেই এত দুঃখকষ্ট, নির্য্যাতন, অপমান সহ্য করিয়াছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকটে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি জগতের বর্ত্তমান অবস্থা এমন একটি রোগীর অবস্থার সহিত তুলিত করিয়াছিলেন, যাহার রোগ অনিপুণ চিকিৎসকের দরুণ উপশমিত না হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, কিরূপে এই রোগের প্রতিবিধান করা যাইতে পারে:—

"একান্ত পূর্ণ প্রতিকার এবং স্বাস্থ্যকর ঔষধ যাহা ঈশ্বর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা এই যে জগৎবাসী সকলে একই ধর্ম্ম, একই বিধানের ছায়াধীনে একতাবদ্ধ হইবে; কিন্তু এক পারদর্শী, পূর্ণ প্রেরণাপ্রাপ্ত চিকিৎসকের মধ্যস্থতায় ব্যতীত তাহা সঙ্ঘটিত হইতে পারে না। আমার জীবনের দিব্য করিয়া বলিতেছি,—ইহা সত্যই সত্য, ইহা ব্যতীত অপর সমস্তই সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। যখনি সেই মহা-পরাক্রমশালী 'অবলম্বন' পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং যখনি সেই পরম-আলোক তাঁহার প্রাচীন মহিমা ও ঐশ্বর্য্যের সহিত সমুদিত হইয়াছেন, তখন তখনই ঐ সমস্ত লোক যাহারা পৃথিবীর চিকিৎসক

বলিয়া দাবী করিত, তাহারা পৃথিবী ও তাঁহার মধ্যে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর স্বাস্থ্যলাভে প্রতিবন্ধক জন্মাইতেছে।"

ক্রমশঃ প্রকাশমান্ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশবার্ত্তা

ধর্ম্মের একতার পথে একটি মহা-অন্তরায় এই যে অবতারগণ যুগে যুগে যে বাণী ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিস্তর অনৈক্য বিদ্যমান,—একজন যাহা করিতে আদেশ করিতেছেন, অপর একজন তাহা করিতে নিষেধ করিতেছেন; তাঁহারা উভয়ে কিরূপে সত্য হইতে পারেন, এবং কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে তাঁহারা উভয়েই ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন? নিশ্চয়ই সত্য বস্তু এক, তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। সত্য বটে, অখণ্ড পরম-সত্য এক, তাহার পরিবর্ত্তন নাই; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে অখণ্ড পরম-সত্য, মানবের বর্ত্তমান ধারণা-শক্তির অতীত, এবং সেই সত্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য। আমাদের পূর্ব্বতন অপূর্ণ ধারণা,—ঈশ্বরের কৃপায়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই অধিকতর পূর্ণ ধারণায় পরিবর্ত্তিত হইবে। বাহাউল্লা' পারস্যের বাহাইদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—

"হে লোকগণ! ঔচিত্য অনুযায়ী ঈশ্বরের বাণী অবতীর্ণ হইয়া থাকে, যেন প্রাথমিক শিক্ষার্থীগণ উন্নতি করিতে পারে। দুগ্ধ মাত্রা-পরিমাণ দেওয়া হইয়া থাকে, যেন মর্ত্ত্য-শিশু ঐশ্বর্য্যের রাজ্যে এবং একত্বের বিরাট প্রাঙ্গনে প্রবেশ-অধিকার লাভ করিতে পারে।"

দুগ্ধই শিশুকে শক্তিমান্ করে, যাহাতে সে পরবর্ত্তীকালে অপেক্ষাকৃত কঠিন খাদ্য পরিপাক করিতে পারে। যেহেতু কোনো এক অবতার এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে, এক নির্দ্দিষ্ট উপদেশ-বাণী প্রদান করিয়া সত্য হইয়াছেন, সুতরাং অপর এক অবতার, ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন উপদেশ প্রদান করায় অসত্য হইবে,—এইরূপ বলা অর্থে এই কথা বুঝায় যে, যেহেতু দুগ্ধই সদ্যজাত শিশুর জন্য অতি উত্তম খাদ্য, সেই কারণে বয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যও দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কিছু হওয়া উচিত হইবে না এবং তাহাকে যে কোনো অপর খাদ্য দেওয়া হইবে, তাহা অন্যায় হইবে। আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন ঃ—

"প্রত্যেক প্রত্যাদেশ-বার্ত্তা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ অত্যাবশ্যকীয় এবং অমর জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহাতে ঐশ্বরিক সত্য সমূহের এবং অত্যাবশ্যকীয় তথ্যগুলির ব্যাখ্যা থাকে। ইহা ঈশ্বরের প্রেমের প্রকাশ। সকল ধর্ম্মে ইহা একই, ইহা চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনীয়। দ্বিতীয় অংশ শাশ্বত বা অপরিবর্ত্তনশীল নহে, ইহাতে প্রাত্যহিক কর্ম্মজীবনের সম্বন্ধে বিধিনিষেধ থাকে, ইহাতে দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের কথা থাকে। ইহা মানবের ক্রম-বিবর্ত্তনের নিয়মানুযায়ী এবং প্রত্যেক অবতারের যুগ অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে * * * মুসার সময়ে সামান্য চৌর্য্যাপরাধে চোরের হস্তচ্ছেদন করিয়া শাস্তি দেওয়া হইত ; সেই সময় প্রতিশোধমূলক আইনের ব্যবস্থা ছিল; অর্থাৎ চক্ষু নষ্ট করার অপরাধে অপরাধীর চক্ষু নষ্ট করিয়া, দন্ত নষ্ট করার অপরাধে দন্ত নষ্ট করিয়া, শাস্তি দেওয়া হইত। কিন্তু যীশুখৃষ্টের যুগে ঐরূপ শাস্তির প্রয়োজনীয়তা ছিল না বলিয়া সে নিয়ম অচল বলিয়া ঘোষিত করা হইয়াছিল। তদ্রূপ, সেই যুগে বিবাহের কোনো সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না, বিবাহ-বিচ্ছেদের

প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল, সুতরাং যীশু বিবাহ-বিচ্ছেদ নিষেধ করিলেন।

"হজরত মুসা ঈশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে চরমদণ্ডসম্বন্ধে দশটি 'আদেশবাণী প্রচারিত করেন। সেই সময় জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এবং তাহার নিরাপত্তা সংরক্ষণার্থে ঐ সমস্ত কঠোর শাসন-প্রণালী অবলম্বন করা ব্যতীত অত্যন্তর ছিল না, কারণ য়িস্রায়েলের সন্তানগণ 'ত্বা'এর মরুভূমিতে বাস করিত, সেখানে কোনো বিচারালয় কি কোনো জেলখানা ছিল না। কিন্তু যীশুখৃষ্টের যুগে ঐরূপ শাসন-প্রণালীর আবশ্যকতা ছিল না বলিয়া তাহা বাতিল করা হইয়াছিল। ধর্ম্মের এই দ্বিতীয় অংশের ইতিহাস বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে, কারণ তাহাতে মাত্র এই পার্থিব জীবনের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের ধর্ম্মের মূল-ভিত্তি এক ও অভিন্ন; বাহাউল্লা' সেই ভিত্তিরই পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।"—(স্বর্গীয় দর্শন, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৪৬)

ঈশ্বরের ধর্ম্ম এক ও অভিন্ন, অবতারগণের প্রত্যেকেই এই শিক্ষা দিয়াছেন; কিন্তু ইহা একটি জীবন্ত, ক্রম-বর্দ্ধমান্ বস্তু, জীবন্মৃত কি অপরিবর্ত্তনীয় নহে। মুসার উপদেশ যেন একটি মুকুলের ন্যায়, যীশুর উপদেশ যেন পুষ্প সদৃশ, বাহাউল্লার উপদেশ যেন ফল সরূপ। পুষ্প মুকুলকে নষ্ট করে না, ফল পুষ্পকে ধ্বংস করে না, তাহারা পরস্পরকে বিনাশ করে না, বরং পরস্পর পরস্পরের পূর্ণতা সম্পাদন করে। মুকুলের শল্ক ঝড়িয়া পড়িবে, পুষ্প যেন প্রস্ফুটিত হইতে পারে, পুষ্পের পাপড়ি পড়িয়া যাইবে, ফল যেন বর্দ্ধিত ও পরিপক্ব হইতে পারে। মুকুল শল্ক ও পুষ্পের পাপড়ি কি অনাবশ্যক অকেজো বস্তু ছিল যে তাহারা পরিত্যক্ত হইয়াছে? না, কখনই তাহা নহে, তাহারা প্রত্যেকেই

তাহাদের আপন আপন সময়ে উপযুক্ত ও আবশ্যকীয় বস্তু ছিল, তাহাদের সাহায্য ও সহায়তা ছাড়া ফলের জন্ম-সম্ভাবনাও ছিল না। অবতারগণের উপদেশাবলী সম্বন্ধে এই একই উপমা প্রযোজ্য। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত বাহ্য অনুষ্ঠানাদি যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মের পরিণতি, তাহারা পৃথক নহে, তাহাদের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নাই, তাহারা সেই একই ধর্ম্মের জীবন-ইতিহাসের বিভিন্ন মঞ্চ মাত্র। সেই একই ধর্ম্মকে পর্য্যায়ক্রমে বীজ, মুকুল এবং পুষ্পরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে; এখন তাহার ফলোৎপাদনের সময় উপস্থিত।

অবতারগণের প্রমাণীত্যতা

বাহাউল্লা' বলেন, প্রত্যেক অবতারকে তাঁহার অবতারত্ব সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট প্রমাণাদি দেওয়া হইয়া থাকে। প্রত্যেক অবতার মানবের নিকট হইতে আজ্ঞানুবর্ত্তীতা দাবী করিতে পারেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীর আদেশ-উপদেশ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন করিবার ক্ষমতা রাখেন। বাহাউল্লা' ঈকান গ্রন্থে বলিতেছেন:—

"ইহা সেই পরমউদার পুরুষ ঈশ্বরের ঔদার্য্য হইতে অনেক দূরে এবং তাঁহার করুণার প্রাচুর্য্য হইতে অনেক ব্যবধানে,—তিনি তাঁহার প্রাণীকুলের পথ-প্রদর্শকরূপে তাঁহার ভৃত্যগণের মধ্য হইতে একজনকে নির্ব্বাচিত করিবেন, তাহাকে যথেষ্ট পরিপূর্ণ প্রমাণাদি না দিয়া এবং তাহাকে বিশ্বাস না করার দরুণ তাঁহার জনগণকে শাস্তি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়া। না, তাহা কখনই নহে; বরং, অস্তিত্বের প্রভুর বদান্যতা তাঁহার আপন প্রকাশের মধ্যস্থতায় সমগ্র জগৎ-সংসারকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।"

"ঈশ্বরের প্রত্যেক অবতারের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, পৃথিবীর সর্ব্বত্র, প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্যরূপে, বাহ্যিক কি আভ্যন্তরিক ভাবে রূপান্তর ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত করা। কারণ, যদি পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটে, ঈশ্বরের সার্ব্বজনীন প্রকাশগণের আবির্ভাব নিরর্থক হইবে।"

একমাত্র ঈশ্বরই ভ্রমাতীত, এবং তাঁহার অবতারগণও ভ্রমাতীত হইয়া থাকেন, কেননা তাঁহাদের বাণীই ঈশ্বরের বাণী—যাহা তাঁহাদের মাঝ দিয়া জনসমাজে বিতরিত হয়। এই বাণী ঐ সময় পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হইয়া থাকে, যেই পর্য্যন্ত ঐ একই অবতার কি পরবর্ত্তী অবতার কর্ত্তৃক অপর বাণীর দ্বারা তাহা বাতিল করা না হয়।

ঈশ্বরই সেই সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসক, যিনি জগতের প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিয়া তাহার উচিৎ প্রতিকারের ব্যবস্থা দিতে পারেন। এক যুগের উচিৎ ব্যবস্থা পরবর্ত্তী যুগের উপযোগী হয় না, কারণ রোগীর অবস্থা তখন বিভিন্ন। চিকিৎসক যখন নূতন ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন এবং আমরা যদি পুরাতন ব্যবস্থার আঁকড়াইয়া থাকি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, চিকিৎসকের উপর আমাদের আদৌ কোনো আস্থা নাই, আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করি না।

য়িহুদীদিগের প্রাণে আঘাত লাগিতে পারে, যদি বলা হয় যে তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হজরত মুসা জগতের ব্যাধি দূরীকরণার্থে যে ঔষধের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাহার কোনো কোনোটি এখন সেকেলে ও অনুপযোগী। খৃষ্টিয়ানগণও সমভাবে ভীষণ মর্ম্মাহত হইতে পারেন, যদি বলা হয় যে যীশুর ব্যবস্থায় মোহাম্মদের সংযোগ করিবার ছিল, আবশ্যকীয়, মূল্যবান কিছু। তদ্রূপ মুসলমানগণও ব্যথিত হইতে পারেন, যদি বলা হয় যে বা'ব এবং বাহাউল্লা'র অধিকার ছিল, হজরত মোহাম্মদের আদেশ পরিবর্ত্তন করিবার। কিন্তু, বাহাই মতানুসারে

প্রকৃত ঈশ্বর-আরাধনা অর্থে ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রকাশ অর্থাৎ অবতার-গণের প্রতি ভক্তিমান হওয়া এবং বর্ত্তমান যুগ-অবতারের মাঝ দিয়া ঈশ্বরের প্রদত্ত আদেশাবলী অবিচলিত চিত্তে পালন করা। একমাত্র এইরূপ ভক্তির দ্বারাই প্রকৃত একতা সাধিত হইতে পারে।

ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার

অন্যান্য অবতারগণের ন্যায় বাহাউল্লা'ও সুস্পষ্ট বিশদ ভাষায় তাঁহার নিজ দাবীর বর্ণনা দিয়াছেন। খৃষ্টীয়াণদিগের উদ্দেশে লিখিত "লাওহে-আক্দাস্"এ তিনি বলিয়াছেনঃ—

"নিশ্চয়ই, পিতা আসিয়াছেন এবং যাহা কিছু ঈশ্বরের রাজ্যে তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহাই সেই 'বাক্য', যাহা পুত্র লুকাইয়াছিল,—যখন সে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ জনমণ্ডলীকে বলিয়াছিল যে, সে সময় তাহারা তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু যখন নির্দ্দিষ্ট সময় সমাপ্ত হইল এবং সেই ঘণ্টা সমুপস্থিত হইল, 'আদেশের' দিগমণ্ডল হইতে ঐ 'বাক্য' দীপ্তিমান হইয়া উঠিল। সাবধান, হে পুত্রের জনমণ্ডলী (অর্থাৎ খৃষ্টীয়াণগণ)! ইহাকে উপেক্ষা করিও না, বরং জড়িয়া ধর। ইহা তোমাদের নিকটে যাহা কিছু আছে, তাহা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। * * * নিশ্চয়ই, সত্যের মূর্ত্তিমান আত্মা সমুপস্থিত হইয়াছেন, তোমাদিগকে সত্য-পথে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত। নিশ্চয়ই, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা আপনা হইতে নহে, কিন্তু সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের সন্নিধান হইতে। তিনিই সেই বিরাট পুরুষ, পুত্র যাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছে। * * * হে পৃথিবীর লোকগণ! তোমরা যাহা কিছু লইয়া বসিয়াছ,

তাহা সমস্তই পরিত্যাগ কর এবং সেই শক্তিধর প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ঈশ্বর তোমাদের জন্য যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ ক'র।"

আদ্রিয়ানোপলে থাকিবার কালে, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পোপের ফলক-লিপিতে তিনি বলিতেছেন:—

"সাবধান, যেন প্রশংসা-কীর্ত্তন প্রশংসিত পুরুষের দিকে তোমাদের গতি-পথ রুদ্ধ না করে এবং পূজা, আরাধনা পূজিত পুরুষের দিকে! সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরম-প্রভুকে নিরীক্ষণ ক'র! তিনি আসিয়াছেন পৃথিবীকে সঞ্জীবিত এবং তাহার অধিবাসীবৃন্দকে একত্র করিবার নিমিত্ত। হে জনমণ্ডলী, চল প্রকাশের উদয়গিরিতে। বিলম্ব করিও না, এমন কি, এক মুহূর্ত্তের জন্যও অপেক্ষা করিও না। তোমরা কি গস্‌পেলের জ্ঞানে পণ্ডিত, অথচ প্রভাময় প্রভুর দর্শনলাভে অসমর্থ?"

"হে পণ্ডিতমণ্ডলী! ইহা তোমাদিগকে সাজে না। বল দেখি, যদি তোমরা এই প্রত্যাদেশবাণী গ্রহণ না কর, তবে কোন্ প্রমাণের বলে তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর? তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর * * *।"

যেমন এই সমস্ত ফলকলিপির মধ্য দিয়া খৃষ্টানদিগের নিকটে গস্‌পেলের প্রতিশ্রুতির সমাপন ঘোষণা করা হইয়াছে, তদ্রূপ মুসলমান, য়িহুদী, জোরোয়াষ্ট্রীয়ান এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের নিকটেও তাহাদের পবিত্র গ্রন্থের প্রতিশ্রুতির সমাপন ঘোষণা করা হইয়াছে। তিনি মানবকুলকে ঈশ্বরের মেষকুল বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, যাহারা এখন পর্য্যন্ত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন মেষশালায় আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি বলিতেছেন, তাঁহার বাণীই সর্ব্বশক্তিমান্ "ঈশ্বরের রব", তিনিই সেই "উত্তম মেষপালক", যিনি যুগের শেষে আসিয়াছেন, তাঁহার ছিন্নভিন্ন মেষকুলের মধ্য হইতে সর্ব্বপ্রকারের বাধা-অবরোধ

অপসারিত করিয়া তাহাদিগকে একই মেষশালায় একত্র করিতে,—"যেন একমাত্র এক মেষপাল এবং তাহার রক্ষকও এক হয়"।

জাগতিক অবস্থার নবরূপ-ধারণ

অবতারগণের মধ্যে বাহাউল্লা'র স্থান অনন্যসাধারণ এবং অভূতপূর্ব্ব, কারণ যে যুগে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন তাহা অচিন্তিতপূর্ব্ব, অনন্যসাধারণ ও বিস্ময়কর। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, শিল্প এবং সভ্যতার ক্রম-বিকাশের বিচিত্র কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া পৃথিবী একতার উপদেশ গ্রহণের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যে সমস্ত বাধা-বিঘ্নের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের দরুণ বিশ্বের একতা অসম্ভব ছিল, বাহাউল্লা'র আবির্ভাব সময়ে তাহা সমস্তই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; এবং তাঁহার জন্ম ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে, বিশেষভাবে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের আরম্ভকাল হইতে ঐ সমস্ত বাধা-বিঘ্ন এক বিস্ময়কর প্রণালীতে বিদূরিত হইতেছে। তাহার কারণ যাহাই হউক না কেন, কিন্তু ঘটনা সম্বন্ধে কাহারো কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারগণের সমসাময়িক যুগে মাত্র ভৌগোলিক বাধাতেই বিশ্বের ঐক্য সম্পাদন অসম্ভব ছিল। এখন সেই বাধা বিদূরিত হইয়াছে; মানব-ইতিহাসে ইহা সর্ব্ব-প্রথম ঘটনা, পৃথিবীর বিপরীত পৃষ্ঠের অধিবাসীগণের সহিত তাহারা অতি সহজে, যখন তখন কথোপকথন করিতে পারে। গতকল্য য়ুরোপে যাহা ঘটিয়াছে, অদ্য তাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র জানা হইতেছে এবং যে বক্তৃতা অদ্য আমেরিকায় দেওয়া হইল, কল্য তাহা য়ুরোপ, এসিয়া, এবং আফ্রিকাতে পঠিত হইতেছে।

দ্বিতীয় মহা অন্তরায় ছিল, ভাষার অনৈক্য। সৌভাগ্য যে বিদেশী ভাষা শিখিবার জন্য আগ্রহ সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে, অনেকে একাধিক ভাষা শিখিতেছে; এরূপে সে অন্তরায়ও কিয়দংশে দূরীভূত হইয়াছে; একটি আন্তর্জাতিক ভাষা জগতের সমস্ত বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত শীঘ্রই হইবে, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণও আছে। তখন ভাষার অন্তরায় সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইবে।

তৃতীয় মহা অন্তরায় ছিল, অন্ধ-সাম্প্রদায়িকতা-মূলক গোঁড়ামি এবং অন্য ধর্ম্মমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা। তাহাও বর্ত্তমান যুগে বিদূরিত হইতেছে। শিক্ষা প্রসার লাভ করিয়াছে, মানব-মনও ক্রমশঃ সহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় শিক্ষা এক্ষণে পুরোহিত-তন্ত্রের হস্তে ন্যস্ত নাই, শিক্ষার উদার নীতি অত্যন্ত রক্ষণশীল জনসাধারণের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এইরূপে প্রধান অবতারগণের মধ্যে একমাত্র বাহাউল্লা'র বাণীই অপেক্ষাকৃত অত্যল্প কালের মধ্যেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অনতিবিলম্বে তাঁহার প্রদত্ত উপদেশাবলী তাঁহার প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে অনূদিত হইয়া প্রত্যেক পাঠাভ্যস্ত নর-নারী ও বালকের অধিগত হইবে।

বাহাই ধর্ম্মের সম্পূর্ণতা

বাহাই ধর্ম্মকে তাহার প্রামাণিক গ্রন্থের সম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও তাহা পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। যীশু, মুসা, জোরোয়াষ্টার, বুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-গণের প্রতি যে সমস্ত বাণী নিশ্চিতরূপে আরোপিত হইতে পারে,

এবং যেগুলি লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সংখ্যায় অতি অল্প এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগের অত্যাবশ্যকীয় অনেক সমস্যার সমাধান করা হয় নাই। তাঁহাদের প্রতি যে সমস্ত বাণী সাধারণতঃ আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই অপ্রকৃত বলিয়া সন্দেহ হয় এবং কিয়দংশ যে পরবর্ত্তীকালে রচিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। মুসলমানগণ কোরাণে এবং নানা আচার-ব্যবহার, কিম্বদন্তী ও ইতিহাসে মোহাম্মদের জীবনী সম্বন্ধে এবং তাঁহার উপদেশাবলী সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু মোহাম্মদ ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইলেও স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন, তাঁহার প্রথম শিষ্যগণও তাঁহারই ন্যায় অক্ষর পরিচয়-বিহীন ছিলেন। মোহাম্মদের বাণী সংগ্রহ করিবার, লিপিবদ্ধ করিবার, প্রচারিত করিবার যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, অনেক দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক এবং তাঁহার সম্বন্ধে বিবিধ কিম্বদন্তীর সত্যতাও সন্দেহভাজন। ইহারই ফলে, পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মসমূহের ন্যায় ইসলাম ধর্ম্মেও নানাবিধ পরস্পর-বিরোধী মতবাদ এবং নানা ভাষ্য প্রচলিত হইয়াছে,—বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ে তাহা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অপরপক্ষে, বা'ব এবং বাহাউল্লার' প্রত্যাদেশ-বাণীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক,—যাহা বাগ্মিতায় ও হৃদয়গ্রাহিতায় অতুলনীয়। তাঁহারা উভয়েই তাঁহাদের ধর্ম্মঘোষণা করিবার পর হইতে কারাগারে অধিকাংশ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকাশ্য বক্তৃতা দিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহারা অধিকাংশ সময় লেখাতেই অতিবাহিত করিতেন। এই কারণে বাহাই ধর্ম্ম তাহার প্রামাণিক গ্রন্থে এত পরিপূর্ণ যে পূর্ব্ববর্ত্তী কোনো ধর্ম্মই ইহার সমকক্ষ হইতে পারে না। বাহাই গ্রন্থে অনেক সত্য-তথ্যের সুস্পষ্ট পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে,—যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মে মাত্র অস্পষ্টরূপে সূচিত হইয়াছিল। সত্যের শাশ্বত মৌলিক তথ্য—

যাহা সমস্ত অবতারগণ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান জগতে সমুপস্থিত সমস্ত জটিল সমস্যায় প্রয়োগ করা হইয়োছে,—যাহার অধিকাংশই পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারগণের যুগে উপস্থিত হইয়াছিল না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে প্রামাণিক গ্রন্থের এই পরিপূর্ণ লিপি ঐ সমস্ত প্রাচীন মতবাদ ও ভ্রান্ত-ধারণা—যাহা বিবিধ জাতিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বিদূরিত করিবার পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী ফল প্রদান করিবে।

বাহাই অঙ্গীকার

অপর এক দিক দিয়াও বাহাই ধর্ম্ম অভূতপূর্ব্ব ও অনন্য-সাধারণ। বাহাউল্লা' তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে বারম্বার এক অঙ্গীকার লিখিয়াছিলেন; ইহাতে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল্‌বাহাকে (যাঁহাকে তিনি প্রায় সময়ই "শাখা" কিম্বা "অতি বৃহৎ শাখা" নামে অভিহিত করিতেন) তাঁহার উপদেশাবলীর একমাত্র ব্যাখ্যাতারূপে নিযুক্ত করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে আব্দুল্‌বাহা তাঁহার বাক্যের যাহা ব্যাখ্যা বা অর্থ করিবেন তাহা বাহাইগণকে বাহাউল্লা'র নিজ বাণীর ন্যায় গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি তাঁহার শেষ-উপদেশ-বাণীতে বলিতেছেন:—

"আক্‌দাস্ গ্রন্থে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে তোমাদের চিত্ত নিবদ্ধ কর: 'যখন আমার উপস্থিতি-সাগরে ভাটা পড়িবে এবং যখন আমার উন্মেষলিপি সম্পূর্ণ হইবে, তখন তোমরা যাঁহাকে ঈশ্বর মানস করিয়াছেন তাঁহার দিকে ফিরিও,—যিনি এই প্রাচীন মূল হইতে উদ্ভূত।' এই পবিত্র শ্লোকে সেই অতি বৃহৎ শাখা সম্বন্ধেই উল্লেখ করা হইয়াছে।"

এবং "শাখার ফলকলিপি"তে তিনি আব্দুল্‌বাহার পদবী প্রকাশ করিতেছেন :—

"হে লোকগণ! তোমরা 'শাখা'র প্রকাশের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'র, কারণ ইহা তোমাদের প্রতি তাঁহার অপার করুণার এবং পূর্ণ আশীর্ব্বাদের সর্ব্বপ্রধান নিদর্শন এবং তাহাকে দিয়াই প্রত্যেক জীর্ণ অস্থিতে প্রাণ সঞ্চারিত করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি তাহার দিকে ফিরে, সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়াছে এবং যে ব্যক্তি তাহা হইতে মুখ ফিরাইবে সে আমার সৌন্দর্য্য হইতে মুখ ফিরাইয়াছে, আমার প্রমাণ অস্বীকার করিয়াছে এবং যাহারা পাপী তাহাদের মধ্যে হইয়াছে।"

বাহাউল্লা'র মৃত্যুর পর আব্দুল্‌বাহা তাঁহার নিজ আবাসে এবং তাঁহার সুদীর্ঘ য়ুরোপ পরিভ্রমণ কালে পৃথিবীর নানা অংশের নানা বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বীদের সহিত মিলিবার মিশিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের সর্ব্বপ্রকার অভাব-অভিযোগ শুনিয়াছিলেন, তাহাদের সকল কথার উত্তর দিয়াছিলেন,—যাহা সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া রক্ষা করা হইয়াছে। তিনি ক্রমাগত দীর্ঘ কয়েক বৎসরব্যাপী পবিত্র উপদেশাবলীর ব্যাখ্যা কার্য্যে এবং বর্ত্তমান জীবনের বিভিন্ন সমস্যায় তাহা প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়া দিবার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বিশ্বাসীগণের মধ্যে যাহা কিছু মতানৈক্য ঘটিত, তাঁহার নিকটে তাহা উপস্থিত করা হইত,—তিনি ক্ষমতাপন্নভাবে তাহা সমস্তই মীমাংসা করিয়া দিতেন। এইরূপে ভাবী মতানৈক্যের ভয়ও বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বাহাউল্লা' আরও বলিয়াছিলেন যে আব্দুল্‌বাহার মৃত্যুর পরে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য সমগ্র পৃথিবীর

বাহাইগণের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক সভা (বায়তুল্ আদ্ল্)এর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সভা বাহাই ধর্ম্মের যাবতীয় কার্য্যের ধারা এক অভিন্ন নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, বাহাই ধর্ম্মে কোনো প্রকারের ভেদ-বিভেদ, বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে দিবেন না, এবং যাহাতে পবিত্র উপদেশাবলীর কদর্থ না হইতে পারে তাহার প্রতি খর দৃষ্টি রাখিবেন এবং তাহাদের হেফাজত করিবেন। (১)

অধিকন্তু, বাহাউল্লা' সুস্পষ্ট ভাবে আরও নিষেধ করিলেন যে আব্দুল্‌বাহার জীবদ্দশায় আব্দুল্‌বাহা ব্যতীত এবং আব্দুল্‌বাহার তিরোভাবের পর ঐ আন্তর্জাতিক বায়তুল্-আদ্ল্ ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহার উপদেশবাণীর ব্যাখ্যা করিতে পারিবে না। তিনি আক্‌দাস্ গ্রন্থে বলিয়াছেন, পবিত্র শ্লোকের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য যাহা মূলের প্রাঞ্জল অর্থের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন নহে, তাহা কদাচ গ্রহণ করা হইবে না। "সহস্র সহস্র বৎসর" পরে বাহাউল্লা'র ছায়াধীনে আর একজন অবতার আবির্ভূত হইবেন—যিনি তাঁহার অবতারত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিবেন, কিন্তু তিনি যতদিন আবির্ভূত না হইবেন, ততদিন বাহাউল্লা' এবং আব্দুল্‌বাহার বাণী এবং আন্তর্জাতিক "বায়তুল্ আদ্ল্"এর বিচার-মীমাংসাই সেই ক্ষমতাপন্ন পথ-প্রদর্শক,—যাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকা প্রত্যেক বাহাইএর একান্ত কর্ত্তব্য। কোনো বাহাই-ই কল্পিত কোনো প্রত্যাদেশবাণীর কি কোনো উপদেশাবলীর কোনো বিশেষ অর্থ করিয়া, তাহাকে ভিত্তি করিয়া কোনো দল বা সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি এই সমস্ত আদেশ পালন না করে, বুঝিতে হইবে যে, সে "নাকীজ্", অর্থাৎ সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে।

---

(১) আন্তর্জাতিক "বায়তুল্ আদ্ল্" সম্বন্ধে এই পুস্তকের পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আব্‌দুল্‌বাহা বলিতেছেন :—

"সেই ব্যক্তিই বাহাই ধর্ম্মের অন্যতম শত্রু, যে বাহাউল্লা'র বাণী ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে, এবং নিজের সাধ্যমত আপন মানসিক বর্ণে রঞ্জিত অর্থ করে, নিজে একটি দল গড়িয়া তুলে, একটি স্বতন্ত্র উপসম্প্রদায় গঠন করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপিত করে এবং বাহাই ধর্ম্মে বিভেদ সৃষ্টি করে।"—(পশ্চিমের তারকা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮)

অপর এক ফলকলিপিতে তিনি বলিতেছেন :—

"এই সকল ব্যক্তি (সাম্প্রদায়িকতা-প্রবর্দ্ধকগণ) সমুদ্র পৃষ্ঠে ভাসমান্ ফেনার ন্যায়; 'অঙ্গীকার'এর মহাসাগর হইতে এক তরঙ্গ উঠিবে, যাহা 'আব্‌হা' রাজ্যের শক্তি সহকারে সেই ফেনাকে তটে নিক্ষেপ করিবে * * * এই সমস্ত বিকৃত চিন্তাধারা যাহা ব্যক্তিগত অসৎ সঙ্কল্প হইতে উদ্ভূত, তাহা সমস্তই বিস্মৃতি-লোক প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু ঈশ্বরের "অঙ্গীকার" স্থায়ী ও নিরাপদ্ থাকিবে।"—(পশ্চিমের তারকা, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৯৫)

যদি কেহ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে কোনো বস্তুই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকিতে বাধ্য করিতে পারে না। আব্‌দুল্‌বাহা বলিতেছেন : "ঈশ্বর নিজেও কোনো আত্মাকে আধ্যাত্মিক হইতে বাধ্য করেন না। মানবাত্মার স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজনীয়।" সে যাহা হউক, আধ্যাত্মিক অঙ্গীকারের দরুণ বাহাই ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা-সৃষ্টি কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

পুরোহিত-তন্ত্রের অভাব বা অনস্তিত্ব

বাহাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে ইহাতে স্বতন্ত্র কোনো পুরোহিত শ্রেণী নাই। শিক্ষকগণের ব্যয়

নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছাবশে দান করিতে পারা যায়, সে দান গ্রহণ করা হইয়া থাকে; অনেকে ইচ্ছা করিয়া সমস্ত সময় ব্যয়িত করিয়া প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন; কিন্তু অন্যান্য বাহাইগণ হইতে পৃথক কোনো বিশেষ পুরোহিত শ্রেণী নাই। পুরোহিতগণের সাধারণতঃ যেমন বিশেষ আচার-ব্যবহার, বিশেষ কার্য্যকলাপ, বিশেষ পুরস্কারলাভ প্রভৃতি থাকে, বাহাইদিগের মধ্যে কাহারো সেরূপ নাই। সকলেই সাধ্যমত, সুবিধামত ধর্ম্মপ্রচারে সহায়তা করিবে এবং ব্যক্তিগত ভাবে ধর্ম্মাচরণ করিবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে পুরোহিত-তন্ত্রের আবশ্যকতা ছিল, কারণ জনসমাজ অক্ষর-বিহীন, অশিক্ষিত ছিল,—ধর্ম্মোপদেশের জন্য, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ক্রিয়া-কলাপ এবং বিচার কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত পুরোহিতগণের উপর তাহাদের নির্ভর ছিল। সে যাহা হউক, এখন সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শিক্ষা সত্বর সার্ব্বজনীন হইতেছে, এবং বাহাউল্লা'র আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইলে, জগতের প্রত্যেক বালক-বালিকা অচিরে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ং পবিত্র গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া উৎস-মূল হইতে জীবন-বারি পান করিতে সক্ষম হইবে। বিরাট, জটিল অনুষ্ঠানাদি যাহা বিশেষ অভিজ্ঞ পুরোহিত-তন্ত্রের দ্বারা নির্ব্বাহিত করিতে হয়, বাহাই ধর্ম্মে তাহার কোনো স্থান নাই; এবং বিচার কার্য্য পরিচালন করিবার দায়িত্বভার, সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্মচারীবৃন্দের উপর ন্যস্ত।

একটি বালকের শিক্ষার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষকের লক্ষ্যের বিষয় এই যে, তাহার শিষ্যকে শিক্ষক ব্যতিরেকে চলিবার জন্য উপযুক্ত করা,—যাহাতে শিষ্য সকল বিষয় আপন কর্ণে শুনিতে পারে, আপন চক্ষে দেখিতে পারে এবং আপন হৃদয় দ্বারা হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারে। মানবজাতির বাল্যাবস্থায় পুরোহিতের আবশ্যকতা ছিল; কিন্তু পুরোহিতের প্রকৃত কার্য্য, পুরোহিত ব্যতিরেকে চলিবার জন্য মানুষকে উপযুক্ত করা,—যাহাতে মানুষ আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি আপন কর্ণে শুনিতে পারে, আপন চক্ষে দেখিতে পারে, আপন হৃদয় দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এখন পুরোহিতের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে, এবং বাহাই ধর্ম্মের লক্ষ্য এই যে, সেই কার্য্যের পূর্ণ পরিণতি সম্পাদন করা, ঈশ্বর ব্যতীত সকল বস্তু হইতে মানুষকে স্বাধীন করা,—যাহাতে তাহারা ঈশ্বরের প্রতি অর্থাৎ তাঁহার অবতারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া নিজ নিজেই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। যখন সকলে একই কেন্দ্রের দিকে ফিরিবে, তখন কোনো প্রকারের মত-ভেদ, মত-বিরোধ থাকিবে না, এবং তাহারা যতই কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে, ততই তাহারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ একতাবদ্ধ হইয়া যাইবে।

নবম অধ্যায়

প্রকৃত সভ্যতা

"হে ঈশ্বরের লোকগণ! তোমরা শুধু আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিও না; জগতের উন্নতি ও জাতিসমূহের সুশিক্ষার দিকে মনোযোগী হও।"—(বাহাউল্লা')

ধর্ম্মই সভ্যতার ভিত্তি

বাহাই মতানুসারে, মানবের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সমস্যাগুলি এরূপ দুরবগম্য যে সাধারণ মানব-বুদ্ধিতে তাহাদের সমাধান সম্ভবপর হয় না। একমাত্র সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই জানেন, সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্য কিরূপে সাধিত হইতে পারে। তিনি অবতারগণের মধ্য দিয়াই মানব-জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য এবং প্রগতির ঋজু-পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; এই কারণে অবতারগণের উপরে যে বাণী অবতীর্ণ হয়, তদনুসারে কার্য্য করার উপরে প্রকৃত সভ্যতা নির্ভর করে। "স্বর্গের বাণী"তে বাহাউল্লা' বলিতেছেন:—

"ধর্ম্মই জগতের শান্তি-শৃঙ্খলা এবং যাবতীয় জীব-জন্তুর নিরাপত্তা-বিধানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ধর্ম্মের স্তম্ভসমূহ নির্ব্বীর্য্য হওয়ার দরুণ

মূর্খ জনগণের স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে, তাহারা উদ্ধত ও দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি,—ধর্ম্মের মাহাত্ম্য যতই হ্রাস করা হইবে, দুর্ব্বৃত্তদের একগুঁয়েমি ততই অধিক বাড়িবে,—যাহার শেষফল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। * * * পাশ্চাত্য সভ্যতাকে নিরীক্ষণ কর, জগৎ-- জীবনে ইহা কিরূপ আন্দোলন-বিলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে! নারকীয় যন্ত্রসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে; মানবের জীবন নাশে এরূপ নৃশংসতা প্রদর্শন করা হইতেছে, যাহার স্বরূপ পৃথিবীর চক্ষে কখনও দেখে নাই, কর্ণেও শুনে নাই। কিন্তু, পৃথিবীর জাতিসমূহ কোনো একটি আদর্শ-বিষয়ে একমত না হইলে কিম্বা একই ধর্ম্মের ছায়াতলে একতাবদ্ধ না হইলে, এসমস্ত প্রচণ্ড পাপাচারের সংস্কার হইতে পারে না। *** হে 'বাহা'র লোকগণ! প্রত্যেক আদেশ-বাণী—যাহা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, জগতের রক্ষার নিমিত্ত তাহা সুরক্ষিত দুর্গস্বরূপ।"

য়ুরোপ এবং সমগ্র পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা উপরোক্ত বাণীরই সত্যতা প্রমাণ করিতেছে,—যাহা মাত্র অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অবতারগণের আদেশ অমান্য করার দরুণ এবং অধর্ম্মের প্রাবল্যের ফলে, অরাজকতা ও ধ্বংসের তাণ্ডব-ক্রীড়া ভীষণ-ভাবে চলিয়াছে: মানবের লক্ষ্য এবং তাহার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন—যাহা প্রকৃত ধর্ম্মের মুখ্য-উদ্দেশ্য, তাহা ব্যতীত সমাজ-সংস্কার নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে।

ন্যায়-বিচার

"নিহিত বাক্য" নামক একটি ছোট পুস্তকে, বাহাউল্লা' অবতার-গণের উপদেশাবলীর সারাংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন। সেখানে,

মানবের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম উপদেশ এই ঃ—

"উত্তম, বিশুদ্ধ ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হও।" অপরটি হইতেছে, প্রকৃত সামাজিক জীবনের ভিত্তীভূত নীতি নির্দ্দেশক; তিনি বলিতেছেন ঃ—

"আমার নিকট ন্যায়-বিচার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু। যদি আমাকে পাইতে চাও, তাহাকে উপেক্ষা করিও না। তুমি উহার সাহায্যে এমন এক শক্তি লাভ করিবে, যাহাতে তোমার স্বচক্ষে—অপরের চক্ষু ব্যতিরেকে সকল বস্তু দেখিতে পাইবে এবং সকল ব্যাপার অপরের জ্ঞান ব্যতিরেকে, স্বজ্ঞানে বুঝিতে পারিবে।"

সমাজ-জীবনের সর্ব্বপ্রধান আবশ্যকীয় বস্তু এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে মিথ্যা হইতে সত্যের, অন্যায় হইতে ন্যায়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিবার এবং যাবতীয় বস্তুর আপেক্ষিক যোগ্যতা বুঝিবার উপযুক্ত হইতে হইবে। স্বার্থপরতাই আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অন্ধতার সর্ব্ব-প্রধান কারণ এবং সমাজ-উন্নতির সর্ব্ব-প্রধান শত্রু। পারস্য দেশবাসী জোরোয়াষ্ট্রীয়ান বাহাইগণের এক ফলকলিপিতে বাহাউল্লা' বলিতেছেন ঃ—

"হে বুদ্ধির সন্তানগণ! সূক্ষ্ম অক্ষি আবরণ পৃথিবী ও তৎস্থিত সর্ব্ববস্তুর রূপ দেখিতে দেয় না। যখন লোভের আবরণ অন্তর্দৃষ্টি ঢাকিয়া ফেলে,, তখন ফল কী হয় ভাবিয়া দেখ! হে লোকগণ, লোভ-হিংসার তমোরাশি আত্মার আলোক ঐভাবে লুকাইয়া রাখে, মেঘ যেরূপ সূর্য্য-রশ্মিকে ঢাকিয়া থাকে।"

মানবের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এখন তাহাকে অবতারগণের এই শিক্ষার সত্যতা সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মাইতেছে যে স্বার্থ-প্রণোদিত চিন্তা ও কর্ম্ম অনিবার্য্যরূপে সামাজিক দুর্দ্দশা আনয়ন করে। যদি মানবজাতি নির্লজ্জের মরণ মরিতে না চাহে, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার

প্রতিবেশীর বিষয়গুলিকে তাহার নিজ বিষয়ের ন্যায় জ্ঞান করিবে এবং নিজের স্বার্থ সমগ্র মানবজাতির স্বার্থাধীন করিয়া রাখিবে। "স্বর্গের বাণী"তে বাহাউল্লা' বলিতেছেন ঃ—

"হে মানব-সন্তান! যদি তুমি ঈশ্বরের করুণার প্রার্থী হও, তবে কিসে তোমার হিত হইবে তাহার চিন্তায় ভাবিত হইও না, বরং সমগ্র মানবজাতির হিতসাধনার্থে আত্ম-নিয়োগ ক'র। যদি ন্যায়-বিচার পাইতে চাও, তবে নিজের জন্য যাহা নির্ব্বাচন কর, তাহাই অপরের জন্য নির্ব্বাচিত করিবে।"

রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি

বাহাউল্লা' সমাজ-শৃঙ্খলার ঐ সমস্ত মৌলিক নীতি, যাহা পরবর্ত্তী হাজার হাজার বৎসর ব্যাপী (ঈশ্বরের নূতন আদেশ লইয়া নূতন অবতার না আসা পর্য্যন্ত) প্রকৃত সভ্যতার ভিত্তি হইয়া থাকিবে, তাহার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু, তিনি সমাজ-জীবনের কার্য্যগুলিকে বিশেষ কোনো বিধি-নিষেধের নিয়মাধীন করিয়া রাখেন নাই। এক উন্নতিশীল সমাজে সময়ের আবশ্যকতা অনুসারে সর্ব্বপ্রকারের বিধি-নিষেধ নিয়তঃ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে; বাহাই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতাগণ যে নীতির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে এই আবশ্যকতা সম্বন্ধে সম্যক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। বাহাউল্লা' যদিও কোনো নির্দ্দিষ্ট রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতির নির্দ্দেশ দেন নাই, কিন্তু বলিতেছেন যে জাতীয় রাষ্ট্র-তন্ত্র যাহা "নিয়মানুবর্ত্তী রাজতন্ত্র" নামে পরিচিত তাহাই প্রকৃষ্টতম শাসন-প্রণালী। তিনি "আনন্দবার্ত্তা"তে বলিতেছেন ঃ—

"গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতিতে পৃথিবীর সমস্ত জন সাধারণের উপকার হয় সত্য, কিন্তু রাজ-তন্ত্রের ঐশ্বর্য্য গণতন্ত্রে থাকিতে পারে

না; রাজতন্ত্রের ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের অভিজ্ঞান স্বরূপ। পৃথিবীর সমস্ত দেশ রাজতন্ত্রের ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে। রাষ্ট্র-পরিচালকগণ যদি রাজ-তন্ত্র এবং গণ-তন্ত্র, উভয়বিধ শাসনতন্ত্র মিলিত করিয়া দেশ-শাসনে প্রয়োগ করে, ঈশ্বরের সমক্ষে তাহারা সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করিবে।"

কোনো এক উপলক্ষ্যে আব্‌দুল্‌বাহা এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন; এই লেখক সেই আলোচনার সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিল। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই:—

"স্বেচ্ছাতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমেরিকায় যেরূপ বৈরাজ্যমূলক শাসন-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে, তাহা সর্ব্বাংশেই শুভ, সন্দেহ নাই, কিন্তু নিয়মানুবর্ত্তী রাজতন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর শাসন-পদ্ধতি; কারণ, নিয়মানুবর্ত্তী রাজতন্ত্রে বৈরাজ্য এবং রাজ্য, উভয়েরই সদগুণগুলি একত্রিত হইয়া থাকে। মাত্র কয়েক বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্টের রাজকীয় ঐশ্বর্য্য এবং রাজকীয় প্রভাব থাকিতে পারে না। রাজত্ব একজন রাজা হইতে তাহার পুত্রে সংক্রামিত হইবে। ইহাতে রাজশাসন অবিচ্ছিন্ন এবং দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। শাসনতন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি যদি কয়েক বৎসর পরে পরে নির্ব্বাচিত হয়, তাহা হইলে প্রেসিডেণ্ট-নির্ব্বাচনের সময়ে সমস্ত দেশ নানারূপ রাষ্ট্রনৈতিক আবর্ত্তের মধ্যে পতিত হইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সমস্ত জনসাধারণ উচ্চকিত হইয়া আন্দোলনে যোগদান করে। দেশের এইরূপ অবস্থায় ন্যায়পরতা টিকিতে পারে না।

"প্রঃ—যদি রাজা অনুপযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হ'ন, তাহা হইলে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারা যাইবে কি না, ব্যবস্থাপক মহা-সভার সে ক্ষমতা আছে কি না?

"উঃ—ব্যবস্থাপক মহাসভা নিশ্চয়ই রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারে এবং নূতন একজন রাজা নিযুক্ত করিতে পারে। নিয়মানুবর্ত্তী রাজতন্ত্রে রাজার কোনো ব্যবস্থাপক ক্ষমতা নাই। সমস্ত ব্যাপারই মন্ত্রী পরিষদ্ এবং ব্যবস্থাপক সভা মিলিত হইয়া স্থির করে।

"প্রঃ—রাজত্ব যদি উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ হয়, তাহা হইলে উত্তরাধিকার-সূত্রে গঠিত অভিজাত-সম্প্রদায়ও থাকিবে কি?

"উঃ—যে ব্যক্তি তাহার দেশের সেবা বিশেষরূপে করে, তাহাকে উপযুক্ত সম্মাননা দ্বারা পুরস্কৃত করাই উচিত; কিন্তু কেবলমাত্র কোনো ব্যক্তির পিতা অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন বা দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া সেই ব্যক্তিকে সম্মাননা করা যাইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোনো ব্যক্তির পিতা যোদ্ধা, সেনাপতি ছিলেন বলিয়া সেই ব্যক্তিকে সম্মানে ভূষিত করা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি স্বয়ং জাতির কল্যাণসাধন না করে, তাহাকে কদাচ রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করিবে না। সে ব্যক্তির পিতার দেশ-সেবার কথা স্মরণ করিয়া সে ব্যক্তিকে সম্মান করা যাইতে পারে, কিন্তু মাত্র সেই কারণে তাহাকে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে না; রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, অন্যান্য সমস্ত পদ-প্রার্থীর মত তাহার নিজের কি কি গুণ আছে, দেখিতে হইবে।"

ন্যায়পরতা এবং নিরপেক্ষতা সহকারে শাসন-দণ্ড প্রযুক্ত করিতে হইবে; শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্যই আইন কানুনগুলি নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা। আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন ঃ—

"আইনের চক্ষে সমস্ত ব্যক্তিই তুল্য, আইনই প্রকৃত শাসনকর্ত্তা, সকলেই সমানভাবে আইনানুবর্ত্তী। * * * যখন প্রাচী ও প্রতীচীর সর্ব্বদেশে পূর্ণ ন্যায়পরতা, ন্যায়-বিচার প্রচলিত হইবে, তখন এই

মর্ত্ত্যজগৎ সুন্দর স্বর্গ-লোকে পরিণত হইবে, ঈশ্বরের সকল ভৃত্যের সম-মর্য্যাদা, সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে, মানবজাতির এক-সূত্রতার সুবর্ণ আদর্শ অর্থাৎ মানবজাতির প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব বাস্তবে পরিণত হইবে, সত্য-সূর্য্যের প্রভাময় আলোকে মানব-হৃদয় অত্যুজ্জ্বল হইবে।"—(প্যারিসে কথাবার্ত্তা, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৪৩)

রাষ্ট্র-নৈতিক স্বাধীনতা

বাহাউল্লা' বলেন, গণ-তান্ত্রিক বা প্রতিনিধি-নির্ব্বাচক শাসন-পদ্ধতি স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতীয় শাসন-তন্ত্রের পক্ষে আদর্শ প্রণালী এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী; কিন্তু বাহাউল্লা'র মতানুসারে জনসাধারণ ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দিক দিয়া উন্নত না হইলে, উক্তরূপ আদর্শ-শাসন-তন্ত্র সম্ভব হইতে পারে না। যেখানে জনসাধারণ অশিক্ষিত, যাহারা স্বার্থ-বুদ্ধি-প্রণোদিত, যাহারা দেশ-শাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকে পরিপূর্ণতম স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করা তাহাদিগকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া দেওয়ার নামান্তর মাত্র। যাহারা স্বাধীনতার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে জানে না, তাহাদিগকে স্বাধীন হইতে দেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। বাহাউল্লা' "আক্‌দাস্ গ্রন্থে" বলিতেছেন ঃ—

"আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, অনেক জাতি স্বাধীনতা যাচ্ঞা করে, স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত অহঙ্কারী, গর্ব্বিত হয়, কিন্তু নিতান্ত মূঢ়ের মত অজ্ঞানতার সাগরে মগ্ন রহিয়াছে। তাহাদের পক্ষে স্বাধীনতার ফল হয় মাত্র বিশৃঙ্খলা, এই বিশৃঙ্খলা-বহ্নি কিছুতেই নির্ব্বাপিত করা সম্ভব হয় না। এমতে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিষয়ের চরম-বিচারক প্রভু তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছেন। জানিয়া রাখ,—

পশুগণই পরিপূর্ণতম স্বাধীনতার অবতার। বিধি-নিষেধ মানিয়া চলা মানবের একান্ত কর্ত্তব্য,—যাহা তাহাকে নিজের অজ্ঞতা এবং বিশ্বাসঘাতকগণের অনিষ্ট-সাধন হইতে রক্ষা করে। একান্ত স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতার ফলে মানব সৌজন্য ও সম্মান-বোধ হারাইয়া ফেলে, মানব উদ্ধত, পাপাচারী হইয়া পড়ে। মানবকুলকে মেষকুলরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহাদের জন্য মেষপালকের স্থলাভিষিক্ত এক মহান্ প্রতিপালকের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আমি সত্যই বলিতেছি, ইহা সত্যই সত্য এবং সত্যের পরে ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই থাকিতে পারে না। আমরা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় স্বাধীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু সর্ব্ব-অবস্থায় তাহা অনুমোদন করি না। (তুমি) ব'ল ঃ আমার আদেশবাণী অনুসরণ করাই প্রকৃত স্বাধীনতার তাৎপর্য্য,—যদি তোমরা 'যাহারা জানে' তাহাদের মধ্যে হও! জনসাধারণ যদি আমাদের প্রকাশিত প্রত্যাদেশ-বাণী মানিয়া চলিবে, তাহা হইলেই তাহারা নিজেদের আত্মাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে দেখিতে পাইবে। * * * (তুমি) ব'ল ঃ একমাত্র সত্য ঈশ্বরের দাসত্বেই তোমাদের মঙ্গলপ্রদ স্বাধীনতা রহিয়াছে; যে ব্যক্তি তাহার আস্বাদ পাইয়াছে, সে তাহার বিনিময়ে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের রাজত্বও কামনা করিবে না।"

অন্ত্যজ জাতিদিগকে উন্নত করিতে হইলে তাহাদিগকে ঈশ্বরের পুণ্যবাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃষ্টতম উপায়। আর, যখন জনসাধারণ ও রাষ্ট্রনায়কগণ এই উপায় অবলম্বন করা শিখিয়া যাইবে, তখন সকল জাতি সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

শাসক এবং শাসিত

বাহাউল্লা' অত্যন্ত সুস্পষ্ট, ওজস্বী ভাষায় অত্যাচার ও যথেচ্ছাচারের নিন্দা করিয়াছেন; তিনি সতর্কীকরণ-বাণী উচ্চারণ করিয়া স্বেচ্ছাতন্ত্রতা নিষেধ করিয়াছেন। "নিহিত বাক্যে" তিনি বলিতেছেন ঃ—

"হে পৃথিবীর নির্য্যাতনকারী অত্যাচারী শাসক-সম্প্রদায়! তোমরা অত্যাচার, যথেচ্ছ আচরণ হইতে নিবৃত্ত হও; কারণ, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অত্যাচার, অন্যায় আমি উপেক্ষা করিব না, আমার ক্রোধ-বহ্নিতে আমি অত্যচারীদিগকে দগ্ধ করিব।"

আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার দায়িত্ব-ভার যাহাদের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে, তাহারা " 'মন্ত্রণা'র রশ্মি ধারণ করিবে, এবং যাহাতে সর্ব্ব-সাধারণের নিরাপত্তা, সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নতি ও শান্তি সাধিত হয়, তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক স্থির করিয়া শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে; কেননা, এসকল ব্যাপারে অন্য রূপ ব্যবস্থা করা হইলে, অশান্তি ও কলহের সৃষ্টি হইবে।"—(বিশ্বের ফলকলিপি)

অপরপক্ষে, প্রজাবর্গ ও ন্যায় শাসন-তন্ত্রের আইন মান্য করিয়া রাজভক্তি সহকারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। জাতীয় উন্নতিসাধন করিতে হইলে তাহারা কদাচ হিংসানীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবে না, তাহারা শিক্ষার প্রসার, সদ্দৃষ্টান্ত প্রভৃতি উপায়ের উপর নির্ভর করিয়া দেশের হিতসাধনে ব্রতী হইবে। বাহাউল্লা' বলিতেছেন ঃ—

" 'বাহা'র জনগণের কর্ত্তব্য, তাহারা যে দেশে বাস করে সেই দেশের সমস্ত আইন, কানুন শ্রদ্ধাসহকারে মান্য করিবে, নিয়মানুসারে জীবন নির্ব্বাহ করিবে; তাহারা একান্ত অনুগতভাবে, বাধ্যতা ও সত্যবাদিতা সহকারে দেশের নিয়মগুলি মানিয়া চলিবে।"—(আনন্দবার্ত্তা)

"হে ঈশ্বরের লোকগণ! বিশ্বাস-পরায়ণতা ও সাধুতার পরিচ্ছদে তোমাদের (দেহ) মন্দিরকে বিভূষিত ক'র। অতঃপর সুকর্ম্ম ও সুনীতির সৈন্যদল লইয়া আপন প্রভুর সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান্ হও। আমি আমার গ্রন্থ ও পত্রাবলীতে, আমার পুস্তক ও ফলকলিপিতে রাজদ্রোহ ও বিবাদ-বিসম্বাদ নিষেধ করিয়াছি; ইহাতে আমাদের উদ্দেশ্য, তোমাদের উন্নতি, তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি বই আর কিছুই নহে।"—("য়িশ্‌রাকাৎ"এর ফলকলিপি)

কর্ম্মে নিয়োগ এবং কর্ম্মে উন্নতি

কর্ম্মে নিয়োগ করিবার সময় প্রার্থীর উপযুক্ততাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হইবে; বয়সাধিক্য, সামাজিক বা আর্থিক অবস্থা, পারিবারিক প্রতিপত্তি বা ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব আদৌ বিবেচিত হইবে না। বাহাউল্লা' "য়িশ্‌রাকাৎ"এ বলিতেছেন ঃ—

"পঞ্চম 'য়িশ্‌রাক্' (ঔজ্জ্বল্য)—রাজ্যাধিপতিগণের কর্ত্তব্য, প্রজাগণের ও অধীনস্থ রাজপুরুষগণের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকা এবং প্রজাগণকে তাহাদের যোগ্যতা ও গুণানুসারে শাসনকার্য্য পরিচালনের পদ প্রদান করা। ' প্রত্যেক রাজা ও প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়কের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, তা' না হইলে বিশ্বাসঘাতক অভিভাবকের বা 'অছি'র পদে এবং অপহারক রক্ষকের পদে নিযুক্ত হইতে পারে।"

সামান্য বুদ্ধি-বৃত্তি পরিচালিত করিলে, ইহা সম্যক প্রতীত হয় যে যদি এই নীতি সাধারণভাবে গৃহীত হয় এবং তদনুসারে কার্য্য আরব্ধ হয়, তবে আমাদের সামাজিক জীবনে এক অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন

সংঘটিত হইবে। যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার যোগ্যতা ও গুণানুসারে কর্ম্ম প্রদত্ত হইবে, তখন সে সর্ব্বান্তঃকরণে সেই বিশিষ্ট কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করিবে এবং তাহার কর্ম্মে সে পারদর্শী হইবে; ইহাতে তাহার ও জগজ্জনের অশেষ উপকার হইবে।

অর্থনৈতিক সমস্যা

বাহাই উপদেশাবলীতে ধনী-দরিদ্রের অর্থ নীতির পুনঃ-সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষরূপে জোর দিয়া বলা হইয়াছে। আব্দুলবাহা বলিতেছেন :—

"জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার এমন সামঞ্জস্য করিতে হইবে, যাহাতে দারিদ্র্য পৃথিবী হইতে বিদূরিত হইবে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পদ ও মর্য্যাদা অনুসারে যথাসম্ভব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে পারিবে। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি প্রভূত ধন-সম্পত্তি ঐশ্বর্য্যভারে প্রপীড়িত, অপর পক্ষে অসংখ্য হতভাগ্য ব্যক্তি খাদ্যাভাবে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; একদিকে দেখিতে পাই অসংখ্য অতিবৃহৎ প্রাসাদ একই ব্যক্তির সম্পত্তি, অপরদিকে দেখিতে পাই অসংখ্য নর-নারীর মাথা রাখিবার স্থান টুকুও নাই। * * * এইরূপ অবস্থা অতিশয় অন্যায় এবং ইহার প্রতিকার হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। যত্ন সহকারে এখন ইহার প্রতি-কারের চেষ্টা করিতে হইবে। মানবসমাজে পূর্ণসমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহা সম্পন্ন করা যাইতে পারে না; সমতা কপোল-কল্পনা মাত্র; ইহা কখনও সম্ভব নহে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সমতা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, তাহা হইলেও তাহা ক্রমাগত চলিতে পারে না। যদি ইহার স্থায়ীত্ব সম্ভবপর হয়, পৃথিবীর যাবতীয় শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে। শৃঙ্খলার বিধান মানবজগতে চিরস্থায়ী ভাবে প্রচলিত

থাকিবে; ঈশ্বর মানবসৃষ্টিতে এই নিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। * * * বিরাট সৈন্যবাহিনীর ন্যায় মানব-জাতিরও অধ্যক্ষ, নায়ক, অধীন-কর্ম্মচারী ও সৈনিকগণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে,—যাহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। একটি সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠানে পদের অসাম্যই বৈশিষ্ট্য। কেবল মাত্র সেনাপতি লইয়া বা কেবলমাত্র নায়কগণ লইয়া বা কেবলমাত্র সৈনিকগণ লইয়া, কাহারো কর্ত্তৃত্বাধীন না হইয়া কোনও সৈন্যবাহিনী গঠিত হইতে পারে না।

"অবশ্য, কতিপয় ব্যক্তি ধনকুবের এবং অনেক ব্যক্তি শোচনীয়রূপে দুরিদ্র হওয়ায়, ঘোরতর অসাম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকারের নিমিত্ত একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান গঠিত করা প্রয়োজন। অর্থ পুঞ্জীভূত করিবার একটি সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন; দারিদ্র্যেরও একটি সীমা নির্দ্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এই দু'য়ের কোনটিরই আতিশয্য ভাল নহে। * * * যখন আমরা দেখিতে পাই লোক দরিদ্রতা হেতু, অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে কোনো স্থানে অন্যায়, অত্যাচার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর জাতিসমূহের কর্ত্তব্য, আর কাল বিলম্ব না করিয়া, দারিদ্র্যক্লিষ্ট অসংখ্য নরনারীর এই নিদারুণ শোচনীয় অবস্থার প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত করা।

"ধনকুবেরগণ তাহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ দান করিবে এবং যেই সমস্ত ব্যক্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত, জীবণধারণের সাধারণ আবশ্যকীয় বস্তুর অভাবে কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের কথা স্মরণ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইবে এবং তাহাদের প্রতি সদয় সকরুণ ব্যবহার করিবে।"

অপরিসীম ধনশালিতা এবং অপরিসীম দারিদ্র্য, উভয়বিধ চরম অবস্থা নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করিতে হইবে।

*** দেশের শাসন-প্রণালী ঈশ্বরের বিধানানুরূপ করিতে হইবে, ইহাতে সকলের প্রতি তুল্য ন্যায়পর-আচরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। *** যতদিন পর্য্যন্ত দেশের শাসন-প্রণালী তদনুরূপ করা না হইবে, ততদিন ঈশ্বরের বিধান প্রতিপালিত হইবে না।"—(প্যারিসে কথাবার্ত্তা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৪০)

সাধারণের কোষাগার

আব্‌দুল্‌বাহা বলেন যে প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক গ্রাম এবং প্রত্যেক জিলার রাজস্ব সম্বন্ধীয় শাসনভার যথাসম্ভব স্থানীয় জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে, তাহারা কেন্দ্রীয় শাসনের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিবার জন্য যথোপযুক্ত পরিমাণ রাজস্ব দিবে। রাজস্ব সংগ্রহের একটি প্রধান উপায় আয় অনুযায়ী আয়কর বা ইন্‌কাম্ ট্যাক্স। যদি কোনো ব্যক্তির আয় তাহার প্রয়োজনীয় ব্যয় হইতে অধিক না হয়, তাহা হইলে তাহাকে কোনো ট্যাক্স দিতে হইবে না; যে স্থলে কোনো ব্যক্তির আয় প্রয়োজনীয় ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হইবে; উদ্বৃত্তাংশের পরিমাণের উপর ট্যাক্সের পরিমাণও নির্ভর করিবে, উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইলে, ট্যাক্সও বর্দ্ধিত হইবে।

অপরপক্ষে, যদি কোনো দৈবায়ত্ত কারণে কোনো ব্যক্তি তাহার বাৎসরিক ব্যয় নির্ব্বাহের উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারে, অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হইয়া উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া পড়ে বা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হেতু উপযুক্ত পরিমাণ শস্য সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে সাধারণ কোষাগার হইতে তাহার এবং তাহার পরিবারের ভরণ-পোষণের উপযোগী অর্থ দান করিতে হইবে।

রাজস্ব-সংগ্রহের অন্যান্য নানাবিধ উপায়—উত্তরাধিকারিহীন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, কয়লার খনি, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতির খনি এবং আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত ধন-রত্ন বাজেয়াপ্ত করা; ব্যক্তিগত দান হইতেও শাসন-তন্ত্রের ব্যয়ভার সংগৃহীত হইবে। অপরপক্ষে, আতুর, অক্ষম ব্যক্তিদিগের জীবন ধারণের নিমিত্ত, পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকাদিগের ভরণ-পোষণের জন্য, স্কুলের সাহায্যকল্পে, অন্ধ-বধিরদের সাহায্যার্থে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য সংরক্ষণার্থে সাধারণ কোষাগার হইতে দান করিতে হইবে। এমতে প্রত্যেকের কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় হইবে।

স্বেচ্ছাক্রমে ধন-বিভাগ

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী-শান্তি-প্রতিষ্ঠা-সমিতির নিকটে লিখিত পত্রে আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন :—

"বাহাউল্লা' প্রদত্ত একটি উপদেশে বলা হইয়াছে যে একজনের ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি অপর সকলের সঙ্গে, স্বেচ্ছাক্রমে ভাগ করিয়া ভোগ করিতে হইবে। আইন করিয়া কৃত্রিম সমতা সৃষ্টি করা অপেক্ষা এই নীতি মহত্তর; এবং ইহা এই যে, কোনো ব্যক্তি নিজেকে অপর হইতে অধিক উপযুক্ত মনে করিবে না, বরঞ্চ, অপরের জন্য নিজের ধন-সম্পত্তি, এমন কি, নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিবে। কিন্তু, আইন করিয়া এরূপ করিবার চেষ্টা করা অনুচিত, কারণ, ইহা বাধ্যতা-মূলক নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় অভিরুচি অনুসারে তাহার জীবন ও সম্পত্তি অপরের জন্য উৎসর্গ করিবে এবং স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া দরিদ্রের জন্য ব্যয় করিবে; পারস্যের বাহাইগণের মধ্যে এই নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে।"

সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইবে

বাহাউল্লা'র অর্থ-নৈতিক প্রশ্নসম্বন্ধীয় একটি অত্যাবশ্যক উপদেশ এই যে প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো না কোনো হিতকর কার্য্যে নিয়োজিত থাকিবে। মানব-সমাজে কোনো নিষ্কর্ম্মা থাকিবে না, কোনো সক্ষমদেহী পরান্নভোজীও হইবে না। বাহাউল্লা' "আনন্দ-বার্ত্তা"তে বলিতেছেন ঃ—

"তোমাদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে; সেই কর্ম্ম শিল্পই হউক, ব্যবসাই হউক, বাণিজ্যই হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আমরা তোমাদের বৃত্তি, ব্যবসায়কে সেই সত্য-পুরুষ ঈশ্বরের উপাসনার সমতুল করিয়াছি। হে লোকগণ! তোমরা ঈশ্বরের করুণা ও তাঁহার অনুগ্রহ চিন্তা ক'র, তৎপর সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহাকে ধন্যবাদ নিবেদন ক'র।

"আলস্য বা শৈথিল্যে কদাচ কাল অতিবাহিত করিও না এবং এমন কার্য্যে নিরত থাক, যাহা তোমার ও অপরের হিতকারী হয়। এইরূপে এই ব্যাপার এই ফলকলিপিতে স্থিরীকৃত হইয়াছে,—যাহার দিঙ্মণ্ডল হইতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিবাকর ঝক্‌মক্ করিতেছে। ঈশ্বরের সমক্ষে সেই ব্যক্তিই নিতান্ত ঘৃণ্য, যে কাজ না করিয়া, ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। উপায়ের রশ্মি অবলম্বন ক'র, সর্ব্বকারণের কারণ ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া।"

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর ব্যবসায় ক্ষেত্রে,—অনাবশ্যক প্রতিযোগিতায়, বিবাদ-বিসম্বাদে, আরও কত অসংখ্য অহিতকর প্রকারে কত শক্তি, কত সামর্থ্য ব্যয়িত হইতেছে, কেবলমাত্র অন্যের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ ও খর্ব্ব করিয়া দেওয়ার জন্য। বাহাউল্লা'র আদেশানুসারে যদি প্রত্যেক ব্যক্তি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে এবং সেই কর্ম্ম দৈহিক হউক বা মানসিক

হউক যদি মানবের হিতকারী হয়, তাহা হইলে স্বাস্থ্যকর, আরাম-দায়ক, এবং উন্নত জীবনের আবশ্যকীয় বস্তুর কোনো অভাবই থাকিবে না; এবং খাদ্যাভাব, দারিদ্র্য, ব্যবসায়গত দাসত্ব এবং স্বাস্থ্য-ধ্বংসকারী কঠোর পরিশ্রমেরও কারণ বিলুপ্ত হইবে।

অর্থ সম্বন্ধীয় নৈতিক নিয়মাবলী

বাহাই উপদেশ অনুসারে, বৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন এবং তাহার সদ্ব্যবহার, উভয়ই প্রশংসনীয়, গৌরবময় কার্য্য। কৃতকার্য্যের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে পুরস্কৃত করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। "তরাজাৎ গ্রন্থে" বাহাউল্লা' বলিতেছেন ঃ—

" 'বাহা'র জনগণ কদাচ কাহারো ন্যায্য দাবী অস্বীকার করিবে না, সর্ব্বদা গুণী ব্যক্তির সম্মান, সমাদর করিবে। * * * তাহারা ন্যায় সঙ্গতভাবে কথা বলিবে এবং প্রাপ্ত উপকারের জন্য কৃতজ্ঞ থাকিবে।"

ঋণদান করিয়া সুদ গ্রহণ করা সম্বন্ধে বাহাউল্লা' "য়িশ্‌রাকাৎ"এ বলিয়াছেন ঃ—

"অধিকাংশ ব্যক্তি এই সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ আইনকানুনের অভাব অনুভব করে, কারণ সুদ গ্রহণ অনুমোদিত না হইলে, সর্ব্বপ্রকারের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইবে। * * * এমন লোক কদাচিৎ দেখা যায়, কর্জ-এ-হসন্ নীতি ভিত্তি করিয়া ঋণদান করিবেন। কর্জ-এ-হসন্ শব্দের অর্থ 'উত্তম-ঋণ', অর্থাৎ বিনা সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া,—যাহা ঋণ-গ্রহীতার ইচ্ছামত সময়ে পরিশোধ করা হইবে। এই কারণে, আমরা ভৃত্যগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া টাকার সুদ অর্থাৎ মুনাফাকে

জনসমাজে প্রচলিত ব্যবসা, বাণিজ্যের নীতি স্বরূপ নির্দ্ধারিত করিয়াছি। অর্থাৎ, * * * এখন হইতে টাকার উপর সুদ দাবী করা অনুমত, আইনসঙ্গত, পবিত্র কার্য্য হইবে। * * * কিন্তু ন্যায়সঙ্গত, পরিমিত ভাবে এই ব্যাপার নির্ব্বাহ করা উচিত। 'বাহা'র লেখনী ইহার সীমা নির্দ্দেশে বিরত রহিল;—ইহাই ঈশ্বরের পরিণামদর্শিতা এবং তাঁহার ভৃত্যগণের প্রতি তাঁহার করুণারই নিদর্শন। আমরা ঈশ্বরের বন্ধুগণকে ঔচিত্য ও নিরপেক্ষতা সহকারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিতেছি, যাহাতে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দয়া-দাক্ষিণ্য, প্রেম-মৈত্রীর প্রকাশ হইতে পারে। * * * এই সমস্ত বিষয়ের পরিচালন-ভার ন্যায়বিচার সভার সদস্যগণের হস্তে অর্পিত হইল, তাঁহারা যেন সময়োপযোগিত্ব এবং সর্ব্ব-বিষয়ে সুসঙ্গতি রক্ষা করিয়া ন্যায়পরতা সহকারে কার্য্য করেন।"

ব্যবসায়গত দাসত্বের উচ্ছেদ

"আক্‌দাস্ গ্রন্থে" বাহাউল্লা' দাসত্ব-প্রথা নিষেধ করিয়াছেন। আব্দুল্‌বাহা এই বাণী ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, মাত্র প্রাচীন দাসত্ব নহে, বর্ত্তমান যুগের কারখানা, যন্ত্রশালাতে যে অর্থ-নৈতিক দাসত্ব বিদ্যমান, তাহাও নিষিদ্ধ। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আব্দুল্‌বাহা আমেরিকাতে বক্তৃতা দিয়া বলিয়াছিলেন:—

"১৮৬০ এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে তোমরা একটি মহান্, অসাধারণ কার্য্য সুনিষ্পন্ন করিয়াছিলে, তোমরা ঐ সময়ে প্রাচীন যুগের দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছিলে; আজ তোমাদিগকে তাহা অপেক্ষা আরও অধিক অসাধারণ কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে,

তোমাদিগকে অর্থনৈতিক, মজুর-দাসত্ব উচ্ছেদ করিতে হইবে। * * * ধনিক এবং শ্রমিক, উভয় দল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিবে, এ উপায়ে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কদাচ হইবে না। পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রেমপূর্ণ ভাব পোষণ করিবে, এই উপায় ব্যতীত মৈত্রী সংস্থাপিত করিবার অন্য কোনো পন্থা নাই। পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিতে শিখিবে, তাহা হইলেই চিরস্থায়ী শান্তি ও ন্যায়পূর্ণ অবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। * * * বাহাইগণের মধ্যে জোর করিয়া পরধন লুণ্ঠন করা, অর্থ-গৃধ্নুতামূলক কদাচার, বিদ্রোহমূলক দাবী কিছুই নাই; বাহাই ধর্ম্মে, আইনের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা নাই। * * * ভাবীকালে, অপরের পরিশ্রমের ফল সঞ্চয় করিয়া কোনো ব্যক্তি প্রভূত ধনসঞ্চয় করিতে পারিবে না; সে-পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। ধনী ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছাক্রমে নিজেদের বিত্ত অপরের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করিবে। স্বেচ্ছাক্রমে, ধীরে ধীরে, ধর্ম্মশিক্ষার প্রভাবে তাহারা ক্রমে এই আদর্শ অবস্থায় উন্নীত হইবে। যুদ্ধ, রক্তপাত প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়া কদাচ সেরূপ পরিণতি লাভ হইতে পারে না।"—(পশ্চিমের তারকা, ৭ম খণ্ড, নং ১৫, পৃঃ ১৪৭)

ধনিক ও শ্রমিক উভয়ে বন্ধুভাবে পরামর্শ করিয়া, মিলিয়া মিশিয়া সমস্ত কাজ-কারবারের ব্যবস্থাপন করিবে। ধনিক শ্রমিককে ব্যবসায়ের অংশীদার করিয়া লইবে, এবং মুনফা ভাগ করিয়া ভোগ করিবে; তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষিত হইবে। শ্রমিকের ধর্ম্মঘট ধনিকের প্রতিশোধ-মূলক নীতির তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারে কেবল মাত্র যে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা নহে, বরং সমগ্র জাতিসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং, রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য, এই সমস্ত বর্ব্বরোচিত উপায়

ব্যতিরেকেই ধনিক-শ্রমিকের কলহের মীমাংসা করিবার ব্যবস্থা করা। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আব্দুলবাহা নিউহ্যাম্পশায়ারের ডাব্লীন্ নগরে বলিয়াছিলেন :—

"এখন, আমি তোমাদিগকে ঈশ্বরের বিধান সম্পর্কে বলিব। ঈশ্বরের বিধান অনুসারে, শ্রমিকদিগকে কেবলমাত্র মজুরী দিয়াই খাটাইয়া লওয়া অত্যন্ত অন্যায়; তাহাদিগকে ব্যবসায়ের অংশীদার রূপে গ্রহণ করাই বিধেয়। সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তীভূত নীতি এই যে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজের সম্পত্তি হইবে; কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে অন্তরায় বহুবিধ। ধর্ম্মঘট করিয়া এই উদ্দেশ্য সফল হইবে না। জগতের সমস্ত শাসন-তন্ত্রগুলি একত্র মিলিত হইয়া একটি মহাসভা গঠন করিবে; সেই মহাসভার সদস্য সমস্ত জাতির ব্যবস্থাপক সভা হইতে নির্ব্বাচিত হইবে; পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তি এই মহাসভার সদস্য হইবেন। তাঁহারা মিলিত হইয়া এমন নিয়ম প্রণয়ন করিবেন ও এমন ন্যায়সঙ্গত নীতি উদ্ভাবন করিবেন, যাহাতে ধনিক বা শ্রমিক, কেহই ক্ষতিগ্রস্ত না হ'ন। জ্ঞান এবং শক্তি সহকারে ও সব দিক দেখিয়া তাঁহাদিগকে এই নিয়মগুলি প্রণয়ন করিতে হইবে। তাহার পর, তাঁহারা পৃথিবীতে ঘোষণা করিয়া সকলকে জানাইয়া দিবেন যে তাঁহাদের উদ্ভাবিত নীতি অনুসরণ করিলে ধনিক ও শ্রমিক, উভয় পক্ষেরই স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষিত হইবে। তাহার পরও, এই সমস্ত নিয়মাবলী গৃহীত, অনুসৃত হওয়া সত্ত্বেও যদি কোনো স্থানে ধর্ম্মঘট হয়, তাহা হইলে সমস্ত দেশের শাসন-শক্তি মিলিত, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত করিবে। এরূপ না করিতে পারিলে, ঘোরতর ধ্বংস অনিবার্য্য। বিশেষতঃ য়ুরোপে এই সর্ব্বধ্বংসকারী তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইবে; তখন ভীষণ সমস্ত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে, কেহই তাহা রোধ করিতে পারিবে না।

সর্ব্বব্যাপী য়ুরোপীয় মহাসমরের একটি প্রধান কারণ হইবে এই সমস্যা। ধনিক সম্প্রদায়, যাহারা সমস্ত প্রকার সম্পত্তি, খনি ও কারখানার মালিক, তাহারা সমস্ত শ্রমিকদিগের সঙ্গে ভাগ করিয়া ব্যবসায় হইতে লভ্যাংশ গ্রহণ করিবে, আত্মম্ভরি, স্বার্থপরের মত সমস্ত লভাংশ নিজেরাই আত্মসাৎ করিবে না। শ্রমিকগণ তাহাদের পারিশ্রমিক ব্যতীত লাভের একটি সঙ্গত অংশ পাইবে। তাহা হইলে শ্রমিকগণ মন-প্রাণ দিয়া শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য যত্নবান্ হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় যে নিয়ম চলিতেছে, তাহাতে শ্রমিকগণের ব্যবসায়ের প্রতি, কারখানার প্রতি কোনোরূপ মমতা-বোধ জন্মিতে পারে না; কারণ, বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে শ্রমিকের সঙ্গে ব্যবসায়ের একমাত্র সম্বন্ধ, পারিশ্রমিক-প্রাপ্তি, তাহাতে অন্তরের সংযোগ স্থাপিত হইতে পারে না।"—(পশ্চিমের তারকা, অষ্টম খণ্ড, নং ১, পৃঃ ৭)

মৃতের "উইল" ও তাহার সম্পত্তির ব্যবস্থা

বাহাউল্লা' বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার জীবদ্দশায় তাহার ইচ্ছামত, তাহার সম্পত্তির দান, হস্তান্তর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাই করিতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য, উইল করিয়া তাহার সম্পত্তির ব্যবস্থা তাহার মৃত্যুর পরে কিরূপ হইবে, তাহার স্পষ্ট করিয়া ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া। তিনি বলেন, প্রত্যেক ঈশ্বর-বিশ্বাসীর উইল করিয়া যাওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য। যদি কোনো বাহাই দৈবাৎ উইল করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া, সাত শ্রেণীর উত্তরাধিকারীর মধ্যে সম্পত্তির মূল্য বিশেষ

অংশানুযায়ীরূপে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। এই সাত শ্রেণীর উত্তরাধিকারী যথাক্রমে এইরূপ:—(১) পুত্র, কন্যা (২) স্বামী বা স্ত্রী (৩) পিতা (৪) মাতা, (৫) ভ্রাতা (৬) ভগ্নী (৭) শিক্ষকগণ। প্রথম শ্রেণী হইতে সপ্তম শ্রেণী পর্য্যন্ত বিভক্ত অংশ ক্রমে কমিয়া আসিবে। যদি কোনো শ্রেণীর উত্তরাধিকারী কোনো বিশেষস্থলে না থাকে তাহা হইলে তাহার অংশ রাজকোষে যাইবে; সেখানে তাহা দরিদ্র, পিতৃমাতৃহীন, বিধবা, অনাথদিগের দুঃখমোচন কার্য্যে ব্যয়িত হইবে বা অন্যান্য সদনুষ্ঠানের সহায়তা-কল্পে ব্যয়িত হইবে। যদি মৃত ব্যক্তির কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি সাধারণ রাজকোষে প্রদত্ত হইবে।

বাহাউল্লা’র বিধানে এমন কিছুই নাই, যাহাতে কোনো ব্যক্তি তাহার সমস্ত সম্পত্তি কোনো একজন ব্যক্তিকে দান করিতে চাহিলে, সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবে না; অর্থাৎ, সে সেরূপ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা অনায়াসেই করিতে পারে; কিন্তু উইল করিবার সময়, বাহাউল্লা’ যে আদর্শ “উইল” রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা প্রভাবন্বিত হইয়াই বাহাইগণ উইল করিবেন, ইহা আশা করা অযৌক্তিক নহে। এই আদর্শ অনুসারে, উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নর-নারীর সাম্য ও সমানাধিকার বাদ

নারীগণ পুরুষের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবে, শিক্ষা, অধিকার, সুযোগ, সর্ব্ববিষয়েই পুরুষ ও নারীগণ পরস্পরের সমকক্ষ ও উপযুক্ত

হইবে, এই মহান্ উদার নীতি বাহাউল্লা'র সামাজিক উপদেশাবলীর প্রধান কথা।

তিনি সার্ব্বজনীন শিক্ষার উপরে নারীজাতির মুক্তি সাধন নির্ভর করিয়াছেন। বালিকাদিগকে বালকদিগের অনুরূপ শিক্ষা দান করিতে হইবে। বরঞ্চ, বালিকাদিগের জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে, তাহা বালকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে উন্নততর হইবে ; কারণ, বালিকা-গণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সন্তানের জননী হইবেন, সন্তান পালনের ভার তাঁহাদেরই হস্তে অর্পিত থাকিবে, তাঁহারাই ভাবী সমাজ গঠন করিয়া তুলিবেন এবং তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা পরিপূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া আবশ্যক।

আব্দুল্‌বাহা পাশ্চাত্য জগতে ভ্রমণকালে নর-নারীর সাম্য সম্বন্ধে বাহাই উপদেশাবলীর তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিবার অনেক সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লণ্ডনের "নারী-মুক্তি সঙ্ঘের" সভায় তিনি বলিয়াছিলেন :—

"মানবজাতি দুইপক্ষবিশিষ্ট পক্ষীসদৃশ—যাহার একপক্ষ পুরুষ, অপর-পক্ষ নারী। যদি তাহার উভয় পক্ষ বলিষ্ঠ না হয় এবং একই সম্মিলিত শক্তিতে তাহারা পরিচালিত না হয়, পাখী ঊর্দ্ধ আকাশে উড়িতে পারে না। এই যুগের ভাবধারা অনুযায়ী নারীগণ উন্নতি করিবে এবং জীবনের সমস্ত বিভাগে তাহাদের সাধনা সম্পন্ন করিয়া পুরুষের সমান উপযুক্ত হইবে, পুরুষের সমস্তরে উন্নীত হইবে এবং সমান অধিকার ভোগ করিবে। ইহা আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা; ইহাই বাহাউল্লা'র মৌলিক নীতিগুলির অন্যতম।

"অনেক বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে পুরুষের মস্তিষ্ক নারীর মস্তিষ্ক অপেক্ষা আয়তনে বড় এবং ওজনে বেশী; তাঁহারা এই তথ্যের

উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পুরুষ নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা বাস্তব জগতে অনবরতই দেখিতে পাই, ক্ষুদ্র-মস্তক-ওয়ালা ব্যক্তিগণ গভীর অনুভূতি, সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও মেধার পরিচয় দিতেছে। তাহাদের মস্তিষ্কের ওজন নিশ্চয়ই নিতান্ত সামান্য, কিন্তু তাহাতে তাহাদের অসাধারণ মস্তিষ্ক বল কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সেইরূপ, অপরপক্ষে আমরা অনবরতই দেখিতে পাই, বৃহৎ মস্তকবান্ ব্যক্তিগণ নির্ব্বোধের মত আচরণ করিতেছে; তাহাদের মস্তিষ্কের ওজন নিশ্চয়ই অত্যন্ত বেশী। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে মস্তিষ্কের পরিমাণ বা ওজনের সঙ্গে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বা চিত্ত-শক্তির উৎকর্ষের কোনো কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আদৌ নাই।

"পুরুষগণ অনেক সময়ে দ্বিতীয় একটি যুক্তি দিয়া থাকেন; তাহা এই যে নারীগণ পুরুষগণের সমকক্ষ নহে, যেহেতু, অতীতকালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, পুরুষগণ যেমন নানারূপ শ্রেষ্ঠ কার্য্য দ্বারা জগতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছেন, নারীগণ সেরূপ কোনো শ্রেষ্ঠ কার্য্যই করেন নাই। ইহা অপেক্ষা অসার যুক্তি আর কিছু হইতে পারে না। যদি অতীতকালের ইতিহাস তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে, গভীরভাবে আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন যে নারীগণ ইতিহাসে তাঁহাদের গৌরবের, তাঁহাদের কর্ম্মশক্তির অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন, এমন কি, বর্ত্তমান সময়েও মহীয়সী নারীর অভাব নাই।"

আব্দুল্‌বাহা জেনোবিয়া প্রভৃতি অতীতকালের মনস্বিনী নারীদিগের কথা উল্লেখ করেন; পরিশেষে তিনি যীশুখৃষ্টের উপাসিকা মেরী ম্যাগ্‌ড্যালীনের নাম করিয়া বলেন, তিনি নিতান্ত নির্ভীক রমণী ছিলেন, ভয় লেশমাত্রও তাঁহার ছিল না, কারণ, যখন যীশুখৃষ্টের প্রধান শিষ্যদিগের

ভক্তি বিচলিত হইয়াছিল, তখনও মেরীর ভক্তি বিচলিত হয় নাই। আব্দুল্‌বাহা বলিতে লাগিলেন :—

"আমাদের সমসাময়িক যুগে একজন মহীয়সী নারী ছিলেন, আমি তাঁহারই কথা উল্লেখ করিব। তাঁহার নাম "কোর্রাতুল্ আয়েন্"; তিনি একজন মুসলমান পুরোহিতের কন্যা। বা'বের আবির্ভাব সময়ে তিনি পারস্যবাসীদিগের চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করিয়া অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিলেন ও প্রকাশ্যভাবে পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের সঙ্গে ধর্ম্ম লইয়া তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলে তাঁহার এই বিস্ময়কর সাহস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল, কারণ, নারীগণ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিবেন, ইহাই সনাতন নিয়ম, এবং নারীগণ পুরুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিবেন না, ইহাই চিরাভ্যস্ত সংস্কার। প্রত্যেক তর্কসংগ্রামেই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিতেন, সুতরাং তাঁহার পাণ্ডিত্য যে অসাধারণ ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

"পারস্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহাকে বন্দী করা হইল; তাঁহাকে রাজপথে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিয়া আহত করা হইল, তাঁহার উপর অভিশাপ-বাণী বর্ষিত হইতে লাগিল, তাঁহাকে নগরে নগরে নির্ব্বাসন করা হইতে লাগিল, মৃত্যুভয় দেখান হইল, কিন্তু তিনি এই সমস্ত অত্যাচার, নির্য্যাতন, সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তাঁহার ভগ্নীদিগের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তিনি অদ্ভুত সাহসের সহিত সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিতেন। এমন কি, কারারুদ্ধ থাকিয়াও তিনি তাঁহার মতবাদের প্রতি অনুরক্ত শিষ্য সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি একজন পারস্য-দেশের মন্ত্রীর আবাস-গৃহে বন্দী অবস্থায় ছিলেন; সেই মন্ত্রীকে তিনি বলিয়াছিলেন : 'তুমি ইচ্ছা করিলে আমাকে ক্ষণকালের মধ্যেই নিহত

করিতে পার, কিন্তু তুমি নারীদিগের মুক্তিলাভ রোধ করিতে পারিবে না।' ক্রমে তাঁহার পৃথিবীতে বাস করিবার সময় ফুরাইয়া আসিল; তাঁহাকে উদ্যানে লইয়া গিয়া তাঁহার শ্বাসরোধ করিয়া তাঁহাকে নিহত করা হইল।

"বিবাহের শোভা-যাত্রায় যোগ দিবার জন্য মানুষ যেমন নানাবর্ণের পরিচ্ছদে, নানা বহুমূল্য বসনে, ভূষণে সজ্জিত হইয়া গমন করে, এই মহীয়সী নারীও সেইরূপ মৃত্যুকালে বিবাহের কন্যার মত সজ্জিত হইয়া মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি সত্যসত্যই এমন ঔদার্য্য, এমন মহত্ব এবং এমন প্রচণ্ড বীরত্ব সহকারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, যে যাহারা তাঁহাকে দেখিল, তাহারা স্তব্ধ, আতঙ্কিত, বিস্মিত হইল। তিনি প্রকৃত পক্ষে একজন মহীয়সী, মনস্বিনী নারী।

"বর্ত্তমান সময়ে পারস্য-দেশে বাহাই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক নারী আছেন; তাঁহারা অপ্রমেয় বিক্রমশালিনী, তাঁহারা একদিকে যেমন সাহসে দুর্জ্জয়, অপরপক্ষে তেমনই কবিত্বশক্তিসম্পন্না। তাঁহারা ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারেন ও তাঁহারা সমাগত সহস্র সহস্র ব্যক্তির সমক্ষে বক্তৃতা দিয়া থাকেন।

"নারীগণ ক্রমোন্নতি করিতে থাকিবে; মানবজাতির পূর্ণতা-সাধনের নিমিত্ত তাহারা বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাসে তাহাদের জ্ঞান বিস্তার করিবে; তাহারা অনতিবিলম্বে তাহাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হইবে। পুরুষ নারীকে স্থিরসঙ্কল্পা দেখিতে পাইবে, দেখিবে তাহারা মর্য্যাদাপূর্ণ আচরণ করিতেছে, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নতি-সাধন করিতেছে, যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া ভোটাধিকার ও সমান সুযোগ পাওয়ার দাবী করিতেছে। আমি দেখিতে চাই, তোমরা

জীবনের সর্ব্বদিক দিয়া উন্নতি করিতেছ; তৎপর তোমাদের ললাটে চিরস্থায়ী গৌরবের কনক কিরীট উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।"

নারীগণ ও নবযুগ

সমাজ-শৃঙ্খলা ব্যাপারে নারীজাতির মতামত যখন উচিত সমাদর প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদিগকে তাহাদের মতামত প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, তখন আমরা আশা করিতে পারি যে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে পুরুষ-আধিপত্য সময়ে যেই সকল বিষয় শোচনীয়রূপে উপেক্ষিত হইয়াছে, যেমন স্বাস্থ্য, মিতাচারিতা, শান্তি, ব্যক্তিগত জীবনের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি—এই সমস্তের অসাধারণ উন্নতি সাধিত হইবে,—যাহা মানব-জীবনে অপরিসীম সুখ, সমৃদ্ধি আনয়ন করিবে। আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন ঃ—

"অতীতকালে পৃথিবী পশু-শক্তি দ্বারা শাসিত হইয়াছে; পুরুষ নারীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, শারীরিক ও মানসিক পশু বলের দ্বারা। কিন্তু বিধাতার যুগ-চক্র আবর্ত্তিত হইতেছে; পশু-শক্তির প্রাধান্য ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছে; তৎপরিবর্ত্তে কুশাগ্রধীত্ব, মানসিক সূক্ষ্ম-অনুধাবন-শক্তি, তত্ত্বজ্ঞান, প্রেম, সেবা প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিগুলি জয়যুক্ত হইতেছে এবং এই সমস্ত সদ্‌গুণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। নারীগণ এই সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারিণী, সুতরাং তাঁহারা বর্ত্তমান যুগে পূর্ব্বের ন্যায় হীন অবস্থায় থাকিবেন না, বর্ত্তমান যুগ পুরুষের পরুষ-ভাবে প্লাবিত না হইয়া নারীজনোচিত সুকুমার বৃত্তিগুলি দ্বারা প্রেমার্দ্র, ও তাহার রসে সঞ্জীবিত হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বর্ত্তমান যুগে, অতীত যুগের নর-নারীর অসাম্য থাকিবে না, তাহাদের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে"।—(পশ্চিমের তারকা, ৮ম খণ্ড, নং ৩, পৃঃ ৪)

আকস্মিকতার পন্থা বর্জ্জিত হইয়াছে

বাহাউল্লা' তাঁহার অনুগামীদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে অন্যান্য সামাজিক সংস্কারসাধনের ন্যায় নারী-মুক্তি সাধন করিতে হইলেও আকস্মিকতার পন্থা বর্জ্জন করিতে হইবে; আকস্মিকতা এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রশস্ত নহে। পারস্য, মিসর ও সিরিয়া দেশের বাহাই নারীগণ সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে বাহাই পদ্ধতির অতি উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সকল মুসলমান-প্রধান দেশে চিরাচরিত প্রথানুসারে নারীগণ গৃহের বাহিরে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া বিচরণ করেন। বা'ব বলিয়াছিলেন, নারীদিগের ইহাতে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হয়, সুতরাং এই নিয়ম তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাদিগকে মুখ অনাবৃত করিয়া বিচরণ করিবার স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত। কিন্তু বাহাউল্লা' তাঁহার অনুগামীদিগকে আদেশ করিলেন যে, যেস্থলে গুরুতর কোনো নৈতিক সমস্যা লইয়া প্রশ্ন উঠে নাই, সেস্থলে চিরাভ্যস্ত সংস্কার মানিয়া চলাই উচিত; ক্রমে জনসাধারণ শিক্ষিত হইলে, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কুপ্রথাগুলির অনায়াসে উচ্ছেদ সাধন করা সম্ভব হইবে। তিনি তাঁহার শিষ্য ও অনুগামীদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে যাহাদের মধ্যে বাস করিতে হইবে, অকারণে তাহাদিগকে ক্রুদ্ধ করিয়া কোনো লাভ নাই, সামাজিক সংস্কারগুলি আকস্মিক ভাবে সংঘটিত করাইলে ফল শুভ হয় না। নারীগণের অবগুণ্ঠন-মোচন একটি অন্যতম আবশ্যকীয় সামাজিক সংস্কার হইলেও, আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ভাবে, সহসা সমস্ত নারীদিগকে অবগুণ্ঠনমুক্ত করিয়া দিলে, তাহাতে সামাজিক বিপ্লবের সম্ভাবনা। শিক্ষা সুবিস্তৃত হইলে সকলেই ক্রমশঃ সামাজিক সংস্কার-গুলির প্রতি সচেতন হইয়া পড়িবে, তখন কুপ্রথাগুলি আপনিই বিলুপ্ত

হইবে। সুতরাং বাহাই নারীগণ যদিও সম্পূর্ণ অবগত আছেন যে অবগুণ্ঠন পরিধান করা অতিপুরাতন নীতি, শিক্ষিত সমাজে অপ্রয়োজনীয় এবং অসুবিধাজনক, তথাপি শান্তভাবে ঐ অসুবিধা সহ্য করিয়া থাকেন এবং সর্ব্ব-সাধারণের সাক্ষাতে তাঁহাদের মুখ উন্মোচন করিয়া কদাচ বিদ্বেষপূর্ণ বিরোধিতা, কি গোঁড়ামি-প্রসুক্ত বিদ্বেষের ঝটিকাবর্ত্ত সৃষ্টি করেন না। তাঁহাদের এই নীতি-অনুবর্ত্তিতা কোনো প্রকার ভয়ের কারণে নহে, কিন্তু শিক্ষার প্রভাবের উপর এবং প্রকৃত ধর্ম্মের জীবন-পরিবর্ত্তনকারী সঞ্জীবনীশক্তিতে তাঁহাদের একান্ত অবিচলিত বিশ্বাস থাকাই তাহার কারণ। এই সকল দেশের বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহাদের সন্তানগণের—বিশেষভাবে তাঁহাদের কন্যাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এবং বাহাই আদর্শ প্রচারের জন্য তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত করিতেছেন, কারণ, তাঁহারা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করেন যে, যখন জনসাধারণ এই নূতন আধ্যাত্মিক জীবনে সচেতন হইতে থাকিবে, তখন এই সমস্ত পুরাতন প্রথা ও কুসংস্কারগুলি ধীরে ধীরে এবং এইরূপ স্বাভাবিক ও অনিবার্য্যরূপে পরিত্যক্ত হইবে, যেমন বসন্তকালে মুকুলের পাপ্‌ড়ি পরিত্যক্ত হয়—যখন সূর্য্যকিরণে পুষ্প ও পত্রসমূহ বিকশিত হইতে থাকে।

শিক্ষা

পৃথিবী-সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অবতারগণের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য রহিয়াছে, মানবের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের উন্নতিবিধান করা এবং তাহাদিগকে সত্য-পথে পরিচালিত করা। বাহাই ধর্ম্মে, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং তাহার অপরিসীম উপকারিতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট, বিশদ ভাষায় বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষকই সভ্যতার মহাশক্তিশালী মুখ্য

উপায়; শিক্ষকের পদই সেই সর্ব্বোচ্চপদ মানব যাহার আকাঙ্ক্ষী হইতে পারে। শিক্ষা মাতৃজঠর হইতে আরম্ভ হয় এবং মানব জীবনের ন্যায় অন্তহীন। প্রকৃত জীবন-ধারণের জন্য ইহা নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির একমাত্র ভিত্তি। যখন উচিত প্রণালীতে শিক্ষা সার্ব্বজনীনভাবে প্রবর্ত্তিত হইবে, তখন মানবজাতি রূপান্তরিত হইবে এবং এই পৃথিবী স্বর্গোদ্যানে পরিণত হইবে।

অঙ্ক-শাস্ত্র, ভূগোল, ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে রাশি রাশি তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা মনে রাখিয়া স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্ক প্রপীড়িত করিলেই প্রকৃত শিক্ষালাভ করা যায় না। বর্ত্তমান জগতে প্রকৃত শিক্ষিত মানব সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ। কু-অভ্যাস, ভ্রান্ত-ধারণা মিথ্যা আদর্শ, এই সমস্তের সংযোগে বাল্যকাল হইতেই অধিকাংশ ব্যক্তি অশিক্ষার মধ্যে নিমগ্ন থাকে। শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য, বাল্যকাল হইতে ঈশ্বরকে মনে-প্রাণে ভক্তি করা, তাঁহাকে ভালবাসা এবং সমস্ত মন-প্রাণ তাঁহার গুণ-কীর্ত্তনে, তাঁহার সেবায় অর্পণ করা, মানব-সেবা জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যরূপে বিবেচনা করা ও সর্ব্বমানবের হিত-সাধন কল্পে দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করা।

বাহাউল্লা' বলেন, শিক্ষা সার্ব্বজনীন ও ব্যাপকতম হইবে। তিনি "য়িশ্‌রাকাৎ"এ বলিয়াছেন :—

"ইহা চূড়ান্ত আদেশ,—প্রত্যেক পিতা তাহার পুত্র-কন্যাদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবে এবং ফলকলিপিতে যাহা ব্যবস্থিত হইয়াছে তাহাও শিক্ষা দিবে। যদি কোনো ব্যক্তি এই আদেশ অমান্য করে, তাহা হইলে "ন্যায়-বিচার-সভা"র সদস্যগণ তাহার নিকট হইতে তাহার পুত্র-কন্যাদিগের শিক্ষার ব্যয় আদায় করিয়া লইবে; যদি সেই ব্যক্তি ধনী হয়, তাহা হইলে এইরূপ ব্যবস্থা; নতুবা তাহার পুত্র-কন্যার শিক্ষার

ভার "ন্যায়-বিচার-সভা" গ্রহণ করিবে। দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের জন্যই আমরা "ন্যায়-বিচার-সভা" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।

"যে ব্যক্তি তাহার পুত্রকে কি অপর কাহারো সন্তানকে শিক্ষাদান করে, সে যেন আমার সন্তানকে শিক্ষাদান করিয়াছে।"

"বিশ্বের ফলকলিপি"তে তিনি বলিতেছেন :—

"ব্যবসায়, বাণিজ্য বা কৃষি-কার্য্য, যে উপায়েই হউক, যে ব্যক্তি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবে, তাহার কিয়দংশ তাহাকে পুত্র-কন্যার শিক্ষার্থে কোনো বিশ্বাসী ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। অর্পিত অর্থ "ন্যায়-বিচার-সভা"র সদস্যগণের পরামর্শানুযায়ী বালক-বালিকাগণের শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইবে।"

প্রকৃতিগত বিভেদ ও তারতম্য

বাহাই মতানুসারে, শৈশবে মানব-প্রকৃতি মোমের মত কোমল, শিক্ষকের ইচ্ছানুক্রমে যে কোনো রূপে গঠনীয়, এই সমস্ত কথা সত্য নহে। বাহাই মতানুসারে, প্রত্যেক শিশুই ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট একটি অপরিবর্ত্তনীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যাহার উৎকর্ষ কেবলমাত্র একটি বিশিষ্ট প্রণালীতে সাধিত হইতে পারে; প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই প্রণালী বিভিন্ন। কোনো দুইজন ব্যক্তির একই সামর্থ্য, একই শক্তি নাই ও থাকিতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষক দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতিকে কখনও একই আদর্শে গঠন করিতে চেষ্টা করিবেন না, এমন কি, তিনি কোনো একটি প্রকৃতিকেও কোনো একটি বিশেষ আদর্শে গঠন করিতে উদ্যত হইবেন না। বরং, তিনি তরুণ প্রকৃতির উন্নতিশীল শক্তি-সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তাহাদের যত্ন লইবেন, তাহাদের উৎসাহবর্দ্ধন ও হেফাজৎ করিবেন এবং তাহাদের আবশ্যকীয় বস্তুর অভাব পূরণ

করিবেন। তাঁহার কার্য্য হইবে, বিভিন্ন চারাগাছের তত্ত্বাবধায়ক উদ্যান-পালকের ন্যায়। একটি চারাগাছ সূর্য্যকিরণ পছন্দ করে, অপরটি শীতলছায়া; একটি জলাশয়ের ধার ভালবাসে, অপরটি শুষ্ক গিরিশৃঙ্গ; একটি বালুকাময় স্থানে অধিক বর্দ্ধিত হয়, অপরটি পঙ্কিল মৃত্তিকাময় স্থানে; প্রত্যেকটিকে তাহার আবশ্যকীয় বস্তু যথাযোগ্যভাবে যোগাইতে হইবে, নচেৎ তাহাদের সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্য কখনও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতে পারে না। আবদুল্‌বাহা বলিতেছেন:—

"অবতারগণ স্বীকার করেন যে শিক্ষার প্রভাব মানব-মনের উপর অত্যন্ত অধিক, কিন্তু তাঁহারা বলেন, ধারণা-শক্তি ও মনন-শক্তি মানুষে, মানুষে বিভিন্ন। আমরা দেখিতে পাই, একই পরিবেষ্টনীতে বর্দ্ধিত, একই শিক্ষা-দীক্ষায় পরিপুষ্ট, একই জাতির, একই পরিবারের, একই বয়সের দুইটি বালক ধারণা-শক্তি, বুদ্ধি-বৃত্তি ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার মানসিক শক্তিতেই বিভিন্ন। ঝিনুককে শত মসৃণ করিলেও তাহা কখনও দীপ্তিমান্ মুক্তায় পরিণত হইবে না। কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর জগৎ-উজ্জ্বল হীরক হইতে পারে না। কণ্টকাকীর্ণ "ক্যাক্‌টাস্" বৃক্ষ কখনই পুণ্য বনস্পতিতে রূপান্তরিত হইতে পারে না। অর্থাৎ, শিক্ষার গুণে মানবের অন্তর্নিহিত মানবীয় বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইতে পারে না, শিক্ষার গুণে মাত্র অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি পরিমার্জ্জিত হয়। শিক্ষার প্রভাবে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হইয়া উঠে।"—(আবদুল্‌বাহার ফলকলিপি ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৭)

চরিত্র-গঠন

শিক্ষার মর্ম্মবাণী এবং সর্ব্বপ্রধান কথা, চরিত্র-গঠন। এ সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পিতা-মাতার দৃষ্টান্তই বালক-বালিকাদিগের

চরিত্র-গঠনের পক্ষে বিশেষরূপে প্রভাববান্; পিতা-মাতার উপদেশাবলী অপেক্ষা সদ্দৃষ্টান্তই অধিকতর প্রভাবশালী হইয়া থাকে।

ঈশ্বরের অবতারগণই মানবজাতির সর্ব্ব-প্রধান শিক্ষক; বালক-বালিকাগণ শিক্ষা-গ্রহণক্ষম হইলেই অবতারগণের উপদেশাবলী এবং তাঁহাদের কর্ম্ম-জীবনের কাহিনী বালক-বালিকাগণের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া উচিত। বিশেষরূপে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক বাহাউল্লা'—যিনি মানবের ভাবী সভ্যতার মৌলিক নীতি প্রকটিত করিয়াছেন, তাঁহার উপদেশাবলী অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলিতেছেন:—

" 'আবৃহা'র লেখনীমুখে প্রকাশিত উপদেশ-বাণী তোমাদের সন্তানগণকে পড়িতে দাও, শক্তি ও মহত্ত্বের স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ সকল বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষিত ক'র। পরম করুণাময়ের ফলকলিপিগুলি তাহাদের মুখস্থ করাও, তাহারা যেন 'মস্‌রিকুল্-আজ্‌কার্' প্রাসাদে সুমধুর স্বরে তাহা পাঠ করে।"—(পশ্চিমের তারকা, ৯ম খণ্ড, নং ৭, পৃঃ ৮১)

সুকুমার কলা, বিজ্ঞান ও শিল্প

সুকুমার কলা, বিজ্ঞান এবং শিল্পে শিক্ষালাভ অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া বাহাউল্লা' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি "তজল্লীয়াৎ"এ বলিতেছেন:—

"জ্ঞানই মানব-অস্তিত্বের পক্ষবিশেষ এবং মানব-উন্নতির সোপান সদৃশ। জ্ঞান অর্জ্জন করা প্রত্যেক মানবের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সমস্ত বিজ্ঞানের সাহায্যে জগজ্জনের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, কেবলমাত্র তাহারই চর্চ্চা করা উচিত এবং যে সমস্ত বিজ্ঞান কেবল বাক্য-সর্ব্বস্ব, যাহার বাক্যেই আরম্ভ, বাক্যেই

স্থিতি, বাক্যেই শেষ, সে সমস্ত বিজ্ঞানের চর্চ্চা করা উচিত নহে। এই জগতে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীগণের বিশিষ্ট অধিকার রহিয়াছে। *** বাস্তবিক, জ্ঞানই মানবের প্রকৃত ধন-ভাণ্ডার। সম্মান, প্রতিপত্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দ-উল্লাস লাভের প্রকৃষ্টতম উপায় জ্ঞানলাভ।"

দণ্ডিত, অপরাধী ব্যক্তির প্রতি আচরণ

দণ্ডিত, অপরাধী ব্যক্তির প্রতি কিরূপ আচরণ করা উচিত, আব্দুল্‌বাহা সেই সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন:—

"এ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান কথা এই যে জনসাধারণকে এমন ভাবে শিক্ষিত করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা অপরাধমূলক কার্য্য করিতেই সঙ্কুচিত হইবে, সেই শ্রেণীর সমস্ত কার্য্যকলাপ হইতে দূরে থাকিবে, অপরাধমূলক কার্য্যমাত্রই গুরুতর শাস্তি ও চরমদণ্ডের যন্ত্রণাস্বরূপ বিবেচিত হইবে, কার্য্যটি অপরাধমূলক, এই বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াই কোনোরূপ অপরাধমূলক কার্য্য করিবে না; এইরূপে পৃথিবী হইতে অপরাধ বস্তুটি বিলুপ্ত হইবে। * * * যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে অত্যাচার বা নির্য্যাতন করে বা তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি অন্যায় সহ্য করিল সে প্রতিশোধ নিয়া থাকে; ইহাকে প্রতিহিংসা বলা হইয়া থাকে; ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও একান্ত অনভিপ্রেত। যদি ওমর যায়েদের সঙ্গে অসম্মানজনক ব্যবহার করে, তাহা হইলে যায়েদের ওমরের সঙ্গে ঐরূপ ব্যবহার করা প্রতিহিংসামূলক; উহা অতীব গর্হিত কার্য্য। বরঞ্চ, যায়েদ ওমরের সঙ্গে সুব্যবহার করিবে, ওমরের মন্দ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে তাহাকে

সুব্যবহার ফিরাইয়া দিবে, যায়েদ ওমরকে মার্জ্জনা করিবে, এমন কি, যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে ওমরের উপকার করিবে। এইরূপ আচরণ মানবের পক্ষে আদর্শ আচরণ; কারণ, প্রতিহিংসামূলক আচরণ করিলে মানব কি বিন্দুমাত্র লাভবান্ হইতে পারে? হিংসা, প্রতিহিংসা, উভয় মনোবৃত্তিই অতিশয় নিন্দার্হ, যদিও একটি অনুষ্ঠিত হয় অগ্রে, অপরটি অনুষ্ঠিত হয় তৎপশ্চাৎ। কিন্তু সমাজের দিক দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে সমাজের আত্মরক্ষা করিবার অধিকার আছে এবং সে অধিকার ব্যক্তির নহে, সমাজেরই থাকা প্রয়োজন। সমাজ হত্যাকারী ব্যক্তিকে ঘৃণা করে না, তাহার প্রতি সমাজের কোনো বিদ্বেষের কারণ থাকিতে পারে না; অন্যান্য ব্যক্তিদিগের যাহাতে কোনোরূপ অনিষ্ট না হয়, সেই জন্য সমাজ হত্যাকারী ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়া থাকে, কি কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

"যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেনঃ 'যদি কোনো ব্যক্তি তোমার এক গণ্ডে চপেটাঘাত করে, তুমি অক্ষুণ্ণচিত্তে তাহাকে তোমার অপর এক গণ্ড ফিরাইয়া দিবে'। যীশুখৃষ্ট ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বিরুদ্ধে ঐ বাণী প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণীর তাৎপর্য্য ইহা নহে যে যদি শার্দ্দূল মেষকুলের উপর নিপতিত হইয়া মেষকুলকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে শার্দ্দূলকে ধ্বংস করিতে উৎসাহিত করিতে হইবে বা উৎসাহিত করাই কর্ত্তব্য। না, তাহা নহে; যীশুখৃষ্ট যদি দেখিতেন, শার্দ্দূল মেষকুলের উপরে পতিত হইয়া মেষকুলকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই শার্দ্দূলকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন ও নিবৃত্ত করিতেন * * *

"সব সমাজেরই ভিত্তীভূত ব্যবস্থা ন্যায়পরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যীশুখৃষ্টের উদ্ধৃত বাণীর তাৎপর্য্য ইহা নহে যে যখন অন্য

জাতি আসিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে, তোমাদের গৃহ দগ্ধ করিয়া নিশ্চিহ্ন করিবে, তোমাদের দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিবে, তোমাদের রমণী-কুলকে লাঞ্ছিত করিবে, তোমাদের সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনদের উপর অন্যায়-অত্যাচার করিবে, তোমাদের সম্মানের অবমাননা করিবে, তোমরা সেই সমস্ত স্বেচ্ছাচারী শত্রুগণের সমক্ষে বিনা প্রতিবাদে তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিবে ও তাহাদিগকে সর্ব্ব-প্রকারের অত্যাচার, অনাচারের অনুষ্ঠান করিতে স্বচ্ছন্দচিত্তে অনুমতি দিবে। যীশুখৃষ্টের বাণী, ব্যক্তিগণের পরস্পর আচার, ব্যবহার সম্বন্ধে আদর্শ-নির্দ্দেশক; সে বাণী ব্যক্তির সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সমাজের সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য নহে। যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করে, তাহা হইলে আঘাতসহ্যকারী ব্যক্তির কর্ত্তব্য আঘাতকারীকে মার্জ্জনা করা; কিন্তু মানবের অধিকার সমাজ-সঙ্ঘকে রক্ষা করিতে হইবে; সে স্থলে মার্জ্জনার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

"একটি কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বসমাজে শাস্তিমূলক বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করা হইতেছে, শাস্তির উপায়সমূহ উদ্ভাবিত হইতেছে, অহরহঃ সেই সমস্ত হিংস্র অনুষ্ঠানের আয়োজন চলিতেছে। তাহারা কারাগার নির্ম্মাণ করিতেছে, শৃঙ্খল প্রস্তুত করিতেছে, নির্ব্বাসনের উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া সেই স্থান দুরধিগম্য, ভয়ানক করিবার জন্য নানা যন্ত্রণার উপায়, নানা কঠোর শাস্তি-প্রণালী আবিষ্কার করিতেছে; তাহারা মনে করে, এইরূপে তাহারা অপরাধীর অপরাধের কঠোরতম শাস্তি বিধান করিয়া পৃথিবী হইতে অপরাধী-মনোবৃত্তি নির্ব্বাসিত করিবে। কিন্তু তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। এই সমস্ত হিংস্র উপায় অবলম্বন করিয়া তাহারা মানবের চরিত্র ক্রমশঃই খারাপ হইতে খারাপতর করিয়া তুলিতেছে, তাহারা

মানব-চরিত্রের নৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। সমাজের যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য, মানবের শিক্ষাবিধান করিবার জন্য, মানবকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত করিবার জন্য। তাহা হইলেই নৈতিক চরিত্র উন্নত হইবে, অপরাধ বা আইন-লঙ্ঘন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে।"—(কতিপয় প্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ৩০৭-৩১২)

মুদ্রা-যন্ত্রের প্রভাব

জ্ঞান-প্রচার-কার্য্যে মুদ্রাযন্ত্রের অসীম প্রভাব, মুদ্রাযন্ত্রের সভ্যতা বিস্তারের ক্ষমতা ইত্যাদি সমস্তই বাহাউল্লা' বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্র সৎপথে পরিচালিত হইলে শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে অশেষ উপকার করিতে পারে। "ত্বরাজাৎ"এর ফলক লিপিতে তিনি বলিতেছেন :—

"বর্ত্তমান যুগে জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, জগৎবাসীগণের নিকটে তাহা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সংবাদ-পত্র পৃথিবীর দর্পণ-স্বরূপ; ইহা ক্ষণকালের মধ্যেই পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বার্ত্তা বহন করিয়া লয়। নানা বিভিন্ন দেশ, নানা বিভিন্ন জাতির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সংবাদ-পত্রে সেই সমস্ত তথ্য প্রোজ্জ্বল ভাষায় মুদ্রিত হয়, জগৎবাসী সংবাদপত্রের বাণী শুনিতে পায়। বাস্তবিক পক্ষে, সংবাদপত্র এমন এক দর্পণ-সদৃশ, যাহার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাক্‌শক্তি আছে; সংবাদপত্র অতীব বিস্ময়কর বস্তু।

"কিন্তু সংবাদ-পত্র-সেবী সম্পাদকদিগের চরিত্র অতি সাধু ও মহৎ হওয়া উচিত; সম্পাদকগণ সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার, লোভ সযত্নে পরিহার করিবেন; কেবলমাত্র সম্পাদকদিগের সম্বন্ধে এই কথা নহে;

সংবাদ-পত্রে যাঁহারা লিখিবেন, তাহারা সকলেই ন্যায়পরতা ও সুবিবেচনা-রূপ অলঙ্কারে ভূষিত হইবেন। তাঁহারা লিখিবার পূর্ব্বে কোনো একটি বিষয় সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিয়া সুবিবেচনা-সহকারে তাহা বিচার করিবেন। এই অত্যাচারিত, নির্য্যাতিত ব্যক্তি সম্বন্ধে অদ্যাবধি সংবাদ-পত্রে যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই সত্য নহে। জ্ঞানের দিক্‌চক্রবালরেখা ভেদ করিয়া সত্য-বাদিতা এবং বিনয়বচনরূপী সূর্য্য সমুদিত হয়; সর্ব্বোপরি অবস্থিতি এবং প্রাধান্য হিসাবে উহা সূর্য্যের মতই স্বপ্রকাশ।

দশম অধ্যায়

শান্তির পথে

"আজ, এই ভৃত্য পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছে; ধরাপৃষ্ঠে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে মিলিত করাও এই ভৃত্যের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইবে; তোমরা দেখিবে, পৃথিবী সর্ব্বপ্রভাময় (আ'বুহা) স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়াছে।"—("র'ইস"এর ফলকলিপি, বাহাউল্লা')

বিরোধ এবং বিরোধ-শান্তি

গত শতাব্দীতে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সাধিত হইয়াছে, তাহার ফলে, অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে জৈব জগতে ও উদ্ভিদ জগতে, নিষ্ঠুরতম যুদ্ধমানতাই প্রাকৃতিক নিয়মের মূলীভূত তথ্য, অস্তিত্ব সংগ্রামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্য। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন, মানব-সমাজেও ঐ নিয়ম অনুসরণ করাই প্রকৃষ্ট, সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে অপসারিত করাই সমগ্র সমাজকে শক্তিশালী করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু অপরপক্ষে বাহাউল্লা' বলিতেছেন যে সমাজের হিতসাধন করিতে হইলে আমাদিগকে জৈবজগৎ বা উদ্ভিদজগৎ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিলে চলিবে না, আমাদিগকে অবতারগণের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে; তিনি বলিয়াছেন, মানব-সমাজকে

উন্নত করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের সৃষ্টি হইতে উপায়-নির্দ্দেশের ইঙ্গিত লইলে চলিবে না, অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তর হইতে আধ্যাত্মিক উপায়ের নির্দ্দেশ স্বীকার করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, সতত আত্মরক্ষা করিবার যে দারুণ প্রচেষ্টা আমরা নিম্নস্তরের জীব-জন্তুর মধ্যে দেখিতে পাই, অবতারগণ তাহার ঠিক বিপরীত উপদেশ দিয়াছেন, কারণ, অবতারগণ পরস্পর-যুধ্যমানতার পরিবর্ত্তে পরস্পরের প্রতি প্রেম, পরস্পরের প্রতি দয়া, দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি প্রভৃতি নীতি সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই দুই নীতির মধ্যে আমাদিগকে একটি নীতি বাছিয়া লইতে হইবে, কারণ, এই দুই পরস্পর-বিপরীত নীতির মধ্যে সমন্বয়-সৃষ্টি অসম্ভব। আবুদুল্‌বাহা বলিতেছেন :—

"প্রাকৃতিক জগতে সর্ব্বপ্রধান কথা, নিয়ত পরস্পরের মধ্যে যুধ্যমানতা ; তাহার ফলে বলবত্তম টিকিয়া থাকে, দুর্ব্বল ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয়। শক্তিমান্ বাঁচিয়া থাকিবে, শক্তিহীন মরিয়া যাইবে, এই নীতিই সর্ব্বপ্রকার গোলযোগের মূল। ইহাই যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, বস্তুতঃ মানব-সমাজের যাহা কিছু অধঃপতনের কারণ, সমস্তই সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক রাজ্যে আমরা দেখিতে পাই যথেচ্ছাচারিতা, অতি-মাত্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আঘাত, প্রত্যাঘাত, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ, স্বাধিকার-প্রমত্ততা প্রভৃতি অশেষবিধ দোষ পরিপূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান রহিয়াছে ; জৈবজগৎ সর্ব্বপ্রকার দোষ-দুষ্ট, যাহা কিছু দোষাবহ, তাহাই সেখানে দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত আমরা জৈবজগতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মানব-সমাজের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিব, ততদিন কৃতকার্য্যতা আসিবে না, সমাজকে উন্নত করিবার চেষ্টা ফলবতী হইবে না। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি অতি নিষ্ঠুর ; প্রকৃতি রক্ত-পিপাসু, প্রকৃতি সততই যুধ্যমান, প্রকৃতি স্বেচ্ছাতান্ত্রিক ; কিন্তু ইহার কারণ

এই যে প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞাত নহে, সে ঈশ্বরকে জানে না। এই কারণে, জৈবজগতে নিষ্ঠুরতম নীতিসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; সেখানে নিষ্ঠুরতাই স্বাভাবিক অবস্থা।

"মানবজাতির পরম-প্রভু মানবজাতির প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া অবতারদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, পবিত্র গ্রন্থাবলী প্রকটিত করিয়াছেন,—পৃথিবীবাসী জনসাধারণ যেন স্বর্গীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, অনুপ্রাণিত হইয়া প্রকৃতির আবিলতা ও অজ্ঞানতার তমোরাশি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, আদর্শ সদ্‌গুণ ও ঐশ্বরিক বিশেষণে বিশেষিত হয়, করুণা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি মানসিক সুকুমার বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হইতে পারে।

"হায়, এখনও শত সহস্রবার, পৃথিবীর জাতিসমূহ পরস্পরের প্রতি অস্বাভাবিক বিরোধ-ভাব ও হিংস্র যুধ্যমানতার পরিচয় দিয়া থাকে; তাহারা কুসংস্কারান্ধ, তাহারা জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয় নাই। এইরূপে তাহারা পৃথিবীর প্রগতি-পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। পৃথিবীর সভ্যতার অগ্রগতি রুদ্ধ হইতেছে, স্বর্গীয় নীতিগুলি বিস্মৃত হইতেছে, অবতারগণের অমৃতবাণীর উপদেশ ভুলিয়া সকলে অসৎ পথে পরিচালিত হইতেছে।"—(পশ্চিমের তারকা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৫)

সর্ব্বব্যাপী মহান্ শান্তি

যুগে যুগে ঈশ্বরের অবতারগণ "পৃথিবীতে শান্তি, মানব-সমাজে মৈত্রী" স্থাপিত হইবার যুগাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে বাহাউল্লা' ঐ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমর্থন করিতেছেন এবং বলিতেছেন যে সেই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার সময় সমাগত হইয়াছে। আব্‌দুল্‌বাহা বলিতেছেন:—

"এই অতীব বিস্ময়কর যুগে পৃথিবীর রূপ পরিবর্ত্তিত হইবে,

মানব-সমাজ শান্তি ও সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইবে। বিবাদ, বিসম্বাদ, কলহ, হত্যা সমস্তই অন্তর্হিত হইবে; জাতিতে জাতিতে, উপজাতিতে উপজাতিতে, দেশে দেশে প্রেম, সাম্য-বুদ্ধি, সমবায়-বুদ্ধি দেখা দিবে। সর্ব্ববিশ্বসমবায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, যুদ্ধ-বিগ্রহ পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে। * * * সার্ব্বজনীন, একচ্ছত্র শান্তি ধরণীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে; অনন্ত জীবনের মহাবনস্পতি সর্ব্ব-বিশ্বোপরি তাহার ছায়া ছড়াইয়া দিবে, প্রাচী-প্রতীচী সেই ছায়ায় আধ্যাত্মিক চৈতন্য লাভ করিবে। শক্তিশালী, শক্তিহীন, ধনী, নির্ধন, পরস্পর যুধ্যমান্ সম্প্রদায় ও জাতিসমূহ, শার্দ্দূল এবং মেষশাবক, সিংহ এবং গোবৎস, চিতাবাঘ এবং ছাগশিশু সকলেই সকলের প্রতি প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করিবে, বন্ধুতাসহকারে ন্যায়-পরতা সহকারে আচরণ করিবে। বিজ্ঞানের জ্ঞান, ঈশ্বরের জ্ঞান, সর্ব্বসৃষ্টির মর্ম্মনিহিত রহস্য সম্বন্ধে দিব্যজ্ঞান পৃথিবী পরিপূর্ণ করিবে।"
—(কতিপয় প্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ৭৩)

ধর্ম্মগত বিদ্বেষ ও কুসংস্কার

সর্ব্বব্যাপী মহান্‌শান্তি কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য, প্রথমে আমরা দেখিব কোন্ কোন্ কারণে অতীত কালে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল এবং বাহাউল্লা' তাহাদের প্রত্যেকটির প্রতিবিধানার্থে কি কি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ধর্ম্মগত কুসংস্কারই যুদ্ধ-বিগ্রহের অন্যতম প্রধান কারণ। এই সম্বন্ধে বাহাই উপদেশাবলী অতি সুস্পষ্ট বিশদ ভাষায় বলিয়া দিতেছে যে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধের সৃষ্টি কখনও প্রকৃত ধর্ম্মের কারণে হয় নাই, বরং প্রকৃত ধর্ম্মের অভাব এবং

ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অন্ধ-অনুকরণ-প্রচেষ্টা, অপ্রকৃত ধারণাই তাহার প্রকৃত কারণ।

প্যারিসে এক আলাপ-প্রসঙ্গে আব্‌দুল্‌বাহা বলিতেছেন:—

"ধর্ম্ম হৃদয়গুলিকে সম্মিলিত করিবে এবং ধরাপৃষ্ঠ হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহকে চিরতরে বিতাড়িত করিবে। ধর্ম্ম আধ্যাত্মিকতার জন্মদান করিবে এবং প্রত্যেক আত্মায় আলোক ও জীবন সঞ্চারিত করিবে। ধর্ম্ম যদি বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং বিরোধের কারণ হয়, তাহা হইলে এই ধর্ম্ম থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল এবং তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকাই প্রকৃত ধর্ম্ম-কার্য্য হইবে। যেহেতু ঔষধের উদ্দেশ্য রোগারোগ্য করা, ঔষধ যদি রোগ আরোগ্য না করিয়া রোগ বৃদ্ধি করে, ঔষধ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। যেই ধর্ম্ম, প্রেম ও একতা সৃষ্টি করে না, তাহা ধর্ম্মই নহে।"—(প্যারিসে কথাবার্ত্তা, পৃঃ ১৮০)

অপর একস্থলে তিনি বলিতেছেন:—

"সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গণ পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ দিতেছে, পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অভিযোগ করিতেছে, তাহারা পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও অসূয়াভাব পোষণ করিয়া কঠোরভাবে পরস্পরের সঙ্গ-বর্জ্জন করিতেছে। তোমরা ধর্ম্মযুদ্ধের ইতিহাস আলোচনা ক'র। ক্রুসেড্ নামক ধর্ম্মযুদ্ধ দুইশত বৎসরের অধিক কাল চলিয়াছিল। কখন কখন ক্রুসেডারগণ বিজয়ী হইত—মুসলমানদিগকে হত্যা করিত, তাহাদের গৃহাদি লুণ্ঠন করিত, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। আবার, কখন কখন মুসলমানগণ বিজয়ী হইয়া আক্রমণকারী ক্রুসেডারগণের রক্তপাত করিত, অশেষ প্রকারে তাহাদের ধ্বংস-সাধন করিত।

"এইরূপে তাহারা দুইশত বৎসর কাটাইয়াছিল—সময় সময় উত্তেজনার সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং ক্লান্তির কারণে ক্ষণিক বিশ্রাম করিয়া,—যে পর্য্যন্ত না য়ুরোপীয় যোদ্ধাগণ প্রাচ্য-দেশ পরিত্যাগ করিল এবং তাহাদের পিছনে ধ্বংস ও সর্ব্বনাশের ছাই-ভস্ম ফেলিয়া গেল, এবং নিজেদের দেশে গিয়া আপন লোকদিগকে বিদ্রোহ ও হাঙ্গামায় উন্মোদিত দেখিতে পাইল। ইহা একটিমাত্র ধর্ম্মযুদ্ধের পরিণাম-ফল।

"ধর্ম্মযুদ্ধ অনেক হইয়াছে। প্রটেষ্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দীর্ঘকালব্যাপী নিদারুণ কলহ চলিয়াছিল, তাহাতে নয় লক্ষ প্রটেষ্ট্যাণ্ট প্রাণ হারাইয়াছিল। অসংখ্য প্রটেষ্ট্যাণ্ট কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের প্রতি কি ভীষণ, অমানুষিক অত্যাচারই করা হইয়াছিল। এ সমস্তই ধর্ম্মের নামে হইয়াছিল।

"খৃষ্টান ও মুসলমানগণ য়িহুদীদিগকে শয়তানের অনুচর, ঈশ্বরের শত্রু মনে করিত; এই কারণে তাহাদিগকে অভিশাপ দিত, নির্য্যাতিত করিত; বহুসংখ্যক য়িহুদীকে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহাদের গৃহাদি লুন্ঠিত ও ভস্মীভূত এবং সন্তানগণকে বন্দী করা হইয়াছিল। অপরপক্ষে, য়িহুদীগণও খৃষ্টানদিগকে নাস্তিক এবং মুসলমানকে ধর্ম্মের শত্রু এবং হজরত মুসার বিধি-নিষেধ-লঙ্ঘনকারী বলিয়া বিবেচনা করিত। সুতরাং, য়িহুদীগণও তাহাদের উপর অত্যাচার করিত এবং অদ্যাবধি তাহাদিগকে অভিশাপ দিতেছে।

"যখন বাহাউল্লা'র ভাস্বর সূর্য্য প্রাচীদেশ হইতে উদিত হইল, তিনি মানবজাতির একতা সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির সমাপন ঘোষণা করিলেন। তিনি সমগ্র মানবজাতিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন: 'তোমরা সকলেই একই বৃক্ষের ফল। এমন দুইটি বৃক্ষ নাই,—যাহার একটি ঈশ্বরের করুণার দ্বারা সিঞ্চিত, অপরটি শয়তানের'। সুতরাং, আমরা

পরস্পরের প্রতি একান্ত প্রেমপূর্ণ আচরণ করিব, কাহাকেও শয়তানের আশ্রিত বলিয়া মনে করিব না, বরং সকলকেই একই ঈশ্বরের সেবক বলিয়া বিবেচনা করিব। বাস্তবিকপক্ষে, প্রকৃত কথা ত এই: কেহ কেহ পথ-ভ্রান্ত, তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিতে হইবে, শিক্ষিত করিতে হইবে। আবার, কেহ কেহ জ্ঞানহীন, তাহাদিগকে জ্ঞান দান করিতে হইবে, কেহ কেহ বালকের ন্যায়, তাহাদের পূর্ণ পরিণতির জন্য তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। কেহ কেহ অসুস্থ, তাহাদের নৈতিক অবস্থা ভাল নহে, তাহাদের অবস্থা ভাল ও শুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের চিকিৎসা করিতে হইবে। পীড়িতকে ঘৃণা করিতে নাই, যেহেতু সে পীড়িত; বালককে বর্জ্জন করিতে নাই, যেহেতু সে বালক; অজ্ঞকে অবজ্ঞা করিতে নাই, যেহেতু সে অজ্ঞ। অতএব, মমতা সহকারে তাহাদের প্রত্যেকের চিকিৎসা করা, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষিত করা এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহাদিগকে সাহায্য করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদের প্রত্যেক কার্য্য এভাবেই করিতে হইবে, যাহাতে সমগ্র মানবজাতি ঈশ্বরের ছায়াশ্রিত হইয়া পরম শান্তিতে, চরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।"—(পশ্চিমের তারকা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬)

জাতীয় বিদ্বেষ ও দেশাত্মবোধ-জনিত কুসংস্কার

মানবজাতির একত্ব সম্বন্ধে বাহাই উপদেশাবলী জাতিগত বিদ্বেষের—তথা যুদ্ধ-বিগ্রহের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। কতকগুলি জাতি বিবেচনা করে যে তাহারা অন্যান্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং 'শক্তিমান্

বাঁচিয়া থাকিবে, শক্তিহীন মরিয়া যাইবে' এই নীতিকে ভিত্তি করিয়া, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতিদিগকে নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করিবার, এমন কি, তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিবারও উহাদের ন্যায্য অধিকার আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা এই কলঙ্কপূর্ণ নিষ্ঠুর নীতি-প্রয়োগের দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। বাহাই মতানুসারে বিভিন্ন জাতির ব্যক্তিবর্গ ঈশ্বরের সমক্ষে সমতুল্য। তাহাদের প্রত্যেকেই এক বিস্ময়কর অন্তর্নিহিতশক্তির অধিকারী, যাহার উন্মেষের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন; প্রত্যেকেই এইরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম, যাহা মানব-সমাজ-দেহের কোনো অংশেরই শক্তি হ্রাস না করিয়া, প্রত্যেক অংশকে শক্তিশালী করিয়া তাহাদের সকলেরই পরিপূর্ণ পরিণতি ঘটাইতে পারে। আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন :—

"এক জাতি অপর জাতির প্রতি সংস্কারবশে বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিয়া থাকে। ইহা ভ্রান্ত, অবাস্তব ধারণা: ইহা শুদ্ধ কুসংস্কার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতির একই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। * * * সৃষ্টির প্রারম্ভে জগতে সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল না, দেশে দেশে বিভেদ ছিল না; পৃথিবীর কোনো বিশেষ অংশই কোনো বিশেষ জাতির অধিকারভুক্ত ছিল না। ঈশ্বরের চক্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। মানব কি জন্য এরূপ একটি নিদারুণ কুসংস্কারগ্রস্ত হইয়া পড়িল? এইরূপ একটি ভ্রান্ত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা কিরূপে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে পারি? পরস্পর পরস্পরকে বিনষ্ট করিবে, এই জন্য ঈশ্বর মানবকুল সৃষ্টি করেন নাই। সমস্ত জাতি, উপজাতি, সম্প্রদায় সমভাবে সেই স্বর্গীয় পিতার পরম করুণাধারায় অভিষিক্ত হইয়া থাকে।

"ঈশ্বরের প্রদত্ত আইনের অনুবর্ত্তিতা এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-ভাবের তারতম্য লইয়াই প্রকৃত বিভেদ বিদ্যমান; অনেকে প্রজ্বালিত মশালের মত, অপর অনেকে মানবসমাজে, আকাশে তারকাকুলের ন্যায় দেদীপ্যমান্। মানব-প্রেমিকই প্রকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁহাদের জাতি, দেশ বা ধর্ম্মে কিছু আসিয়া যায় না।"—(প্যারিসে কথাবার্তা, পৃঃ ১৩৬)

রাষ্ট্রীয় বা দেশাত্মবোধজনিত কুসংস্কার, জাতীয় কুসংস্কারের ন্যায় সমভাবে অনিষ্টকর। সঙ্কীর্ণ স্বদেশ প্রেমকে পৃথিবীরূপ সুবৃহৎ দেশ-প্রেমে বিসর্জ্জন দেওয়ার সময় সমাগত। বাহাউল্লা' বলিতেছেন:—

"পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত যুগে বলা হইয়াছে: 'স্বদেশকে ভালবাসাই বিশ্বাসের প্রধান কথা'; কিন্তু এই পরম-প্রকাশের দিনে 'মহত্ত্বের রসনা' বলিতেছেন: 'যে ব্যক্তি নিজের দেশকে ভালবাসে, প্রশংসার্হ বা মহিমা-সম্পন্ন সে ব্যক্তি নহে; যে ব্যক্তি মানব-মাত্রকেই ভালবাসে, সে ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষে ধন্য'। তিনি এই মহনীয় বাণীর দ্বারা আত্মা-পাখীকে এক অভিনব উড্ডয়ন শিক্ষা দিলেন, এবং পবিত্র গ্রন্থ হইতে সীমাবন্ধনের এবং অন্ধ-অনুকরণের কারণ বিদূরিত করিলেন।"—(বিশ্বের ফলকলিপি)

রাষ্ট্রীয় লোভ, প্রলোভন

সামান্য ভূমিখণ্ডের অধিকার লোভে দুই বা ততোধিক জাতির মধ্যে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছে। ভূমির অধিকারলোভ জাতি সমূহের মধ্যে যেমন যুদ্ধ-বিগ্রহের সর্ব্বপ্রধান কারণ, তেমনি ইহা মানবের ব্যক্তিগত জীবনেও যুদ্ধ-বিগ্রহের সর্ব্বপ্রধান কারণ। বাহাই মতানুসারে

ভূমি খণ্ড কোনো এক ব্যক্তির বা কোনো এক রাষ্ট্র বিশেষের সম্পত্তি হইতে পারে না,—তাহা সমগ্র মানবজাতিরই সম্পত্তি, ঈশ্বর একাই ইহার অধিকারী, মানবকুল প্রজামাত্র।

বেন্‌গাজীর যুদ্ধ উপলক্ষ্যে আব্‌দুল্‌বাহা বলিয়াছিলেন :—

"বেন্‌গাজীর যুদ্ধের সংবাদ শুনিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগেও পৃথিবীতে এই ভীষণ বর্ব্বরতা আছে, দেখিয়া আমি অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছি। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত, মানুষ কেমন করিয়া মানুষের রক্তপাত করাইতে পারে, কেমন করিয়া মানব, তাহার সমধর্ম্মী মানবকে হনন করিতে পারে, ইহাই আমার নিকটে অতি বিস্ময়কর মনে হয়। আর যখন চিন্তা করি, কি সামান্য উদ্দেশ্যে তাহারা এই ঘোরতর পাপ সমস্ত দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত করিতেছে, তখন আমি অধিকতর বিস্মিত হই। তাহাদের উদ্দেশ্য, পৃথিবীর অতি সামান্য একটি অংশ তাহারা অধিকার করিবে। পশুগণও এতদপেক্ষা বাস্তব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধ করিয়া থাকে; পশুগণও যখন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করে, তখন এতদপেক্ষা সঙ্গত কারণে তাহারা যুদ্ধ করে। মানব উচ্চতর সভ্যতার অধিকারী হইয়াও সহধর্ম্মী মানবের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে, তাহাদিগের অশেষ দুঃখ সৃষ্টি করে ও তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে, ইহা কি ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা; তাহারা এতদূর নীচে নামিতে পারে, ইহা কল্পনার অতীত। ঈশ্বরের সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি মানব, সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম সৃষ্টি, ভূমির একখণ্ড অধিকার করিবার জন্য এরূপ নিদারুণ আচরণ করিতে পারে, ইহা মনে করিলেও শোকে অভিভূত হইতে হয়।

"ভূমির অধিকারী কোনো এক জাতি নহে, ভূমির প্রকৃত

অধিকারী সর্ব্ব-পৃথিবীর জাতিকুল। পৃথিবী মানবের আবাস-স্থল নহে, পৃথিবী মানবের সমাধি।

"কোনো বিজেতা বীর যত অধিক সংখ্যক দেশই জয় করুন না কেন, যত অধিক সংখ্যক' দেশের জনসাধারণকেই দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করুন না কেন, শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার সমাধির জন্য উপযোগী ক্ষুদ্র একখণ্ড ভূমি ব্যতীত আর কিছুই নিজের জন্য রাখিতে পারিবেন না। যত অধিক সংখ্যক দেশই তিনি বিধ্বস্ত করুন না কেন, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার অদৃষ্টে বজায় থাকিবে মাত্র এক খণ্ড ভূমি, তাহাতেই তাঁহার দেহ সমাহিত হইবে।

"জনসাধারণের অবস্থা উন্নত করিবার নিমিত্ত এবং তাহাদের মঙ্গলসাধণের জন্যই যদি দেশের আয়তন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে তাহা করা সম্ভব। কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃত কারণ, মানবের লোভ এবং উচ্চাশা চরিতার্থ করা। জাগতিক লাভের জন্য কতিপয় ব্যক্তি অগণন গৃহে অশান্তির বহ্নি জ্বালাইয়া দে', অসংখ্য পরিবারের নিদারুণ কষ্টের কারণ হয়, শত সহস্র নরনারীর হৃদয় অত্যাচারের নিষ্পেষণে ভাঙ্গিয়া দে'।

"আমি তোমাদিগকে আদেশ করিতেছি, তোমরা কায়মনোবাক্যে প্রেম ও মৈত্রীভাবের উপর অন্তঃকরণ নিবদ্ধ ক'র। যুদ্ধের চিন্তা যখন সকলের মন সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তোমরা তখন শান্তির চিন্তা দ্বারা তাহা প্রতিহত করিবে; শান্তির চিন্তা, যুদ্ধের চিন্তা হইতে বলবত্তর হইবে, তাহা হইলেই যুদ্ধ ঘটিতে পারিবে না। একাগ্রচিত্তে শান্তি চিন্তা করা প্রত্যেকের একান্ত-কর্ত্তব্য। মনের বিদ্বেষ-ভাব অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিমান্ প্রেম-ভাব দ্বারা বিজিত করিতে হইবে। রাষ্ট্রের সৈন্য-বাহিনী যখন পরস্পর পরস্পরের কণ্ঠ আঁকড়িয়া ধরিবে, তখন

ঈশ্বরের পুণ্য-সেনা-বাহিনী পরস্পর পরস্পরের হাত ধরিয়া প্রেমের মহা-সঙ্গীত গান করিবে। পবিত্র হৃদয় লইয়া, একান্ত আগ্রহ সহকারে ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়া শান্তি-প্রতিষ্ঠাকল্পে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেই যুদ্ধের বর্ব্বরতা বিদূরিত হইবে। পৃথিবীতে সর্ব্বব্যাপী মহান্ শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব, এরূপ মনে করিও না। ঈশ্বরের দয়া হইলে, কিছুই অসম্ভব নয়। তোমরা যদি পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির সঙ্গে একান্ত আগ্রহ সহকারে মৈত্রী কামনা কর, তাহা হইলে তোমাদের প্রেম-ভাব শত ধারায়, সর্ব্বদিকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িবে, প্রেমের বাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে; তাহা অপর সমস্ত ব্যক্তির হৃদয় স্পর্শ করিবে, ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিবে, পরিশেষে সর্ব্ব-মানবকুলের প্রেরণা-স্বরূপ হইয়া উঠিবে।"—(প্যারিসে কথাবার্ত্তা, পৃঃ ২৩)

সার্ব্বজনীন ভাষা

কি কি কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়া থাকে এবং কি উপায়ে তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে স্থূলভাবে জানিয়া লওয়ার পর, সর্ব্বব্যাপী মহান্-শান্তি কিরূপে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে তদসম্বন্ধে প্রভু বাহাউল্লা' যে সমস্ত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এখন আমরা তাহার সমালোচনা করিতেছি।

তাঁহার প্রদর্শিত উপায়গুলির মধ্যে একটি সার্ব্বজনীন ভাষা সৃষ্টি করা ও তাহা পরিব্যাপ্ত করাকে তিনি সর্ব্বপ্রধান স্থান দিয়াছেন। তিনি "আক্‌দাস্ গ্রন্থে" ও অনেক ফলকলিপিতে এই সার্ব্বজনীন ভাষা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। "য়িশ্‌রাক্বাৎ"এর ফলকলিপিতে বলিতেছেন :—

"ষষ্ঠ 'য়িশ্‌রাক্' (ঔজ্জ্বল্য)—ঈশ্বরের ভৃত্যগণের একতা ও মিলন। মিলনের আলোকে পৃথিবীর সমস্ত অংশ, সর্ব্বকালে আলোকিত হইয়াছে;

যে উপায়ে এই মহনীয়, অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহার মধ্যে একটি উপায় এই যে সর্ব্বজাতির, সর্ব্বদেশের জনসাধারণ পরস্পরের লিখিত এবং কথিত ভাষা বুঝিতে পারিবে। ইতঃপূর্ব্বে, আমরা আমাদের পত্রে 'ন্যায়বিচার-সভা'র সদস্যদিগকে আদেশ করিয়াছি যে তাহারা বর্ত্তমান জগতে প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্য হইতে একটি ভাষা নির্ব্বাচন করিবে বা একটি নূতন ভাষা সৃষ্টি করিবে, যদ্দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত জনসাধারণ একতাবদ্ধ হইতে পারে; পৃথিবীর সমস্ত বিদ্যালয়ে বালকগণ এই ভাষা লিখিতে এবং বলিতে শিখিবে, পৃথিবী ক্রমে একটি দেশে, একটি আবাস-গৃহে পরিণত হইবে।"

বাহাউল্লা' যে সময়ে এই সার্ব্বজনীন ভাষা-প্রতিষ্ঠার আদেশ জগৎবাসীগণকে শুনাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে পোলাণ্ড দেশে লুডেভিক্ জ্যামেন্‌হফ্ নামক এক শিশু জন্মগ্রহণ করিল। বিধাতার ইঙ্গিতে এই শিশুই বড় হইয়া ভাবীকালে পৃথিবীতে একটি সর্ব্ব-সাধারণের ব্যবহার্য্য, সার্ব্বজনীন ভাষা প্রণয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বাহাউল্লা'র আদেশ এইরূপে জ্যামেন্‌হফ্ কর্ত্তৃক বাস্তবে পরিণত হইল। শৈশব হইতেই জ্যামেন্‌হফের মনে সার্ব্বজনীন ভাষা প্রণয়নের কল্পনা বিশেষরূপে প্রবল হইয়া দেখা দিল; তিনি একান্ত একাগ্রতা সহকারে সমস্ত জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিয়া পরিশ্রমের পরিণত ফলস্বরূপ "এস্‌পেরান্টো" নামক ভাষা পৃথিবীকে দিয়াছেন। গত পঞ্চত্রিংশ বৎসর ধরিয়া এস্‌পেরান্টো ভাষা চলিতেছে; এই সময়ের মধ্যে তাহা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিতে পারে না। এই ভাষার একটি প্রধান সুবিধা এই যে ইংরাজী, ফরাসী বা জার্ম্মান ভাষা শিখিতে যে সময় লাগে, এস্‌পেরান্টো ভাষা শিখিতে তাহার মাত্র

কুড়ি ভাগের এক ভাগ সময় লাগিয়া থাকে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারিস মহানগরীতে এস্পেরাণ্টো সমিতির ভোজে আব্দুল্‌বাহা বলিয়াছিলেন :—

"বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপের আন্তর্জাতিক অশান্তির একটি প্রধান কারণ এই যে ভাষা অসংখ্য এবং বিভিন্ন;—আমরা বলি, এই ব্যক্তি জার্ম্মান, অপর একজন ইটালিয়ান, এই ব্যক্তি ইংরাজ, এই ব্যক্তি ফরাসি ইত্যাদি; যদিও তাহারা সকলেই মূলতঃ এক জাতি হইতে উদ্ভূত, তথাপি ভাষা-বৈষম্যই তাহাদের মিলনের পথে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। যদি কোনো একটি সার্ব্বজনীন ভাষার ব্যবহার সমগ্র পৃথিবীতে প্রচলিত হইত, তাহা হইলে, এইরূপ অবস্থা থাকিত না, সকলেই সকলকে এক পরিবারভুক্ত, এক জাতীয় মনে করিত।

"প্রভু বাহাউল্লা' চল্লিশ বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে এই আন্তর্জাতিক, সার্ব্বজনীন ভাষার কথা লিখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে যতদিন একটি আন্তর্জাতিক ভাষা পৃথিবীর জন সাধারণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হইতেছে, ততদিন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ একত্রে মিলিত হইবার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইবে না; কারণ, আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে পরস্পর পরস্পরের কথা বুঝিতে না পারিলে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিশিতেও পারে না। যাহাতে পৃথিবীর সমস্ত দেশের অধিবাসীগণ পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারে, সেজন্য একটি আন্তর্জাতিক ভাষা প্রতিষ্ঠিত করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। "

"সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, প্রাচ্যদেশবাসী জনসাধারণ প্রতীচ্য-দেশ-সমূহে কি কি ঘটনা ঘটিতেছে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সংবাদ রাখে না; সেইরূপ প্রতীচ্য-দেশবাসীরাও প্রাচ্য-দেশবাসীদিগের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নহে। এই কারণে, তাহারা পরস্পর

পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্নও হইতে পারে না; প্রাচ্য-প্রতীচ্য জগতের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের পথে প্রধানতম অন্তরায়, ভাষা বৈষম্য; ভাষার মধ্য দিয়া সংযোগ-পথ যেরূপ দ্রুত ও স্থায়ী আকারে নির্ম্মিত হয়, অন্য কোনো উপায়ে তাহা হয় না। প্রাচ্য-প্রতীচ্য-জনসাধারণের মনের ভাব যেন প্রত্যেকের নিকটে একটি কৌটায় আবদ্ধ রহিয়াছে; ভাষা-বৈষম্যের জন্য সে কৌটা খুলিতে পারা যায় না, ভাব-বিনিময়ও সম্ভব হয় না। আন্তর্জাতিক ভাষারূপ সর্ব্বোন্মোচনকারী চাবির সাহায্যে ইহা খোলা যাইবে। আমাদের সার্ব্বজনীন, আন্তর্জাতিক ভাষা থাকিলে, পাশ্চাত্য গ্রন্থ সমূহ অনায়াসেই সেই ভাষায় অনুবাদ করা যাইতে পারে এবং সেই গ্রন্থের সমস্ত কথা প্রাচ্য-দেশ-বাসীগণের নিকটে সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে। সেইরূপে প্রাচ্য গ্রন্থগুলিও পাশ্চাত্য জগতের নিকটে পরিচিত হইতে পারিবে। প্রাচ্য-প্রতীচ্য সম্মেলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ভাষা-বৈষম্য বিদূরিত করা। ভাষাবৈষম্য বিদূরিত হইলে, সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া একটি মহান্ মানবাবাস নির্ম্মিত হইবে, মানবজাতির উন্নতি, অগ্রগতির পক্ষে তাহাই হইবে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সহায়ক। একটি আন্তর্জাতিক, সার্ব্বজনীন ভাষার সাহায্যে মানবকুলের ঐক্য-মূলক সাধারণ পতাকা জগতে উত্তোলিত হইবে, পৃথিবীর সমস্ত জাতি সেই পতাকা-তলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সমবেত হইবে। পৃথিবী জুড়িয়া একটি মহান্ শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। আন্তর্জাতিক ভাষার সাহায্যে জাতিসমাজে ও মানবসমাজে মিত্রতা, প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইবে।

"ঈশ্বরের পুণ্য-নাম জয়যুক্ত হউক, এক্ষণে আচার্য্য জ্যামেন্হফ্ এস্পেরাণ্টো ভাষা প্রণয়ন করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক ভাব-বিনিময়ের পক্ষে ইহার উপযোগিতা অনন্য-সাধারণ; সার্ব্বজনীন ভাষা হইতে

হইলে একটি ভাষার যে যে বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, তাহা সমস্তই এস্‌পেরাণ্টো ভাষার আছে। তাঁহার মহৎ প্রয়াসের জন্য, তাঁহার এই বিপুল সৃষ্টির জন্য তাঁহার নিকটে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য; কারণ, এই ভাষা আবিষ্কার করিয়া তিনি মানবের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এই ভাষার সমর্থকগণ ও প্রচারকগণ উপযুক্ত পরিমাণ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিলেই এই ভাষা সত্যই সার্ব্বজনীন হইবে, সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে, সে বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের প্রত্যেকেরই এই ভাষা শিক্ষা করা উচিত ও যথাসাধ্য প্রচারিত করা উচিত; তাহা হইলে ক্রমে ইহা সমস্ত জাতি কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইবে, জগতের সমস্ত গভর্ণমেণ্ট ইহা অঙ্গীকার করিয়া লইবেন, পৃথিবীর সমস্ত বিদ্যালয়ে ইহা শিক্ষিতব্য বিষয়ের তালিকাভুক্ত হইবে। আমি আশা করি, এস্‌পেরাণ্টো ভাবীকালে আন্তর্জাতিক সভা-সমিতির ভাষারূপে গ্রাহ্য হইবে, সর্ব্বপ্রকার মহাসভার ভাষারূপে ইহা গৃহীত হইবে। ভাবীকালে, তাহা হইলে জনসাধারণ দুইটি করিয়া ভাষা শিখিবে, একটি প্রত্যেক দেশের জাতীয় ভাষা, অপরটি আন্তর্জাতিক ভাষা। তখন সমস্ত পৃথিবীতে সম্পূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় আসিবে, নানা বিবিধ জাতির মধ্যে প্রকৃত একতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভাবিয়া দেখ, বর্ত্তমান সময়ে, নানা জাতির সঙ্গে ভাব-বিনিময় করা কত কঠিন। যদি কোনো ব্যক্তি পঞ্চাশটি ভাষাতেও দক্ষতা লাভ করে, তাহা হইলেও এমন দেশ বাকী থাকে, যাহার ভাষা সে জানে না, এবং যে দেশে ভ্রমণ করিতে তাহার ভাষা বৈষম্যজনিত কষ্ট, অসুবিধা হয়।

"এই সমস্ত কারণে, আমি আশা করি, তোমরা যাহাতে এই এস্‌পেরাণ্টো ভাষা বহুল প্রচারিত হয়, সে জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিবে।"

আব্‌দুল্‌বাহা এস্‌পেরাণ্টো ভাষার প্রচার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সার্ব্বজনীন ভাষা হইবার সর্ব্বাংশে উপযুক্ততা অর্জ্জন করিতে হইলে এস্‌পেরাণ্টো ভাষাটিকে পরিবর্দ্ধিত, মার্জ্জিত ও উন্নততর হইতে হইবে। তিনি লণ্ডনে কথাবার্ত্তা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন :—

"এস্‌পেরাণ্টো ভাষার সৃষ্টিকার্য্যে যে প্রেম ও পরিশ্রম নিহিত আছে, তাহার বিনাশ নাই, সত্য; কিন্তু সার্ব্বজনীন ভাষা সৃষ্টি করা কোনো একটি ব্যক্তির পক্ষে সাধ্যাতীত। সর্ব্বদেশের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া একটি সমিতি-গঠন করিয়া সর্ব্বদেশের ভাষা হইতে শব্দ আহরণ করিয়া একটি সার্ব্বজনীন ভাষা সৃষ্টি করিবেন; ইহাই প্রকৃষ্টতম পন্থা।"—(লণ্ডনে আব্‌দুল্‌বাহা, পৃঃ ৯৫)

বর্ত্তমান সময়ে "লিংভা কমিটাটো" নামক একটি আন্তর্জাতিক সমিতির তত্ত্বাবধানে এস্‌পেরাণ্টো ভাষা প্রসারলাভ করিতেছে; প্রতি বৎসর, নানা, বিভিন্ন ভাষা হইতে শব্দ ও ধাতুমূল সংগ্রহ করিয়া এস্‌পেরাণ্টো ভাষার কলেবর বর্দ্ধিত ও সমৃদ্ধ করা হইতেছে।

আন্তর্জাতিক মহাসভা

বাহাউল্লা'র আর একটি আদেশ এই যে, আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, একটি আন্তর্জাতিক মহাসভা সৃষ্টি করিতে হইবে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকটে প্রেরিত পত্রে বাহাউল্লা' বলিয়াছেন :—

"হে রাজন্য-কুল, তোমরা তোমাদিগের কলহ মিটাইয়া ফেল; তাহা হইলেই তোমাদিগের আর সশস্ত্র সৈন্য-বাহিনী নিযুক্ত করিয়া

রাখিতে হইবে না, যুদ্ধের সাজ, সরঞ্জাম, সৈন্যগণের ব্যবহারোপযোগী অস্ত্র, শস্ত্র, পরিচ্ছদ, কিছুই রাখিতে হইবে না; কেবলমাত্র তোমাদের প্রজাকুলকে রক্ষা করিবার জন্য অল্পসংখ্যক প্রহরী এবং দেশ রক্ষা করিবার জন্য মুষ্টিমেয় সৈন্য রাখিলেই চলিয়া যাইবে। * * * হে রাজন্য-কুল, তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও, তাহা হইলেই কলহের প্রভঞ্জন স্তব্ধ হইবে, তোমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জনসাধারণ শান্তিতে বাস করিতে পারিবে। * * * যদি তোমাদের মধ্যে কেহ অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করে, তাহা হইলে সকলে মিলিত হইয়া আক্রমণকারীকে আক্রমণ করিবে; ইহা ত অতি সাধারণ ন্যায়-নীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, আব্দুল্‌বাহা একটি "আন্তর্জাতিক মহাসভা" প্রতিষ্ঠিত হইবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—যাহা বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তিরই চিত্তাকর্ষক হইবে, কেননা, এখন ঐরূপ একটি মহাসভা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। তাঁহার বাণী এইরূপ:—

"পৃথিবীতে সত্য, প্রকৃত সভ্যতার পতাকা উত্তোলিত হইবে তখন, যখন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত কোনো উদার রাজা বা শাসকসম্প্রদায় মানবের কল্যাণসাধণের নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, তীক্ষ্ণ অনুধাবন-শক্তিসহকারে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপিত করিবার জন্য আন্তর্জাতিক মহাসভার অধিবেশন আহ্বান করিবেন; তাঁহারা মানব-জাতির প্রতি কল্যাণ-বুদ্ধি দ্বারা একান্ত অনুপ্রাণিত হইয়া সূর্য্যের মত ভাস্বর, জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে পৃথিবীর রাজন্য-সমাজে দেখা দিবেন। তাঁহাদের স্বকীয় মতের ও প্রস্তাবের প্রাধান্য বজায় রাখিবার শক্তি থাকিবে; তাঁহারা এই শক্তির ভিত্তির উপর শান্তিসৌধ গড়িয়া তুলিবেন; তাঁহারা পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রশক্তির সমবায় রচনা করিবেন, একটি অলঙ্ঘনীয় সন্ধি স্থাপন করিবেন; তাঁহারা এমন কতকগুলি

সর্ত্তের ভিত্তির উপর এই সন্ধি-নীতি স্থাপিত করিবেন যে কোনো রাষ্ট্র কদাচ তাহার কোনো একটি সর্ত্ত অমান্য করিতে পারিবে না। সন্ধির সর্ত্তগুলি পৃথিবীর সমস্ত জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইবে, সমস্ত জনসাধারণ সেই সমস্ত সর্ত্ত সমর্থন করিবে; সমগ্র জনসাধারণকে ব্যক্তিগত ভাবে জিজ্ঞাসা করা অসম্ভব বলিয়া তাহাদের প্রতিনিধিগণের সমর্থন গ্রহণ করিতে হইবে। এই সন্ধির বলে আন্তর্জাতিক শান্তি সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সমস্ত জনসাধারণ এই সন্ধি-পত্রটিকে অতীব পবিত্র মনে করিতে শিখিবে; সমস্ত মহাশক্তিগুলি খরদৃষ্টি রাখিবে, যাহাতে এই মহান্ সন্ধির কোনো সর্ত্ত লঙ্ঘন করিতে কেহ না পারে, সন্ধি যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, সন্ধির ভিত্তি যাহাতে দৃঢ়ীভূত হইতে পারে।

"এই সার্ব্বজনীন সন্ধি অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবে, প্রত্যেক শাসন-তন্ত্রের প্রথাগুলি নিয়মবদ্ধ করা হইবে, সমস্ত বিধিনিষেধবাক্য-অনুশাসনগুলি যুক্তি সহকারে লিপিবদ্ধ হইবে; রাষ্ট্র সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপার ও দেশে দেশে, শাসনতন্ত্রে শাসনতন্ত্রে যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইয়াছে, তাহার বিবৃতি ও ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ থাকিবে। একটি সুনির্দ্দিষ্ট আকারে সমস্ত প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিশদ ও প্রাঞ্জলভাবে লিপিবদ্ধ থাকিবে। প্রত্যেক দেশের যুদ্ধোদ্যমের সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হইবে, অর্থাৎ, যে কোনো দেশ নিজের ইচ্ছামত যুদ্ধোদ্যমের শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে না; এ সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ কোনো নিয়ম সুস্পষ্ট করিয়া লিপিবদ্ধ না করিলে, কোনো দেশ তাহার সামরিক শক্তি ইচ্ছামত বৃদ্ধি করিতে পারে, এবং সেইরূপ করিলে, অন্য প্রতিবেশী দেশসমূহে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। এই সর্ব্বশক্তিমান্ সন্ধি-পত্রের ভিত্তি এমন সুদৃঢ় করিতে হইবে যে যদি কোনো দেশ বা

রাষ্ট্র ইহার একটি বাক্যও লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্র মিলিত হইয়া তাহার শাস্তি বিধান করিবে। শুধু রাষ্ট্র-শক্তির সাহায্যেই সেই অপরাধী রাষ্ট্রের শাস্তিবিধান হইলে, তাহা যথেষ্ট হইবে না; পৃথিবীর মানবকুল সেই আইন-ভঙ্গ-কারী অপরাধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উদ্যত হইবে।

"জগতের অসুস্থ দেহে, রোগমুক্তির জন্য যদি এইরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রতীকার হইবে—ব্যাধির উপশম, রোগমুক্তি চিরস্থায়ী হইবে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-দুর্দ্দশার অবসান হইবে, বিশ্ব-বিধানে সাম্য ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, সর্ব্বব্যাপী মহান্ শান্তি বাস্তবে পরিণত হইবে।"—(সভ্যতার রহস্যময় শক্তিনিচয়, পৃঃ ১৩৪-১৪০)

আন্তর্জাতিক বিচারালয়

আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিনা যুদ্ধবিগ্রহে সমস্ত আন্তর্জাতিক কলহের নিষ্পত্তি করিতে হইবে, ইহাও বাহাউল্লা' বলিয়াছেন।

আবদুল্‌বাহা 'আন্তর্জাতিক কলহ-নিষ্পত্তি-সভা'র মোহাঙ্ক্ অধিবেশনের সম্পাদকের নিকটে, আগষ্ট, ১৯১১তে, লিখিত পত্রে বলিয়াছিলেন ঃ—

"প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে 'আক্‌দাস্ গ্রন্থে' বাহাউল্লা' পৃথিবীর সমস্ত জাতিদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, তোমরা তোমাদের যাবতীয় প্রশ্ন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ক'র; রাষ্ট্রের সীমা নির্দ্দেশ, জাতীয় সম্পত্তি

বিষয়ক ও জাতীয় গৌরবমূলক সমস্ত ব্যাপার এবং আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ-সংক্রান্ত যাবতীয় সূক্ষ্ম এবং অতিপ্রয়োজনীয় বিষয় সেই বিচারালয়ের সমক্ষে উপস্থিত ক'র। এমন ব্যবস্থা ক'র যাহাতে কোনো দেশ বা রাষ্ট্র এই বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত অমান্য করিতে না পারে। দুইটি জাতির মধ্যে কোনো বিষয় লইয়া কলহ উপস্থিত হইলে এই বিচারালয়ের সমক্ষে সে বিষয়টি লইয়া বিচার হইবে; ব্যক্তিগত কলহ যেমন রাজকীয় বিচারালয়ে বিচারিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই আন্তর্জাতিক বিচারালয় হইতে যে রায় প্রদত্ত হইবে, তাহা সাধারণ বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের মতই বাধ্যতামূলক হইবে, উভয় পক্ষই তাহা মান্য করিতে বাধ্য থাকিবে। যদি কোনো জাতি কোনো উপলক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয়, তাহা হইলে অন্য সমস্ত জাতি মিলিয়া তাহার এই বিদ্রোহ প্রশমিত করিবে।"

১৯১১ খৃষ্টাব্দে, তিনি প্যারিসে আলাপ-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন:—

"প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক রাষ্ট্র হইতে প্রতিনিধি সংগ্রহ করিয়া একটি সর্ব্বোচ্চ আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই বিচারালয়ের বিচারপতিগণ মিলিত হইয়া বিচার কার্য্য করিবেন। যে সমস্ত কলহ, বিবাদ আন্তর্জাতিক শ্রেণীভুক্ত সে সমস্তই এই বিচারালয়ের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইবে, এই বিচারালয় সেই সমস্ত সমস্যার নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। যে সমস্ত ব্যাপার লইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে পারিত, তাহা এইরূপে মীমাংসিত হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইবে, যুদ্ধ নিবারণ করা।"—(প্যারিসে কথাবার্ত্তা, পৃঃ ১৪৫)

আন্তর্জাতিক মহাসভার প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে একটি "চিরস্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়" "হেগ"এ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ইহার পোষকতায় বহু বিবাদ-মীমাংসামূলক সন্ধি স্বাক্ষরিত

হইয়াছিল, সত্য; কিন্তু এই সকল সন্ধির কোনোটিই বাহাউল্লা'র আদর্শ সন্ধির মত ব্যাপক বা সম্পূর্ণ নহে, তাঁহার আদর্শ হইতে ঐগুলি অনেক নিম্নে। দুইটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে এমন কোনো সন্ধি হয় নাই, যাহাতে উভয় রাষ্ট্রের বিরোধের সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। স্বাধীনতা, সম্মান ও অত্যাবশ্যকীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত মতানৈক্যের বিষয়গুলি বিশেষরূপে বাদ দেওয়া হইয়াছিল; শুধু তাহা নহে, ঐ সমস্ত সন্ধি-স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র সন্ধি-সর্ত্ত অমান্য করিলে তাহার প্রতি-বিধানের কোনো ব্যবস্থা করা হইয়াছিল না। অপর পক্ষে, বাহাই প্রস্তাবাবলীতে রাষ্ট্রের সীমা-নির্দ্দেশ, জাতীয় সম্মান এবং অত্যাবশ্যক স্বার্থ-সংক্রান্ত সকল বিষয়কে সুস্পষ্টরূপে সন্ধি-সর্ত্তের অন্তর্গত করা হইয়াছে, এবং সন্ধির সর্ত্তসমূহ যাহাতে কোনো পক্ষ অমান্য করিতে না পারে, তাহার দায়িত্বভার আন্তর্জাতিক বিশ্ব-মহাসভার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। যতদিন এই সমুদয় নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য করা না হইবে, ততদিন আন্তর্জাতিক বিচারালয় তাহার হিতকর সম্ভাবনার পরিপূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারিবে না, যুদ্ধের অভিশাপও সম্পূর্ণরূপে পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হইবে না।

অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণের হ্রাস-সাধন

আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন:—

"সর্ব্বসম্মতিক্রমে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রশক্তিগুলি এক সঙ্গে নিরস্ত্রীকৃত হইবে। একটি রাষ্ট্র যদি নিরস্ত্রীকৃত হইতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে অপর সমস্ত রাষ্ট্রও নিরস্ত্রীকৃত হইবে না। এ বিষয়টি

সর্ব্বপ্রধান এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তির এক মত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন;—সকলে একমত হইয়া এক সঙ্গে ভীষণ মারণাস্ত্রগুলি পরিহার করিবে। যতদিন একটি জাতি বা রাষ্ট্র তাহার সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করিবে, যতদিন একটি রাষ্ট্র তাহার সামরিক শক্তি ও নৌশক্তি বৃদ্ধি করিবে, ততদিন অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রগুলিও বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার জন্য সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া স্থলশক্তি ও নৌশক্তি বৃদ্ধি করিবে; সর্ব্বদাই তাহারা যে আত্মরক্ষার জন্য প্রতিযোগিতা করিবে, তাহা নহে, অনেক সময় কল্পিত স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য তাহারা ঐরূপ করিবে।"—(মীর্জ্জা আহমদ্ সোহরাবের রোজনাম্চা, ১১ই মে হইতে ১৪ই মে, ১৯১৪)

অপ্রতিরোধ-নীতি

ধর্ম্মসম্প্রদায় হিসাবে বাহাইগণ বাহাউল্লা'র আদেশক্রমে সশস্ত্র প্রতিরোধ কদাচ করে না, এমন কি নিতান্ত দায়ে পড়িয়া আত্মরক্ষার জন্যও তাহারা কদাচ ঐ পন্থা অবলম্বন করে না। পারস্যদেশে বহু সহস্র বাবী ও বাহাই, ধর্ম্মের জন্য অকাতরে নিষ্ঠুর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, প্রতিবাদও করে নাই। এই ধর্ম্মান্দোলনের প্রারম্ভে বা'বীগণ অনেক উপলক্ষ্যে নিজদিগকে এবং নিজেদের পরিবার, সশস্ত্র প্রতিরোধ দ্বারা, সাহসী বীরের মত যুদ্ধ করিয়া রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু বাহাউল্লা' বাহাইদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আব্‌দুল্‌বাহা বলিতেছেন:—

"বাহাউল্লা' আবির্ভূত হইয়া আদেশ-বাণী প্রচারিত করিলেন যে কোনোক্রমেই, এমন কি, আত্মরক্ষার জন্যও, বাহাইগণ কদাচ সত্য-

বাণীর প্রচার তরবারি বা অন্য অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে করিবে না। তিনি তরবারিমূলক নীতির উচ্ছেদ সাধন করিলেন ও তথাকথিত 'পবিত্র-যুদ্ধ-নীতি' রহিত করিলেন। তিনি বলিয়াছেন:— 'যদি তোমাদিগকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে, তোমরা স্বচ্ছন্দ চিত্তে আহত হইও, আঘাত করা অপেক্ষা আহত হওয়া শ্রেয়ঃ। ঈশ্বর-বিশ্বাসীগণের বিশ্বাসে দৃঢ়তা এবং ভক্তির মধ্য দিয়াই ঈশ্বরের ধর্ম্ম পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। বিশ্বাসীগণ নির্ভীকচিত্তে, অপ্রতিহত প্রভাবে, মুক্ত-পুরুষের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার আসঙ্গ-বিচ্যুত হইয়া ঈশ্বরের পুণ্য-বাণীর মহিমা ঘোষিত করিবে; তাহারা পার্থিব প্রলোভন, পার্থিব আসক্তি হইতে বিরত থাকিয়া ঈশ্বরের পুণ্য-নাম কীর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যেই, তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্যসমূহের অনুষ্ঠান করিবে, তাঁহারই সেবায় মন, বুদ্ধি, দেহ নিয়োজিত করিবে; এই উপায়েই ঈশ্বরের বাণী জয়যুক্ত হইবে। এই সমস্ত ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তিগণ তাহাদের দেহের প্রতিরক্তবিন্দুর সাহায্যে, প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ঈশ্বরের ধর্ম্মের সত্যতার সাক্ষী দিবে, তাহাদের ভক্তিই হইবে ধর্ম্মের সত্যতার অভিজ্ঞান, তাহাদের একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়চিত্ততা দ্বারাই ধর্ম্মের বাণী পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। সত্য-বাণী প্রচারিত করিবার শক্তি ঈশ্বরের আছে, উদ্ধত ব্যক্তিদিগকে পরাস্ত করিবার শক্তিও তাঁহার আছে। আমরা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনো সহায়ক চাই না; আমরা আমাদের জীবন হস্তে করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হই, এবং আত্মোৎসর্গী হইতে প্রস্তুত থাকি।"—(এই পুস্তকের জন্য আব্‌দুল্‌বাহা কর্ত্তৃক লিখিত)

বাহাউল্লা' বাহাই ধর্ম্মের জনৈক অত্যাচারীর নিকটে লিখিতেছেন:—

"হে পরমেশ্বর! এই সম্প্রদায়ের অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

নাই। পৃথিবীতে সর্ব্বব্যাপী মহান্‌শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ইহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইতেছে। সদানুষ্ঠানাবলীই ইহার সৈন্য-বাহিনী; সৎকার্য্যই ইহার অস্ত্র-শস্ত্র; ধর্ম্মভীরুতা ও ঈশ্বর বিশ্বাসই ইহার সেনাপতি। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে সুখী।

"ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি,—এই সমস্ত ব্যক্তি তাহাদের সহিষ্ণুতা, তাহাদের সহনশীলতা, তাহাদের সৌম্যপ্রশান্তি, তাহাদের পরিতৃপ্ত মনোভাব ইত্যাদি সদবৃত্তি দ্বারা সত্যসত্যই ন্যায়পরতার অবতাররূপে গণ্য হইয়াছে। তাহাদের জীবন সত্যে নিবেদিত, সত্যের জন্য তাহারা এমন অবস্থায় পৌছিয়াছে যে তাহারা এক্ষণে নিহত হইতেও স্বীকার করিবে, কিন্তু কাহাকেও আঘাত করিবে না। এই সমস্ত অত্যাচারিত, নির্য্যাতিত ব্যক্তিগণ এমন একটি মহাসত্যের নিকটে আপনাদের জীবন ও আত্মা নিবেদন করিয়াছে, যে মহাসত্যের স্বরূপ জগতের ইতিহাসে অদ্যাপি উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, যাহার স্বরূপ জগতের জাতিসমাজে অদ্যাপি উপলব্ধ হয় নাই।

"এমন নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও তাহারা আত্মরক্ষার জন্য লেশমাত্র চেষ্টা করে নাই, ইহার তাৎপর্য্য কি? তাহাদের এই অদ্ভুত আত্মনিবেদন ও দুঃসহ যাতনা সহ্য করিবার শক্তি কোথা হইতে আসিল? ইহার কারণই বা কি? 'বাহা'র লেখনী হইতে অবিরাম নিঃসৃত নিষেধ-বাণীই তাহার কারণ, কেননা তাহারা জগতের প্রভুর শক্তি ও ক্ষমতা সহকারে 'আদেশের' রশ্মি ধারণ করিয়া রহিয়াছিল।" —(বৃক পুত্রের ফলকলিপি)

বাহাউল্লা'র অপ্রতিরোধ-নীতির সার্থকতা ফলের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। পারস্যদেশে একজন বাহাইএর আত্মোৎসর্গের ফলে শত-ব্যক্তি বাহাই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে; এবং এই সমস্ত আত্মোৎসর্গী ব্যক্তিগণ

যেরূপ প্রফুল্ল চিত্তে ও নির্ভীকভাবে তাহাদের প্রিয়-প্রভুর শ্রীচরণে নিজেদের বহুমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল, তাহার দ্বারা পৃথিবীতে সপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা এমন এক অভিনব জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল, মৃত্যু যাহাকে শঙ্কিত করিতে পারে নাই,—যাহা এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-শান্তিতে পরিপূর্ণ, যাহার তুলনায় পার্থিব আমোদ-প্রমোদ ধূলী কণার ন্যায় তুচ্ছ — প্রচণ্ড, পৈশাচিক উৎপীড়নও বায়ু হইতে লঘু—তাহা যেন কিছুই নয়।

মানবের মঙ্গলার্থে সংগ্রাম

বাহাউল্লা' যীশুখৃষ্টের ন্যায় তাঁহার অনুগামীদিগকে আদেশ করিতেছেন যে তাহারা সম্প্রদায় হিসাবে অপ্রতিরোধ নীতি অবলম্বন করিবে ও ব্যক্তিগত জীবনে অহিংসা নীতিই জীবনের মূলমন্ত্র করিবে, শত্রুকেও মার্জ্জনা করিবে। কিন্তু অপর পক্ষে তিনি বলিতেছেন যে অন্যায়, অত্যাচার নিবারণ করা সমাজের কর্ত্তব্য। যদি কোনো ব্যক্তি অত্যাচারিত হয়, তাহার পক্ষে মার্জ্জনা করা এবং প্রতিশোধ না লওয়াই উচিত কার্য্য; কিন্তু দেশের মধ্যে হত্যাকাণ্ড বা লুণ্ঠন অনুষ্ঠিত হইতে দেওয়া সমাজের পক্ষে গুরুতর অন্যায়। রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য, অন্যায়, অত্যাচার নিবারণ করা ও অপরাধীর (১) শাস্তি বিধান করা। যদি একটি রাষ্ট্র অপর একটি রাষ্ট্রের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার করে, তাহা হইলে সকল রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য, মিলিত হইয়া তাহার প্রতিবিধান করা। আব্‌দুল্‌বাহা বলিতেছেন :—

---

(১) অপরাধীর প্রতি উচিত আচরণ সম্বন্ধে এই পুস্তকের ২৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"এমন সময় আসিতে পারে, যখন রণদুর্ম্মদ বর্ব্বর উপজাতি রাষ্ট্রের প্রতি ভীষণ আক্রমণ করিল এবং আক্রান্ত রাষ্ট্রের সমস্ত অধিবাসীদিগকে নির্ম্মূল করিবার মানসে যুদ্ধযাত্রা করিল। সেই সময়ে আত্মরক্ষা অতীব কর্ত্তব্য।"—(প্যারিসে কথাবার্ত্তা, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৭০)

অদ্যাবধি মানবজাতির সাধারণ নীতি এই যে, যদি একটি রাষ্ট্র বা জাতি অপর কোনো রাষ্ট্র বা জাতিকে আক্রমণ করে, পৃথিবীর অপর সকল জাতি নিরপেক্ষ হইয়া অবস্থান করে, এবং তাহাদের আপন স্বার্থে আঘাত না লাগিলে বা তাহাদের প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি না হইলে তাহারা এই সম্পর্কে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করে না। আক্রান্ত জাতি যতই দুর্ব্বল বা নিরাশ্রয় হউক না কেন, আত্মরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাহার নিজের উপরেই থাকে। বাহাউল্লা'র আদেশ, এই নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত; আত্মরক্ষার দায়িত্বভার কেবলমাত্র আক্রান্ত জাতির উপর ন্যস্ত করা হয় নাই, বরং ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে অপর সকল জাতির উপরেও ন্যস্ত করা হইয়াছে। যেহেতু সমগ্র মানবজাতি একই মানব সমাজের অন্তর্গত, কোনো এক সম্প্রদায়, জাতি বা রাষ্ট্রের প্রতি আক্রমণ, সমগ্র মানব সমাজের উপর আক্রমণ বিশেষ; সমগ্র মানবসমাজেরই তাহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। যদি এই নীতি-উপদেশ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাধারণভাবে অনুসৃত হয়, তাহা হইলে আক্রমণ-ইচ্ছুক জাতি পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিবে, যে কোনো এক জাতিকে আক্রমণ করিলে কেবলমাত্র সেই জাতির সঙ্গে তাহার বিরোধ হইবে না, বরং পৃথিবীর অপর সমস্ত জাতির সঙ্গেও তাহার বিরোধ ঘটিবে। জাতিসমূহের মধ্যে অতি সাহসী, বিবাদ-বিসম্বাদ-প্রিয় জাতিকেও এই জ্ঞান একাই নিরস্ত করিতে যথেষ্ট। যখন শান্তি প্রয়াসী জাতিসমূহের একটি শক্তিমান্ রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হইবে, তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ

অতীতের ব্যাপার হইয়া যাইবে, ভবিষ্যতে আর হইবে না। পুরাতন যুগের অশান্তিময় অবস্থা নবযুগের শান্তিতে পরিবর্ত্তিত হইবার কালে মাঝে মাঝে হয়ত যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে পারে;—এইরূপ অবস্থায় আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার, একতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত সামরিক ও অন্যপ্রকার দমননীতিমূলক ব্যবস্থা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। আব্‌দুল্‌বাহা বলিয়াছেন ঃ—

"কোনো কোনো সময়ে সংগ্রাম হইতেই শান্তির ভিত্তি স্থাপিত হয়। পুনর্গঠন করিতে হইলে যেমন প্রথমে সমস্ত বিচূর্ণিত করা প্রয়োজন, সেইরূপ শান্তিস্থাপনের জন্যও কোনো কোনো সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এইরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ শান্তির সঙ্গে এক তন্ত্রীতে বাঁধা, শান্তিরই রূপান্তর মাত্র। সংগ্রামে যে ভীষণ নিষ্ঠুর আচরণ অনিবার্য্য, তাহা করুণারই অগ্রদূত, সংগ্রামের অত্যাচার ন্যায়-পরতার মর্ম্মবাণী এবং সার সত্য; যুদ্ধ হইতেই মৈত্রী এবং সাম্য, সমন্বয় প্রভৃতি উদ্ভূত হইয়া থাকে। সার্ব্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক শক্তিমান্ রাজার কর্ত্তব্য; কারণ সার্ব্বজনীন শান্তি জগতের সমস্ত জনসাধারণের স্বাধীনতা সূচিত করে।"—(সভ্যতার রহস্যময় শক্তিনিচয়)

প্রাচী-প্রতীচী-সম্মেলন

মাত্র যুদ্ধের বিরতি হইলেই সর্ব্বব্যাপী মহান্‌শান্তি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে না; প্রাচী-প্রতীচী, তথা জগতের সমস্ত মানবকুল পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মহামিলন মন্ত্রে মিলিত হইয়া সহযোগিতা

করিবে; সর্ব্বব্যাপী মহান্‌শান্তি এইরূপেই ফলপ্রসূ হইবে। প্যারিসে এক আলাপ-প্রসঙ্গে আব্‌দুল্‌বাহা বলিয়াছিলেন:—

"বর্ত্তমান যুগে যেমন সত্য-সূর্য্য প্রাচী-গগনে সমুদিত হইয়াছেন, তেমনই অতীত যুগেও অবতার-রবিগণ প্রাচ্য-দিগ্বলয় অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর নভোমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রাচ্য-জগতে মুসা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি জনসাধারণকে পরিচালিত, শিক্ষিত করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রভু যীশু পূর্ব্বগগনেই প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেন। ঈশ্বর মোহাম্মদকেও একটি প্রাচ্য জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। বা'ব প্রাচ্যদেশ পারস্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাহাউল্লা' প্রাচ্য জগতেই ধর্ম্মের বাণী প্রথমে প্রচার করিয়াছিলেন।

"কিন্তু, যদিও মসীহ্‌-সূর্য্যের উদয়াচল প্রাচ্যজগতে, তথাপি ইহার ঔজ্জ্বল্য পাশ্চাত্যজগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, প্রাচ্যজগৎ অপেক্ষা পাশ্চাত্য জগতেই ইহার মহিমা অধিকতর প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জগতেই মসীহের উদার বাণীর তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট অর্থে উপলব্ধ হইয়াছিল: প্রাচ্যজগৎ ধর্ম্মের জন্মভূমি হইলেও, পাশ্চাত্য জগতেই তাহা দ্রুত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

"বর্ত্তমান সময়ে প্রাচ্যজগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন পার্থিব উন্নতি, প্রতীচীর প্রয়োজন আধ্যাত্মিক আদর্শ। প্রাচী প্রতীচী হইতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান গ্রহণ করিবে, তৎপরিবর্ত্তে প্রাচী প্রতীচীকে পারত্রিক জ্ঞান দান করিবে। উভয়ের মধ্যে যাহার যাহা নাই, অপরে তাহা তাহাকে দিবে। এই মহামিলনের ফলে প্রকৃত সভ্যতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, পার্থিবতায় আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ হইবে। পরিপূর্ণতম এক-প্রাণতাবোধে সমগ্র মানবকুল উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে, সমগ্র পৃথিবীর

মানবাত্মার ঐক্য সাধিত হইবে, পৃথিবীরূপ মুকুরে ঐশিক গুণাবলী প্রতিবিম্বিত হইবে, জাতিসমূহ দৃঢ়তা-সূত্রে আবদ্ধ হইবে।

"পৃথিবীর সমস্ত জাতির ঐক্য সাধিত করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে একান্ত একাগ্রতা ও পরম আগ্রহসহকারে দিবারাত্রি যত্নবান হইতে হইবে। প্রাচ্য-প্রতীচ্য জাতিগণের মহামিলনই আমাদের আদর্শ, সেই আদর্শ আমাদিগকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে। প্রত্যেক মানব-হৃদয় সঞ্জীবিত হইবে, সমস্ত মানবকুলের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে, এক অভাবনীয় অলৌকিকশক্তি প্রদত্ত হইবে, মানবজাতির সুখ-শান্তির নিশ্চিত-ব্যবস্থা হইবে। * * * ইহাই সেই স্বর্গরাজ্য, বিগত যুগে যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, এবং ইহা ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন মানবজাতি "আব্‌হা" রাজ্যে একতার পুণ্য ছায়াতলে সম্মিলিত হইবে।"—(প্যারিসে কথাবার্ত্তা, পৃঃ ১৭)

একাদশ অধ্যায়

—·:❋:·—

নানাবিধ বিধি-নিষেধ ও উপদেশ

জানিয়া রাখ,—প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক কালচক্রে, সময়ের আবশ্যকতা অনুসারে সমুদয় স্বর্গীয় বিধি-নিষেধ রূপান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রেমের প্রস্রবণ চিরন্তন কাল ধরিয়া একইভাবে প্রবহমান, প্রেমের আইনের কোনো পরিবর্ত্তন হয় না।—(বাহাউল্লা')

মঠ-মন্দিরে সন্ন্যাস-বৃত্তি

প্রভু বাহাউল্লা' হজরত মোহাম্মদের মত তাঁহার অনুগামীদিগকে মঠ-মন্দিরে নির্ব্বাসিত জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

তৃতীয় নেপোলিয়নের ফলকলিপিতে আমরা নিম্নলিখিত বাণী পাঠ করি:—

"হে সমবেত ভিক্ষুগণ! তোমরা নির্জ্জন গুহাভ্যন্তরে বা মঠ-মন্দিরের মুণিকুট্টিমে আবদ্ধ হইয়া বাস করিও না। আমার আদেশ-বাণীর নির্দ্দেশ অনুসারে সেই সঙ্কীর্ণতম জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহাতে তোমাদের আত্মার উন্নতি ও সমগ্র মানবজাতির চিত্তের উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেইরূপে পৃথিবীতে বিচরণ ক'র। * * * তোমরা পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হও, পৃথিবীতে তোমাদের স্থলাধিকারী রাখিয়া যাও। আমরা তোমাদিগকে যথেচ্ছাচরণ নিষেধ করিয়াছি,

তোমাদের উপরে বিশ্বস্ততা অবধারিত করিয়াছি। তোমরা নিজেদের অভিরুচি মত যথেচ্ছাচরণ করিয়াছ, তোমরা ঈশ্বরের নির্দ্দেশ প্রত্যাখ্যাত করিয়াছ। ঈশ্বরকে ভয় ক'র, মূর্খের মত অবাধ্য হইও না। যদি মানুষ না হইত, কে আমার মর্ত্ত্যলোকে আমার নাম উচ্চারণ করিত এবং কি করিয়াই বা আমার নাম, বিশেষণের প্রকাশ হইত? চিন্তা ক'র, যাহারা মোহ-নিদ্রায় অভিভূত, মায়াজালে আচ্ছন্ন তাহাদের মত হইও না। যে মহা-মানব বিবাহ করেন নাই, অর্থাৎ যীশুখৃষ্ট বাস করিবার স্থান অন্বেষণ করিয়া পান নাই, মাথা রাখিবার একটু জায়গা হইতেও তিনি বঞ্চিত হইয়াছিলেন; বিশ্বাসঘাতকগণ তাঁহার এমনই দশা করিয়াছিল। তাঁহার আত্মার পবিত্রতা ঐ সকল কথার উপর নির্ভর করিত না, যাহা তোমাদের অলস কল্পনাবশে তোমরা আপন হৃদয়ে পোষণ করিতেছ, বরং যাহা আমরা জানি তাহার উপরই তাহা নির্ভর করিত। প্রার্থনা ক'র, তোমরা যেন তাঁহার ঐ পদমর্য্যাদা বুঝিতে পার, যাহা পৃথিবীবাসিগণের কল্পনার অতীত; যাহারা জানে, তাহারা কতই ভাগ্যবান্!"

যীশুখৃষ্ট বিবাহিত ব্যক্তিদিগকে তাঁহার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন, এবং তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ জনসাধারণের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া কার্য্যকরী জনহিতকর কর্ম্মে ব্রতী থাকিয়াই জীবন-যাপন করিয়াছেন। অথচ, খৃষ্টান সম্প্রদায় পুরোহিতদিগের জন্য অবিবাহিত জীবন ও মঠ-মন্দিরে সন্ন্যাস জীবনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে?

কোরাণে বলা হইয়াছে:—

"মেরীর পুত্র যীশুকে আমরা 'সুসমচার' গ্রন্থ দিয়াছিলাম; আমরা তাহার অনুগামীদিগের অন্তঃকরণে দয়া, মমতা প্রভৃতি

সদগুণ ও সুন্দর মানসিক বৃত্তি নিহিত করিয়া দিয়াছিলাম; কিন্তু সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ আমরা তাহাদিগকে দিই নাই, তাহারাই উহা উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে। আল্লা'কে সন্তুষ্ট করিবার প্রেরণা আমরা তাহাদিগকে দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যে উপায়ে ইহা করিতে হইবে, তাহারা সে উপায় অবলম্বন না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিল।"—(সু, ৪৭, ২৭)

প্রাচীনকালে, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সন্ন্যাসীর জীবনের আদর্শ যতই কাম্য ও সুসঙ্গত হউক না কেন, বাহাউল্লা' বলেন যে তাহার প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান জগতে লেশমাত্রও নাই। বরঞ্চ, সন্ন্যাস-গ্রহণ সমাজ-জীবনের পক্ষে অতিশয় হানিকর; কারণ, সেই আদর্শ অনুসারে বহুসংখ্যক ধর্ম্মভীরু, সাধুব্যক্তি সমাজ হইতে অপসারিত হইয়া যায়; পিতৃত্বের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব ইহারা পরিহার করে, সেই কারণে জাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবনতি ঘটে।

বি

বাহাই উপদেশানুসারে এক পত্নীত্বই প্রশস্ত ও বিধেয়; বাহাউল্লা' আরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে পাত্র-পাত্রীর সম্মতি ও তাহাদের পিতা-মাতাদিগের সম্মতির উপর বিবাহ হইবে কি না, তাহা নির্ভর করিবে। আক্‌দাস্ গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন:—

"'বয়াণ'এ অর্থাৎ বা'বের প্রকাশিত গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে পাত্র-পাত্রীর সম্মতি বিবাহের মুখ্য উপাদান, বিবাহ তাহার উপরই নির্ভর করিবে। কিন্তু আমরা ভৃত্যগণের মধ্যে প্রেম, মৈত্রী, একতা প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, এই কারণে নির্দ্দেশ করিতেছি যে পিতামাতা-দিগের সম্মতিও বিবাহের প্রধান ভিত্তি, সেই সম্মতি ব্যতিরেকেও

বিবাহ হইতে পারিবে না ; এতদ্ব্যতীত, শত্রুতাও পরস্পরীয় বিরোধ-ভাব অপরিহার্য্য।"

আব্দুল্‌বাহা এই বিষয়ে একজন প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে উত্তর দিয়াছিলেন :—

"ঈশ্বরের বিধান অনুসারে বিবাহ-বিধি এইরূপ :—তুমি তোমার জীবন-সঙ্গী বা সঙ্গীনী নির্ব্বাচন করিবে : নির্ব্বাচনের পর, বিবাহ হইবে কি না তাহা নির্ভর করে, উভয় পক্ষের পিতামাতার মতামতের উপর। তোমার নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার নাই।"—(আব্দুল্‌বাহার ফলক-লিপি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬৩)

আব্দুল্‌বাহা বলেন যে বাহাউল্লা'র এই আদেশ অনুসৃত হইয়া থাকে বলিয়াই বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীদের বিবাহ-চ্ছেদ অতীব অল্পই ঘটিয়া থাকে। তিনি আরও বলেন যে খৃষ্টান ও মুসলমান দেশে সাধারণতঃ বৈবাহিক কুটুম্ব, আত্মীয়গণের মধ্যে যে তীব্র বিদ্বেষ-ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে ইহা আদৌ নাই। তিনি বিবাহ-সংস্কার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"পাত্র-পাত্রী, উভয়ের সম্পূর্ণ ঐক্যমত ও পূর্ণ সম্মতির উপর বাহাই বিবাহ নির্ভর করে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একান্ত অনুরাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যাবশ্যক। তাহারা উভয়েই পরস্পরের চরিত্র সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য জানিয়া লইবে ; তাহাদের মধ্যে যে অঙ্গীকার হইবে, তাহা চিরন্তন, ইহা মনে রাখিতে হইবে ; তাহারা চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব, মৈত্রী ও নিবিড়তম একত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইতে মনস্থ করিয়া তাহার পরেই যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবে।

"বিবাহের পাত্র, পাত্রীর আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য ব্যক্তির সমক্ষে বলিবে: 'নিশ্চয়ই, আমরা ঈশ্বরের আদেশে সন্তুষ্ট'। পাত্রী প্রত্যুত্তরে বলিবে: 'সত্যই, আমরা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে পরিতৃপ্ত'।"

"বাহাই বিবাহের তাৎপর্য্য এই যে স্ত্রী এবং পুরুষ পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক মিলনে সম্মিলিত হইবে, সমুদয় স্বর্গীয় সংসারে অনন্তকাল ধরিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযোগযুক্ত হইয়া থাকিবে, পরস্পর পরস্পরের আধ্যাত্মিক জীবন সমৃদ্ধ করিবে; ইহাই বাহাই বিবাহ।"—(আবদুল্-বাহার ফলক-লিপি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৫)

বিবাহ-বিচ্ছেদ

বিবাহ সম্বন্ধে অবতারগণের উপদেশাবলী যেমন সময়ের আবশ্যকতা অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধেও তাঁহাদের উপদেশাবলী তদনুরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আবদুল্বাহা বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে বাহাই উপদেশাবলীর নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দিয়াছেন:—

"স্বামী-স্ত্রী, উভয়ে উভয়ের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ও পরস্পর, পরস্পরের বিরাগ-ভাজন হইবার মত কোনো কারণ না ঘটিলে, বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীগণ কদাচ বিবাহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টিত হইবেন না। যদি সেরূপই অবস্থা ঘটে, তাহা হইলে 'আধ্যাত্মিক সভা'র জ্ঞাতসারে তাহারা বিযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। এইরূপ বিযুক্ত হওয়ার পর তাহারা সহিষ্ণুতা সহকারে পূর্ণ এক বৎসর কাল অপেক্ষা করিবে।

যদি এই একবৎসর কালের মধ্যে তাহাদের একতা-সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পন্ন হইতে পারে। • • • ঈশ্বরের রাজ্যের ভিত্তি একতা, প্রেম, সাম্য, মৈত্রী ও মিলনের উপর স্থাপিত, অনৈক্যের উপর নহে; বিশেষতঃ, ঈশ্বরের রাজ্যে স্বামী-স্ত্রীর অনৈক্যের কোনো স্থান নাই। তাহাদের মধ্যে যে কেহ তাহাদের বিবাহ-চ্ছেদের কারণ হয়, সে নিশ্চয়ই বিষম বিপদে পতিত হইবে, অশেষ দুঃখ-কষ্টের ভাগী হইবে, গভীর সন্তাপ ভোগ করিবে।"
—(আমেরিকান বাহাইদিগের নিকটে লিখিত ফলকলিপি)

এতদ্ব্যতীত, যেমন অন্য সমস্ত ব্যাপারে, বাহাইদিগকে, যে দেশে তাহারা বাস করে, সে দেশের আইন-কানুনগুলি মানিয়া চলিতে হয়, সেইরূপ বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধেও দেশের রীতি-নীতি, আইন-কানুন তাহারা মানিয়া চলিবে।

বাহাই পঞ্জিকা

সময়ের পরিমাপ করিবার জন্য ও তারিখ নির্দ্ধারিত করিবার জন্য নানা বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন সময়ে, নানা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। প্রাত্যহিক প্রয়োজনে পৃথিবীর নানা অংশে নানাবিধ পঞ্জী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রচলিত পঞ্জিকার সংখ্যা সাত; উহাদের কয়েকটির নাম, গ্রেগোরিয়ান (ইহা পশ্চিম য়ুরোপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে), জুলিয়ান (ইহা পূর্ব্ব-য়ুরোপের অনেক দেশে অনুসৃত হয়), হিব্রু (য়িহুদীদের মধ্যে এই পঞ্জিকার প্রচলন), মোহাম্মদীয় (মুসলীম জগতে ইহা চলিয়া থাকে)।

বা'ব যে নবযুগ বিঘোষিত করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, একটি নূতন পঞ্জিকা প্রবর্ত্তন করিয়া ইহাকে তিনি প্রসিদ্ধি দিয়াছেন। এই পঞ্জিকা অনুসারে, গ্রেগোরিয়ান পঞ্জিকার মতই, চান্দ্রমাস পরিত্যক্ত ও সৌরবর্ষ গৃহীত হইয়াছে।

"বাহাই বর্ষ ১৯ মাসে বিভক্ত; প্রত্যেক মাসে দিবস সংখ্যা ১৯। (১৯×১৯=৩৬১ দিবস)। ইহার সঙ্গে সাধারণ বৎসরে চা'র-দিন ও প্রতি চতুর্থ বৎসরে পাঁচদিন করিয়া যোগ দিতে হইবে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ মাসের মধ্যে এই চা'র বা পাঁচদিন যোগ দিয়া সৌরবর্ষের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে হয়। বা'ব ঈশ্বরের বিশেষণের নামে মাসগুলির নামকরণ করিলেন। ২১শে মার্চ্চ তারিখে বাহাই নববর্ষের আরম্ভ। এই পঞ্জিকা আরব্ধ হইল, বা'বের ঘোষণা-কাল হইতে, অর্থাৎ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ তারিখ (যে তারিখ হইতে দিবা-রাত্রি সমান হইতে থাকে), সৌর বিজ্ঞান অনুসারে গণনা করিয়া স্থির করা হইল। প্রাচীন পারসিক নববর্ষও এই তারিখ হইতে আরম্ভ হয়।

বা'বের প্রবর্ত্তিত পঞ্জিকা অপেক্ষা সরল ও সুবিধাজনক কোনো পঞ্জিকা অদ্যাপি উদ্ভাবিত হয় নাই। সুতরাং যখন পৃথিবীর মানবকুল অদূর ভবিষ্যতে অধিকতর মৈত্রী ও ঐক্য স্থাপনের জন্য একটি পঞ্জিকা গ্রহণ করিবে, তখন বা'ব প্রবর্ত্তিত পঞ্জিকা গ্রহণ করাই সকলের পক্ষে সুবিধাজনক, এরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নহে। সার্ব্বজনীন পঞ্জিকারূপে ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ততা একমাত্র এই পঞ্জিকারই আছে।

বাহাই পঞ্জিকা অনুসারে মাসের নাম

মাস	আরবি নাম	অনুবাদ	প্রথম দিন
১	বাহা	বিরাট প্রভা	২১শে মার্চ্চ
২	জলাল	ঐশ্বর্য্য	৯ই এপ্রিল
৩	জমাল	সৌন্দর্য্য	২৮শে এপ্রিল
৪	আজ্‌মৎ	মহত্ব	১৭ই মে
৫	নু'র	আলোক	৫ই জুন
৬	রহমৎ	করুণা	২৪শে জুন
৭	কলিমাৎ	বাণী	১৩ই জুলাই
৮	আস্‌মা	নাম	১লা আগষ্ট
৯	কমাল	পরিপূর্ণতা	২০শে আগষ্ট
১০	ইজ্জৎ	গৌরব	৮ই সেপ্টম্বর
১১	মশিয়ৎ	আদেশ	২৭শে সেপ্টম্বর
১২	ইল্‌ম্‌	জ্ঞান	১৬ই অক্টোবর
১৩	কুদ্‌রৎ	ক্ষমতা	৪টা নভেম্বর
১৪	কাওয়ল্‌	উক্তি	২৩শে নভেম্বর
১৫	মসাইল্‌	প্রশ্ন	১২ই ডিসেম্বর
১৬	শর্ফ্‌	মর্য্যাদা	৩১শে ডিসেম্বর
১৭	সুল্‌তান	অধীশ্বরত্ব	১৯শে জানুয়ারী
১৮	মুল্‌ক	রাজত্ব	৭ই ফেব্রুয়ারী
	২৬শে ফেব্রুয়ারী	হইতে ১লা মার্চ্চ, ৪	কি ৫দিন যোগ দিয়া
১৯	উলা	উত্তুঙ্গতা	২রা মার্চ্চ

আধ্যাত্মিক সভা

যে কেন্দ্রে বাহাই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যা নয় জনের অধিক, সেইখানেই একটি "আধ্যাত্মিক সভা" বা ধর্ম্মসমিতি নির্ব্বাচন-পদ্ধতি-অনুসারে গঠিত করিতে হইবে; সেই অঞ্চলে সমস্ত বাহাইদিগের কার্য্য-কলাপ সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ও সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য এই আধ্যাত্মিক সভা বিশেষরূপে চেষ্টিত থাকিবে। পারস্য দেশে বাহাই আধ্যাত্মিক সভার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে জোনাব আসাদুল্লা' ফাজিল মাজিন্দরানী নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন; ইহা হইতে বাহাই পদ্ধতি-অনুসারে সভা-সমিতির নিয়মাবলী সবিশেষ জানিতে পারা যায়:—

"আধ্যাত্মিক সভার প্রধান কর্ত্তব্য-কার্য্যগুলি এইরূপ:—

(১) সভা-সমিতি আহ্বান পূর্ব্বক জনসাধারণের মধ্যে বাহাই উপদেশাবলী প্রচারিত করিবার ব্যবস্থা করা; রচনাবলীর মধ্য দিয়াও ঐ উদ্দেশ্য সাধিত করা হইয়া থাকে। সাধারণ জন-সভাতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে সাদরে আহ্বান করা হইয়া থাকে; এইরূপ সভা সপ্তাহে একাধিকবার আহূত হইয়া থাকে। ইহাতে বাহাইগণের শক্তি বর্দ্ধিত হয় ও নূতন বাহাই ধর্ম্মাবলম্বী সংগ্রহ করিতে পারা যায়, জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মের প্রচার সাধিত হয়।

(২) বাহাই ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা সাহায্যের যোগ্য, দুঃস্থ, তাহাদিগকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করা হয়। বাহাই বন্ধুদিগের মধ্যে যদি কেহ সাংসারিক, আধ্যাত্মিক বা বৈষয়িক কোনো ব্যাপারে বিপন্ন হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তিনি আধ্যাত্মিক সভার নিকটে সাহায্য-প্রার্থী হইতে পারেন; আধ্যাত্মিক সভা তাঁহাকে সাহায্য ও পরামর্শ-দানে উৎসাহিত করিয়া থাকেন।

(৩) শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার চর্চ্চার প্রসার বৃদ্ধি করা আধ্যাত্মিক সভার অন্যতম্ উদ্দেশ্য। প্রত্যেক বাহাই বালক-বালিকা সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে, এজন্য আধ্যাত্মিক সভার পরিপূর্ণ দায়িত্ব।

(৪) বাহাই-ধর্ম্মের বিধান সম্বন্ধে বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে জ্ঞান-দান করা আধ্যাত্মিক সভার কর্ত্তব্য। আধ্যাত্মিক সভা হইতে যোগ্য প্রচারক নিযুক্ত করা হয়, তাঁহারা সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিয়া বাহাই উপদেশাবলী সর্ব্বসাধারণের নিকটে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া থাকেন, সকলকে সেই সমস্ত আজ্ঞা, অনুশাসন মানিয়া চলিতে উৎসাহিত করেন। যদি কোনো ব্যক্তি বাহাই বন্ধুগণের সঙ্গে মেলামেশা করে ও বাহাই বলিয়া নিজেকে পরিচিত করে, কিন্তু বাহাই ধর্ম্মের কর্ত্তব্যগুলি অবহেলা করে, আধ্যাত্মিক সভা হইতে এইরূপ ব্যক্তির বিশেষ শিক্ষা-দানের জন্য বিশেষ সভা আহ্বান করা হইয়া থাকে। জ্ঞানী, দৃঢ়চিত্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ তাহাদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেন ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান করেন।

(৫) অর্থ সংগ্রহ করা ও সংগৃহীত অর্থের ভারগ্রহণ করা ও সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করা। সাধারণ সভাতে অর্থ সংগৃহীত হয় না, বাহাই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে বলা হয় না। যাহারা প্রকৃত "বাহাই", তাহারাই অর্থ সাহায্য করে। অর্থ-দাতাগণের নাম ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ আধ্যাত্মিক সভা একটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। অর্থ গ্রহণ করা ও গৃহীত অর্থের জন্য স্বীকার-পত্র প্রদান করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। বেনামী দান অনেক সময়ই দেওয়া হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক সভা স্থির করিয়া দেন, সংগৃহীত অর্থ কিরূপে ব্যয়িত হইবে; কত টাকা শিক্ষাকল্পে ব্যয়িত হইবে, কত টাকা দরিদ্রের সাহায্যকল্পে বিতরিত হইবে এবং

অন্যান্য ব্যাপারে কত ব্যয়িত হইবে, এই সমস্ত স্থির করিবার ভার আধ্যাত্মিক সভার উপরে।

(৬) মহোৎসবের ব্যবস্থা করা। মহোৎসবের তদারক করিবার জন্য, আধ্যাত্মিক সভা একটি "কমিটি" গঠন করেন। প্রত্যেক উনিশ দিন পরে পরে বন্ধু-সম্মেলন কর্ত্তৃক এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কমিটি কর্ত্তৃক রক্ষিত পুস্তকে উৎসবের সমস্ত ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উৎসব অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক, সে "কমিটি"কে জানাইয়া কমিটির সঙ্গে আলোচনা করিয়া একটি দিন স্থির করে, সঙ্গে সঙ্গে স্থান ও কালও ঠিক করা হয়। কোনো বন্ধু বৎসরে তিনটি উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে পারে, আবার কেহ হয়ত তিনটির অধিক উৎসবের আয়োজন করে, আবার কেহ হয়ত তিনটির কম। কমিটি কর্ত্তৃক রক্ষিত আর একখানি পুস্তকে মহোৎসবে সমাগত বাহাইদিগের অভ্যর্থনার আয়োজন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত তথ্যই লিপিবদ্ধ করা হয়। ভোজের দিন স্থির হইবার পর, যে ব্যক্তি ভোজ দিবে, তাহাকে জানান হয়, নগরে কতজন বাহাই আছেন। যদি সে ব্যক্তির সমস্ত বাহাইদিগকে অভিনন্দিত করা সামর্থ্যে না কুলায় অন্য বাহাইগণ সে উদ্বৃত্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে। নববর্ষ, রীজ্ওয়ান্ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মহোৎসবের উপলক্ষ্যেই নগরের সমস্ত বাহাইদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করা হইয়া থাকে, সাধারণতঃ নহে।

বাহাইদিগের সমস্ত কার্য্যকলাপ সেই অঞ্চলের আধ্যাত্মিক সভার নির্দ্দেশাধীন থাকিবে। আধ্যাত্মিক সভা হইতেই শক্তি ও আলোকের ধারা নিঃসৃত হইবে, বাহাইগণ সেই আলোক-ধারাতেই সঞ্জীবিত হইবে। সুতরাং, আধ্যাত্মিক সভা যদি পবিত্র ও আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে সে অঞ্চলে বাহাই ধর্ম্মের প্রসার ও উন্নতিলাভ

অসম্ভব হইবে। বাহাইগণের বুঝিতে পারা কর্ত্তব্য যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারে, আধ্যাত্মিক সভার আদেশ-পালন করা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আব্‌দুল্‌বাহা যে সমস্ত ফলকলিপিতে আধ্যাত্মিক সভার বিবিধ কর্ত্তব্যের কথা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, তাহাদের কোনো একটি প্রত্যেক আধ্যাত্মিক সভার অধিবেশনে পাঠ করা হইয়া থাকে।

আধ্যাত্মিক সভার সদস্য নির্ব্বাচন-পদ্ধতি এইরূপ :—

নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে সমস্ত বাহাই বন্ধুদিগকে সংবাদ দেওয়া হয়। অভিজ্ঞ, প্রবীণ বাহাইগণ সকলকে বুঝাইয়া দেন, আধ্যাত্মিক সভার সদস্যগণের কি কি উপযুক্ততা থাকা প্রয়োজন।' আব্‌দুল্‌বাহা বলেন যে আধ্যাত্মিক সভার সদস্যের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্ব-প্রধান বিশেষণ, এই, যে তাহাকে "পরম-অঙ্গীকার"এ অটল থাকিতে হইবে। বাহাই ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শিতা থাকা প্রত্যেক সদস্যের উচিত ও প্রত্যেক সদস্যের চরিত্রবান্ ব্যক্তি হওয়া কর্ত্তব্য। সকলে মিলিয়া সুসঙ্গতভাবে কাজ করিতে যে সমস্ত ব্যক্তি সমর্থ, তাহারাই নির্ব্বাচিত হইবে; যে ব্যক্তি বিরোধের বা অনৈক্যের কারণ হইবে বলিয়া মনে করা যায়, তাহাকে কদাচ নির্ব্বাচিত করা হইবে না।"

মহোৎসব

বাহাই ধর্ম্মের ভিত্তীভূত আনন্দ বহুবিধ মহোৎসবের মাঝ দিয়া প্রকাশিত হয়। সমস্ত বৎসরে বহু মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হয় ও ছুটীর দিনও অনেক থাকে। মিশর দেশে আলেকজান্দ্রিয়া নগরে, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, নওরোজ উপলক্ষ্যে আব্‌দুল্‌বাহা বলিয়াছিলেন :—

"ঈশ্বরের পুণ্য-বিধানে, প্রত্যেক যুগে ও প্রকাশের সময়ে

মহোৎসবের, পবিত্র দিন ও কর্ম্মবিহীন ছুটীর দিনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই সব দিনে সর্ব্বপ্রকার কাজ-কর্ম্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, শ্রম-শিল্প, চাষ-বাস প্রভৃতি বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য।

"এই সমস্ত দিনে সকলে মিলিয়া আনন্দ করিবে, সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া সকলে জগতের সম্মুখে ঐক্য, মিলন ও একপ্রাণতার পরিচয় দিবে।

"এই সমস্ত পুণ্য-দিনে কেবলমাত্র আনন্দ করিলেই দিনের সার্থকতা হইবে না; ধর্ম্মাচরণের প্রতি উদাসীন থাকিয়া দিনগুলিকে নিষ্ফল হইতে কদাচ দিবে না।

"এইরূপ দিনে জগতের স্থায়ী হিত-সাধনের নিমিত্ত নানারূপ সৎ-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

"বর্ত্তমান সময়ে জনসাধারণকে সত্যপথপ্রদর্শন করাই সর্ব্বপ্রধান মঙ্গলকর কার্য্য। আমি নিঃসংশয়ে আশা করি, ঈশ্বরের বন্ধুগণ ঐ সমস্ত পুণ্য-দিনে এ প্রকার প্রকৃত জনহিতকর আদর্শ কার্য্যের নিদর্শন রাখিয়া যাইবেন, যাহা শুধু বাহাইদিগের নহে, সমগ্র মানব জাতির হিতসাধন করিবে। এই অভূতপূর্ব্ব ঈশ্বর-বিধানে সর্ব্বপ্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্যই করিতে হইবে, কোনো এক ব্যক্তিকেও বাদ দেওয়া চলিবে না; কারণ, ইহা ঈশ্বরের অনুকম্পারই প্রকাশ। সুতরাং, আমি আশা করিতেছি, ঈশ্বরের বন্ধুগণের প্রত্যেকেই সমগ্র মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের অনুকম্পার অবতাররূপে প্রকাশিত হইবেন।"

বাহাই পঞ্জিকা অনুসারে, "নওরোজ" বা নববর্ষ, "রীজ্‌ওয়ান্", বা'বের জন্ম-তারিখ, বাহাউল্লা'র জন্ম-তারিখ, বা'বের অবতারত্ব-ঘোষণার তারিখ (এই দিনেই আবদুল্‌বাহা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন) মহোৎসবের দিবস বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পারস্য-দেশে এই সমস্ত দিনে

নানারূপ আনন্দের আয়োজন করা হইয়া থাকে, নানাবিধ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকলে মিলিয়া শ্লোক-গান করে, পুণ্য ফলকলিপি পাঠ করে, সময়োচিত অভিভাষণ পাঠ করে ও সঙ্গীত প্রভৃতি নানা প্রকার আনন্দের আয়োজন করিয়া দিবসগুলি সার্থক করিতে চেষ্টা করে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ মাসের মধ্যবর্ত্তী কয়েকদিন (অর্থাৎ, ২৬শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত) অতিথি-সৎকার, নানারূপ উপহারের আদান-প্রদান, দরিদ্র, আতুর, পীড়িত ব্যক্তির সেবা, এই সমস্ত সৎকার্য্যে অতিবাহিত করা হইয়া থাকে।

বা'ব, বাহাউল্লা' ও আব্‌দুল্‌বাহার তিরোধানের তারিখে সভা-সমিতি আহ্বান করা হয়, প্রার্থনাবলী আবৃত্তি করা হয়, শ্লোক পঠিত হয় ও অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে সেই মহামানবদিগের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করা হয়।

উপবাস বা "রোজা"

পূর্ব্ব-বর্ণিত কয়েকদিবস-ব্যাপী অতিথি-সৎকারের অব্যবহিত পরেই যে মাস, অর্থাৎ উনবিংশ মাসই উপবাসের মাস। উনিশ দিন ধরিয়া উপবাস করা হয়; সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার পান-ভোজন হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকিতে হয়। সূর্য্য যে তারিখে বিষুব-রেখা ও অয়নমণ্ডলের সংযোগ-স্থলে উপস্থিত হয়, ঠিক সেই তারিখে উপবাসের মাস শেষ হয়; এই কারণে উপবাসের মাস চিরকাল একই ঋতুতে আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ, তখন উত্তর ভূমণ্ডলে বসন্তকাল, দক্ষিণ ভূমণ্ডলে শরৎকাল,—গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড উত্তাপের সময়ও নহে কিম্বা শীতকালের নিদারুণ শীতের সময়ও নহে, যখন উপবাস করা কষ্টকর হইতে পারে। অধিকন্তু, সেই সময়ে ভূমণ্ডলের বাসোপযোগী

সর্ব্বস্থানে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের মধ্যবর্ত্তীকাল প্রায় সমান হয়, অর্থাৎ, সূর্য্যোদয় পূর্ব্বাহ্ন ৬টার সময় হইয়া থাকে এবং সূর্য্যাস্ত অপরাহ্ণ ৬টার সময়। বালক, রোগী, ভ্রাম্যমাণ, অতিদুর্ব্বল বা অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি, অন্তঃসত্ত্বানারী বা যে নারীর স্তন্যপায়ী শিশু আছে, তাহাদের পক্ষে উপবাস বাধ্যতামূলক নহে।

অসংখ্য প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে যে এইরূপ সাময়িক উপবাস যাহা বাহাই বিধানে মানবের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত করা হইয়াছে, তাহা মানবের শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক ও হিতকারী; কিন্তু বাহাই উৎসবের সত্যতা যেরূপ পার্থিব খাদ্য গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, আমাদের আধ্যাত্মিক খাদ্য, ঈশ্বরের প্রশংসা কীর্ত্তনের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ বাহাই উপবাস শুধু খাদ্য হইতে বঞ্চিত থাকিলেই সম্পন্ন হয় না; যদিও পার্থিব খাদ্য হইতে নিবৃত্ত হইলে শরীর-সংস্কারে সাহায্য হইতে পারে, তথাপি ইন্দ্রিয়সুখাসক্তি হইতে নিবৃত্ত না হইলে এবং ঈশ্বর ব্যতীত সকল বস্তু হইতে বিযুক্ত হইয়া না থাকিলে, বাহাই উপবাস সিদ্ধ হয় না। আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন:—

"উপবাস একটি চিহ্ন বা লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উপবাসের অর্থ, লোভ, কাম প্রভৃতি অসৎ বৃত্তি হইতে দূরে থাকা। শারীরিক উপবাস এই নিবৃত্তিমূলক মনোভাবের চিহ্ন। উপবাসী ব্যক্তি প্রবৃত্তি-মার্গ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিবৃত্তি-মার্গ আশ্রয় করিল, ইহাই উপবাসের তাৎপর্য্য। মাত্র খাদ্য বা পানীয় হইতে বঞ্চিত থাকিলেই উপবাস সম্পূর্ণ হয় না; মাত্র দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনের প্রভাব আত্মার উপর অতি সামান্য। শারীরিক উপবাস মানসিক বা আধ্যাত্মিক উপবাসের স্মারক মাত্র; যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে শারীরিক

উপবাসের কোনো মূল্যই নাই। একেবারে ভোজন করিবে না বা সম্পূর্ণরূপে খাদ্য-পানীয় হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে, উপবাসের অর্থ তাহা নহে। খাদ্য সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট পন্থা এই যে অত্যন্ত অধিকও ভোজন করিবে না বা অত্যন্ত অল্পও ভোজন করিবে না। পরিমিত আহারই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভারতবর্ষে একটি সম্প্রদায় আছে; সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ অতিরিক্ত আত্ম-সংযম অভ্যাস করে, আহার্য্যের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমাইয়া শেষে প্রায় আহার না করিয়াই জীবনধারণ করে। তাহাতে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। খাদ্যাভাবে দুর্ব্বল দেহ বা মস্তিষ্ক লইয়া ঈশ্বরের সেবা পরিপূর্ণ শক্তিতে করা যাইতে পারে না; তাহাদের দিব্য-দৃষ্টি জন্মিতে পারে না।"—(ফর্টনাইট্‌লি রিভিউ পত্রিকাতে জুন, ১৯১১তে প্রকাশিত প্রবন্ধে, মিস্ ই এস্ ষ্টিভেন্‌স্ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বাণী)

সভা-সম্মেলন

ঈশ্বর বিশ্বাসীগণ নিয়মিতভাবে সমবেত হইয়া সভা-সম্মেলন আহ্বান করিবে; সভা-সম্মেলনের অধিবেশনের প্রতি আব্দুল্‌বাহা বিশেষ জোর দিয়াছেন, যেখানে তাহারা সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, পবিত্র উপদেশাবলী পাঠ করিবে ও তাহার আলোচনা করিবে, ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে পরস্পর-পরামর্শ করিবে। তিনি এক ফলকলিপিতে বলিতেছেন :—

"ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ঈশ্বরের বন্ধুগণের এবং করুণাময়ের ভৃত্যাগণের মধ্যে মিলন ও ঐক্যমত দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না, ততদিন

কিছুতেই কোনো বিষয়-কর্ম্মেই উন্নতি হইবে না। এই আধ্যাত্মিক সভাগুলি ঐক্য ও মিলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এ বিষয় অতিশয় গুরুত্ব-পূর্ণ, ইহা ঈশ্বরের সাহায্য-সহায়তা আকর্ষণ করিবার চুম্বক স্বরূপ।"—(আব্‌দুল্‌বাহার ফলকলিপি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫)

বাহাইগণের আধ্যাত্মিক সভার অধিবেশনে কদাচ তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিতণ্ডা, বা পার্থিব বা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার লইয়া বাদ-প্রতিবাদ হইতে পারিবে না; এগুলি বিষবৎ পরিত্যাজ্য। বিশ্বাসীগণের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে, ঐশ্বরিক সত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা ও সেই লব্ধজ্ঞান সকলের মধ্যে বিতরণ করা। তাহারা ঐশ্বরিক প্রেমে তাহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ করিবে, ঈশ্বরের আদেশ-পালনে উপযুক্ততর হইবে, এবং ঈশ্বরের রাজত্ব পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহারা নিয়তই যত্নবান্ থাকিবে। আব্‌দুল্‌বাহা ১৯১২ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক সহরে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন ঃ—

"বাহাই সম্মিলনী স্বর্গীয় জনমণ্ডলীর সভা হইবে; স্বর্গীয় জন-মণ্ডলীর আলোকে ইহা উদ্ভাসিত হইবে; চিত্তসমূহ মুকুরের ন্যায় নির্ম্মল হইবে, তাহাতে সত্য-সূর্য্যের কিরণ-রশ্মি প্রতিবিম্বিত হইবে। প্রত্যেক বক্ষঃস্থল টেলিগ্রাফের ষ্টেশনস্বরূপ; টেলিগ্রাফ-তারের একপ্রান্ত আত্মার অভ্যন্তরে থাকিবে, অপর প্রান্ত স্বর্গীয় জনমণ্ডলীর মধ্যে, — যাহাতে উভয়ের মধ্যে সংবাদ-বিনিময় হইতে পারে। এইরূপে 'আবৃহা' রাজ্য হইতে স্বর্গীয় প্রেরণা 'সঞ্চারিত হইবে, সর্ব্বপ্রকার আলোচ্য-বিষয়ে ঐক্যমত সাধিত ও প্রচলিত হইবে। * * * তোমাদের মধ্যে একতা, একপ্রাণতা, প্রেমের প্রাবল্য যতই বাড়িবে, তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের সাহায্য-সহায়তা ততই অধিক বর্দ্ধিত হইবে, এবং স্বর্গের আশীষপূত সুন্দরপুরুষ বাহাউল্লা'র দান-উপহার তোমাদের সাহায্যকারী হইবে।"

তিনি আর এক ফলকলিপিতে বলিতেছেন :—

"এই সমস্ত সভা-সম্মিলনীতে বাহিরের কথাবার্ত্তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য; ঈশ্বরের বাণী ও শ্লোক পাঠ করা, প্রমাণের ব্যাখ্যা করা, সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করা, প্রাণীকুলের প্রেমাস্পদের নিদর্শন অন্বেষণ করা এবং তাদৃশ ধর্ম্মসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার লইয়া সম্মিলনীর কার্য্য সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। সম্মিলনীতে যাহারা যোগ দান করিবে, তাহাদের কর্ত্তব্য এই যে, তাহারা সম্মিলনীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে নিতান্ত শুচি, শুদ্ধ হইয়া "আব্‌হা" রাজ্যের দিকে মন নিবিষ্ট করিয়া, বিনয় নম্রভাবে সম্মিলনীতে প্রবেশ করিবে; ফলকলিপি পাঠের সময় শান্ত ও নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিবে; যদি কেহ কিছু বলিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, একান্ত সৌজন্য-শ্রদ্ধা সহকারে উপস্থিত সকলের সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক, সরল ওজস্বী ভাষায় সে তাহা করিতে পারিবে।"

মশ্‌রিকুল্ আজ্‌কার্

প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক নগরে উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য বাহাউল্লা' তাঁহার অনুগামীগণকে আদেশ করিয়াছেন। তিনি এই মন্দিরের নাম দিয়াছেন — "মশ্‌রিকুল্ আজ্‌কার্"; ইহার অর্থ, "ঈশ্বরের প্রতি স্তোত্র-নিবেদন করিবার স্থান" বা "ঐশ্বরিক-স্তোত্রের উদয়াচল"। "মশ্‌রিকুল্ আজ্‌কার্" নবপার্শ্ব-সমন্বিত প্রাসাদ বিশেষ,— যাহার উপরে গম্বুজ থাকিবে, স্থাপত্য-শিল্পে ও নির্ম্মাণ-কৌশলে অদ্বিতীয় হইবে, পুষ্প, বৃক্ষ, প্রস্রবণে সুশোভিত একটি বৃহৎ উদ্যানে ইহা নির্ম্মিত হইবে। "মশ্‌রিকুল্ আজ্‌কার্"এর চতুর্দ্দিকে আরও বহুসংখ্যক

প্রাসাদ থাকিবে, যাহার মধ্যে শিক্ষাসম্বন্ধীয়, দান-ধর্ম্মবিষয়ক, সমাজ-সংক্রান্ত, যাবতীয় জনহিতকর কার্য্য চলিতে থাকিবে — যেন এই পূজা-মন্দিরে ঈশ্বরোপাসনা মন্দিরের শিল্প ও তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অপরিসীম আনন্দদায়ক পূর্ণতার সহিত এবং মানবের সামাজিক অবস্থার উন্নতিকল্পে করণীয় সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের সহিত নিবিড় সম্বন্ধে নিয়ত বিজড়িত থাকে। (১)

অদ্যাপি, পারস্য দেশে রাজাদেশ অনুসারে বাহাইদিগকে তাহাদের উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া হয় নাই; সুতরাং রাশিয়াতে ইশ্‌কাবাদ্ নামক স্থানে প্রথম মশ্‌রিকুল্ আজ্‌কার্ নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মশরিকুল্ আজ্‌কার্ আমেরিকার শিকাগো নগরের নিকটে হ্রদের তীরে উইল্‌মেট্ট নামক স্থানে নির্ম্মিত হইবে। সুন্দর, নির্ম্মাণোপযোগী একটি স্থান ক্রয় করা হইয়াছে, মন্দিরের নক্সা অনুমোদিত হইয়াছে, মিষ্টার লুইস্ বুর্জিওই নামক একজন স্থাপত্য-শিল্পী

(১) "মশ্‌রিকুল্ আজ্‌কার্"এর সম্পর্কে টেনিসনের কয়েকটি লাইন মনে পড়িবে:—

"স্বপ্নালোকে দেখিলাম,
প্রতিখণ্ড প্রস্তর করিয়া যোজনা, নির্ম্মিত মন্দির।
পুণ্য পূজায়তন, আকাশে তুলিল চূড়া, গাহিল স্বর্গের জয়।
'প্যাগোডা', 'মস্‌জিদ্', 'গির্জ্জা', মহত্তর সকলের চেয়ে,
এ নূতন উত্তুঙ্গ সৃষ্টি, জটিলতাহীন, একান্ত সরল,
সদা উন্মুক্ত দ্বার-পথ দিয়া স্বর্গের সমীর বহে অবিরাম,
ন্যায়পরতা, শান্তি, প্রেম, সত্যের পরম নিকেতন।"

—(আক্‌বরের স্বপ্ন, ১৮৯২)

এই নক্‌সা প্রস্তুত করিয়াছেন, মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। আব্‌দুল্‌বাহা পাশ্চাত্য জগতের এই "মাতৃ-মন্দির" সম্বন্ধে বহু ফলক-লিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন,—তিনি লিখিয়াছেন :—

"ঈশ্বরের মহিমা ধন্য হউক,—আজিকার দিনে পৃথিবীর সর্ব্বদেশ হইতে সকলে যথাশক্তি 'অর্থ-সাহায্য প্রেরণ করিতেছে, আমেরিকার 'মশ্‌রিকুল্‌ আজ্‌কার্‌' নির্ম্মিত হইবার জন্য। *** আদমের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত, মানুষ কখনও এইরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে নাই; এসিয়ার দূরতম প্রদেশ হইতে আমেরিকাতে মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য অর্থ প্রেরিত হওয়া সত্য সত্যই অভূতপূর্ব্ব। ইহা "ঈশ্বরের অঙ্গীকার" এর শক্তি-প্রভাবে সম্পন্ন হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, অনুভব-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রের নিকটে ইহা একটি অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। আশা করা যায়, ঈশ্বর বিশ্বাসীগণ এই মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিবেন ও অকৃপণ চিত্তে মন্দির-নির্ম্মাণ-কল্পে অর্থসাহায্য করিবেন। * * * অবশ্য, আমি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কোনোরূপে ক্ষুণ্ণ করিতে চাহি না; যদি কেহ এবিষয়ে অর্থ-সাহায্য না করিয়া অন্য বিষয়ে অর্থ-দান করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা স্বচ্ছন্দে করিতে পারে। তাহার স্বাধীনতায় কদাচ হস্তক্ষেপ করিও না; কিন্তু জানিয়া রাখিও, বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু, "মশ্‌রিকুল্‌ আজ্‌কার্‌"-নির্ম্মাণ।

"'মশ্‌রিকুল্‌ আজ্‌কার্‌'এর নয়টি দিক থাকিবে; বহু সংখ্যক দ্বার, প্রস্রবণ, পথ, তোরণ-দ্বার, স্তম্ভ-রাজি, উদ্যান, সর্ব্বনিম্নতল, গ্যালারী বা প্রেক্ষা-গৃহ, সর্ব্বোপরি গম্বুজ, সমস্তই থাকিবে; নির্ম্মাণ-পদ্ধতি অতি সুন্দর হইবে, মন্দিরের পরিকল্পনাও তদনুরূপ হইবে। এই অট্টালিকার রহস্য অনেক,—এখন তাহা উদ্‌ঘাটিত করা সমীচীন

নহে ; কিন্তু জানিয়া রাখিও, 'মশ্‌রিকুল্‌-আজ্‌কার্‌'-নির্ম্মাণই অদ্যকার দিনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্য। 'মশ্‌রিকুল্‌-আজ্‌কার্‌'এ নিম্নোল্লিখিত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান থাকিবে: অনাথ বালকদিগের জন্য বিদ্যালয়; দরিদ্র, আতুর ব্যক্তিদিগের জন্য চিকিৎসালয়; অশক্ত, অক্ষম ব্যক্তির জন্য বাস-গৃহ, উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিবার জন্য কলেজ, ভ্রাম্যমাণের বাসোপযুক্ত পান্থ-শালা।

"এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা 'মশরিকুল্‌-আজ্‌কারেই' থাকিবে; এই নিয়মেই প্রত্যেক নগরাতে 'মশ্‌রিকুল্‌-আজ্‌কার্‌' প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যহ প্রভাতে 'মশরিকুল্‌ আজ্‌কার'এ উপাসনা যথারীতি হইবে। মন্দিরে ঐকতানের জন্য বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ। নিকটবর্ত্তী দালানে ভোজ-উৎসব, উপাসনা, সম্মেলন, সাধারণ সভা ও আধ্যাত্মিক সভার কার্য্য চলিতে থাকিবে, কিন্তু মন্দিরে, প্রার্থনা-গান বা শ্লোক-গান কোনো সঙ্গীত-যন্ত্রের সঙ্গে চলিবে না। মন্দিরের দ্বার সমগ্র মানবকুলের জন্য উন্মুক্ত করিতে হইবে।

"যখন এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ — কলেজ, চিকিৎসালয়, অতিথিশালা, অচিকিৎস্যদিগের জন্য উপযুক্ত বাস-গৃহ, উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিবার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যের জন্য প্রাসাদ সমূহ নির্ম্মিত হইবে, তখন মন্দিরের দ্বার, বর্ণ-জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত হইবে; কোনোরূপ ভেদ-বুদ্ধি সেখানে স্থান পাইবে না, কোনো প্রকারের সীমা বা গণ্ডিরেখা টানা হইবে না। মন্দিরের দয়াপরায়ণতার অভিব্যক্তি সর্ব্বমানবের প্রতি সমানভাবে প্রযুক্ত হইবে। নানা বিভিন্ন জাতি, নানা বিভিন্ন ধর্ম্ম, নানা বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তিগণ 'মশ্‌রিকুল্‌-আজ্‌কার্‌'এর হিতসাধন-প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য লাভ করিবে; কাহারো প্রতি পক্ষপাত করা

হইবে না, সকলের প্রতি সমভাবে প্রেম করা হইবে। সর্ব্বমধ্যস্থিত দালান উপাসনাগার রূপে ব্যবহৃত হইবে। এইরূপে * * * ধর্ম্ম, বিজ্ঞানের সহিত সুর বাঁধিয়া থাকিবে, বিজ্ঞান ধর্ম্মের দাসী হইবে। ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান, উভয়ে নিজ নিজ পার্থিব, অপার্থিব, সর্ব্বপ্রকার দান-উপহার সমগ্র মানবজাতির উপর অজস্রধারায় বর্ষণ করিবে।"

মৃত্যুর পরে জীবন-প্রবাহ

বাহাউল্লা' বলেন, রক্ত-মাংসের শরীরের আবেষ্টনীর মধ্যে যে জীবন যাপন করা হয়, তাহা আমাদের শাশ্বত, অনন্ত, পরিপূর্ণ জীবনের আরম্ভ মাত্র, ভ্রূণস্বরূপ; শরীর হ'তে আত্মা মৃত্যুর দ্বার-পথ দিয়া নিষ্কাসিত হইয়া নবজন্ম-লাভ করে, পূর্ণতর, উন্মুক্ত অস্তিত্বে প্রবেশ করে। তিনি "মোবারেক" ফলকলিপিতে বলিয়াছেন:—

"জানিয়া রাখ,—দেহ হইতে আত্মা প্রস্থান করার পর উন্নতি করিতে থাকে, যে পর্য্যন্ত না ইহা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে প্রবেশ করে—এমন এক অবয়ব ধারণ করিয়া, যাহা ঈশ্বরের রাজত্ব, অধীশ্বরত্ব, শক্তি ও ক্ষমতার ন্যায় চিরস্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকিবে, এবং ইহা হইতে ঈশ্বরের নিদর্শন, বিশেষণ, প্রসাদ ও উপহার ইত্যাদি প্রকাশিত হইবে। তখন, পরম করুণাময়ের হস্ত ইহাকে এমন এক উচ্চ স্তরে লইয়া যাইবে, যাহা বর্ণনার অতীত, যাহা জগতের প্রাণীকুলের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। ঐ আত্মাই পরম ভাগ্যবান্, যাহা জাতিগণের কুসংস্কার ও সংশয়বাদ হইতে মুক্ত হইয়া দেহ হইতে প্রস্থান করে। বাস্তবিক পক্ষে ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছার পবিত্র বায়ুতে সঞ্চরণ করে এবং সর্ব্বোচ্চ স্বর্গে প্রবেশ অধিকার করে; সর্ব্বোচ্চ স্বর্গের

দূতমণ্ডলী ইহাকে ঘেরিয়া থাকে, ভৃত্যের ন্যায় ইহার আদেশ প্রতীক্ষা করে; ইহা ঈশ্বরের সমস্ত সিদ্ধপুরুষ ও অবতারগণের সহচরত্ব লাভ করে, তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করে, তাঁহাদিগকে বলে, যাহা কিছু ইহার উপরে ঘটিয়াছে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ঈশ্বরের পথে।

"যদি কেহ জানিতে পারিত, স্বর্গ-মর্ত্তোর প্রভু ঈশ্বরের রাজ্যে কি ব্যবস্থিত রহিয়াছে, তাহা হইলে, সে বিপুল আগ্রহসহকারে, সেই প্রভাময়, অত্যুচ্চ, অপরিবর্ত্তনীয় পবিত্র-পদ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। আত্মার অবয়ব সম্বন্ধে,—ইহা বর্ণনা করা যাইতে পারে না এবং ইহার বিবরণ দেওয়ার আবশ্যকতাও নাই; মাত্র কয়েকটি বিষয় জানিতে হইবে: ঈশ্বরের অবতারগণ সমাগত হইয়াছিলেন, জন-সাধারণকে ঈশ্বরের সরল-পথে পরিচালিত করিবার জন্য ও তাহাদিগকে শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত।

"আমি ঈশ্বরের অবিনাশিত্বের দিব্য করিয়া বলিতেছি,—এই সমুদয় পবিত্র আত্মাগণই জাতিসমূহের মর্য্যাদা-বৃদ্ধি ও জনসাধারণের ক্রমোন্নতির কারণ, তাঁহাদের দ্বারাই সৃষ্ট-জগৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহারা সর্ব্বকালে মানব-জগতের অতীত; মাতৃ-জঠরে ভ্রূণ-জগৎ এবং এই জগতে যে পার্থক্য, ইহজগৎ ও পরজগতে অবিকল সে একই পার্থক্য বিদ্যমান্।"—(আলী কুলী খাঁ কর্ত্তৃক অনূদিত, ১৯০৩)

সে একইরূপে,—আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন:—

"মানুষ এই জগতে যে নিগূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত নহে, তাহা সে অপর জগতে জ্ঞাত হইবে, সেখানেই তাহাকে সত্যের নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত করা হইবে; আর সেখানেই সে ঐ সকল ব্যক্তিকে জানিতে চিনিতে পারিবে, যাহাদের সঙ্গে সে এ জগতে সংসর্গ করিত। নিঃসন্দেহ যে, ঐ সমস্ত পবিত্র-আত্মা যাহারা দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হয়,

এবং যাহাদিগকে অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে, তাহারা জ্যোতির্ম্ময় জগতের সর্ব্বপ্রকার রহস্যের সঙ্গে পরিচিত হইয়া যাইবে এবং প্রত্যেক মহামানবের প্রকৃতত্ব স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য যাচ্ঞা করিবে, এমন কি, তাহারা সে জগতে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ অবলোকন করিবে। এইরূপে তাহারা স্বর্গীয় জনমণ্ডলীতে প্রাচীন ও বর্ত্তমান উভয়কালের ঈশ্বরের বন্ধুগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে।

"এই নশ্বর জগৎ হইতে প্রস্থান করিবার পর, মানবের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য স্বতঃই উপলব্ধ হইবে। কিন্তু, এই বৈশিষ্ট্য স্থান বা পদ সম্বন্ধীয় নহে, বরং আত্মা ও বিবেক সম্বন্ধীয়। কারণ, ঈশ্বরের রাজ্য স্থান ও কাল হইতে পবিত্র; ইহা অপর এক জগৎ, অপর এক সংসার। তুমি নিঃসন্দেহে জানিয়া রাখ যে উচ্চতর জগৎ-সংসারে আধ্যাত্মিক বন্ধুগণ পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিবে এবং এক আধ্যাত্মিক মিলনের প্রত্যাশী হইবে। এমতে, এজগতের পারস্পরিক প্রেম অপর জগতে মুছিয়া যাইবে না, এই পার্থিব জীবনেরও বিস্মৃতি হইবে না"—(আবদুলবাহার ফলকলিপি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪)

স্বর্গ ও নরক

প্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থে স্বর্গ-নরকের যে সমস্ত বর্ণনা লিখিত আছে, বাহাউল্লা' এবং আবদুলবাহা মনে করেন, তাহা রূপক মাত্র। তাঁহারা বলেন, বাইবেলে বর্ণিত পৃথিবীর সৃষ্টিসম্বন্ধীয় উপাখ্যানের মত স্বর্গ-নরকের বর্ণনাও অক্ষরে অক্ষরে সত্য নহে, উহাকে রূপক মনে করাই বিধেয়। তাঁহাদের মতানুসারে, পূর্ণতালাভের অবস্থাই স্বর্গ, অপূর্ণতার অবস্থাই নরক। ঈশ্বরের অভিপ্রায় এবং তাঁহার ভৃত্যগণের সহিত

সঙ্গতি, সামঞ্জস্যই স্বর্গ, অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্যই নরক। স্বর্গ আধ্যাত্মিক জীবনের নামান্তর মাত্র, যেমন নরক আধ্যাত্মিক মৃত্যুর নামান্তর। দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বাস করিবার অবস্থাতেও মানুষ স্বর্গে বা নরকে থাকিতে পারে। আধ্যাত্মিক আনন্দই স্বর্গ-সুখ এবং এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকার নামই নরক-যন্ত্রণা।

আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন :—

"মানুষ যখন ঈশ্বর বিশ্বাসের আলোক-সাহায্যে পাপের তিমির হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে এবং সত্য-সূর্য্যের কিরণ সম্পাতে আলোকিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সদগুণাবলীতে ভূষিত হয়, তখন সে ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলিয়া বিবেচনা করে, প্রকৃত স্বর্গ বলিয়া জানিয়া লয়। সে একই রূপে, সে মনে করে, প্রাকৃতিক জগতের দাস হইয়া থাকাই, আধ্যাত্মিক শাস্তি; ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থান করা, পশুবৎ মূর্খ হইয়া থাকা, ইন্দ্রিয়পরবশ হওয়া, পাশবিক প্রবৃত্তিতে বিবশ হইয়া পড়া, অসৎ স্বভাবে বিশোভিত হওয়া, * * * এই গুলি ঘোরতর শাস্তি ও দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা।

"এই জগৎ ত্যাগ করার পরে, আধ্যাত্মিক জগতে শান্তি ও পূর্ণতা লাভ করা, * * * স্বর্গরাজ্যে আধ্যাত্মিক প্রসাদ, আধ্যাত্মিক উপহার প্রাপ্ত হওয়া, আত্মা ও হৃদয়ের অভিলাষ পূর্ণ হওয়া এবং অমর জগতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করাই অপর জগতের পুরস্কার। সে একই নিয়মে, ঈশ্বরের বিশেষ প্রসাদ ও পরম অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত থাকা এবং সৃষ্টির অতি নিম্নস্তরে নিপতিত হওয়াই অপর জগতের শাস্তি। ঈশ্বরের প্রসাদ হইতে বঞ্চিত ব্যক্তি যদিও মৃত্যুর পরেও বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু সত্যের জনমণ্ডলী তাহাকে মৃত বিবেচনা করে।

"অপর জগতের ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বরের সান্নিধ্য-লাভ.। সুতরাং, যাহারা স্বর্গীয় প্রাঙ্গণের সন্নিকটে অবস্থান করে,, তাহারা নিশ্চয়ই অপরের জন্য প্রার্থনা করিতে-পারে: এরূপ প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয়; এমন কি, ইহাও সম্ভব যে, ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসে ও পাপাচারে যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, অর্থাৎ ঈশ্বরের ঔদার্য্যের মাঝ দিয়া তাহারাও মোক্ষলাভ করিতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচার দিয়া নহে; কারণ, ঔদার্য্য অর্থে অনুপযুক্তকে দান করা বুঝায় এবং ন্যায়-বিচার অর্থে উপযুক্তকে পুরস্কৃত করা। আমরা এখানে যেমন ঐ সমস্ত আত্মার জন্য প্রার্থনা করিতে পারি, তদ্রূপ অপর জগতে অর্থাৎ স্বর্গীয় রাজ্যেও আমাদের সে একই ক্ষমতা থাকিবে। সুতরাং সেই জগতেও তাহারা উন্নতি করিতে পারে। তাহারা এখানে যেমন আপন প্রার্থনা বলে স্বর্গীয় আলোক প্রাপ্ত হইতে পারিত, তদ্রূপ সেখানেও তাহারা ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিতে পারে, এবং সানুনয় প্রার্থনা বলে স্বর্গীয় আলোক প্রাপ্ত হয়।

"এই ভৌতিক দেহ ত্যাগ করার পূর্ব্বে ও পরে, উভয় কালে মানবের উন্নতি পূর্ণতার মধ্যে হইয়া থাকে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্তর বা পদ অতিক্রম করিয়া নহে, কেননা পূর্ণ মানবের স্তর হইতে উচ্চতর এমন কোনো স্তর বা পদ নাই, যাহাতে সে উন্নীত হইতে পারে। সে কেবলমাত্র মানব-স্তরেই উন্নতি করে, কেননা মানবীয় পূর্ণতা অসীম ও অনন্ত। এই হেতু, এক ব্যক্তি যতই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হউক না কেন, আমরা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর পণ্ডিত কল্পনা করিতে পারি। সুতরাং, যখন মানবীয় পূর্ণতা অসীম ও অনন্ত, মানব এই জগৎ পরিত্যাগ করার পরেও পূর্ণতার মধ্যে উন্নতি করিতে পারে।"—(কতিপয় প্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ২৫৯-২৭৪)

বিশ্ব জগতের মূলীভূত ঐক্য

বাহাউল্লা' যে সর্ব্বমানবীয় ঐক্যের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র শরীরী মানবদিগের একতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, বরং শরীরী-অশরীরী, মৃত ও জীবিত সমগ্র মানবকুলের ঐক্য-সম্বন্ধে সম্পর্কিত। বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত মানব পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে, তাহারা এব লোকান্তরগত যে সমস্ত মানব আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থান করিতেছে, উভয়ে একই যান্ত্রিক গঠনের বিভিন্ন অংশের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আধ্যাত্মিক মিলন বা ভাব-বিনিময় অসম্ভব কি অস্বাভাবিক নহে, বরং তাহা অনিবার্য্যরূপে অহরহঃ চলিতেছে। যাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি অদ্যাপি অপরিণত, তাহারা এই উভয় জগতের মধ্যে যৌগিক সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু যখন তাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি বর্দ্ধিত হয়, তখন মৃত্যুর যবনিকান্তরালে অবস্থিত আত্মাদিগের সঙ্গে তাহাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠে। সাধু, সন্ত, মহাত্মা এবং অবতারগণের নিকট এই আধ্যাত্মিক নৈকট্য-সম্বন্ধের উপলব্ধি অতি বাস্তব ও অতি অভ্যস্ত। সাধারণ মানুষ যেমন চর্ম্ম-চক্ষু দ্বারা পরিদৃশ্যমান্ জগৎ অনায়াসে দেখিতে পায়, তাঁহারাও সেইরূপ মৃত্যুর অপর তীরের জগৎটিকে অনায়াসে নিরীক্ষণ করিতে পারেন।

আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন:—

"অবতারগণের যে দিব্য-দৃষ্টির কথা আমরা সাধারণ্যে শুনিতে পাই, সে দৃষ্টি প্রকৃত ও বাস্তব; তাহা স্বপ্ন নহে, পরন্তু তাহা আধ্যাত্মিক আবিষ্কার বিশেষ। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে: একজন মহাপুরুষ বলিলেন—'আমি কোনো একটি বিশেষ

আকারে কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তিকে দেখিলাম; আমি তাহাকে এইরূপ বলিলাম, সে আমাকে এইরূপ উত্তর দিল।' সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় এই দৃষ্টি ঘটিয়া থাকে, নিদ্রিতাবস্থায় নহে; সুতরাং ইহাকে স্বপ্ন মনে করিবার কোনো কারণ নাই। ইহাকে একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক আবিষ্কার মনে করাই বিধেয়।

৮. "আত্মাদিগের মধ্যে অধ্যাত্মবোধ, আবিষ্কার এবং এমন এক প্রকার পরস্পর-সম্পর্ক বিদ্যমান্ রহিয়াছে যাহা কল্পনা ও ধারণার অতীত এবং এমন এক সংস্রব রহিয়াছে যাহা স্থান ও কাল হইতে পবিত্র ও স্বাধীন। এমতে বাইবেলে লিখিত আছে, তাবুর পর্ব্বতের উপরে মুসা এবং ইলিয়াস্ যীশুখৃষ্টের নিকটে আসিলেন; এই সাক্ষাৎ সাধারণ মানুষে-মানুষে সাক্ষাৎ, এরূপ মনে করিলে ভুল করা হইবে। বস্তুতঃ ইহা একটি বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অবস্থা। এইরূপ পরস্পর-মিলন ও ভাব-বিনিময় বাস্তব-সত্য, ইহা মানবের মনে ও চিন্তাধারায় অতি বিস্ময়কর ফল উৎপাদন করে, তাহাদের অন্তঃকরণে বিপুল পুলকের সঞ্চার করে।"—(কতিপয় প্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ২৯০—২৯২)

আব্দুল্‌বাহা অতি-প্রাকৃত আধ্যাত্মিক শক্তির বাস্তবতা স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে অপরিণত অবস্থায় এই সমস্ত শক্তিমত্তা অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করা অত্যন্ত অন্যায়। অবতারগণ যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ ধরিয়া চলিলে, যখন উপযুক্ত সময় আসিবে, তখন এই শক্তি স্বতঃই স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিবে। তিনি বলিতেছেন:—

"এই জগতে থাকিয়া আত্মিক শক্তিসমূহে হস্তক্ষেপ করিলে, অপর জগতে আত্মার অবস্থা সংঘৃষ্ট হয়। এই সকল শক্তি প্রকৃত হইলেও সাধারণতঃ এই জগতে কার্য্য-তৎপর নহে। মাতৃগর্ভে শিশুর

চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদাদি, সমস্তই থাকে, কিন্তু সেখানে তাহা কার্য্য-তৎপর থাকে না। পার্থিব জগতে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বাস্তব জগতে প্রবেশ-অধিকার লাভ করা; সেই জগতে এই সমস্ত শক্তি কার্য্যতৎপর হইবে, তাহা সেই জগতেরই এলেকাভুক্ত।" —(মিস্ বাক্‌টনের স্মারক-লিপি হইতে, আব্‌দুল্‌বাহা দ্বিতীয়বার যাহার সমালোচনা করিয়াছেন)

মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মার সহিত ভাব-বিনিময় বিনা প্রয়োজনে কোনো অলস ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করিবার মানসে করা উচিত নহে। কিন্তু যবনিকার অন্তরালে যাঁহারা অবস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের জন্য যবনিকার অপর দিকে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের প্রার্থনা করা একান্ত প্রয়োজন; তাঁহাদিগকে ভালবাসা, তাঁহাদিগকে সাহায্য করা একদিক দিয়া যেমন গুরুতর কর্ত্তব্য, অপর দিক দিয়া তেমনই গৌরবময় সুযোগ। মৃত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করা বাহাইদিগের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আব্‌দুল্‌বাহা মিস্ ই, জে, রোজেন্‌বার্গের সঙ্গে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে, আলাপ-প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ—

"অপরের জন্য সানুনয় প্রার্থনা বলে ফল প্রদান করিবার পুণ্য-শক্তি ঈশ্বরের অবতার ও সিদ্ধপুরুষগণের বৈশিষ্ট্য। যীশুখৃষ্ট পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াই তাঁহার শত্রুগণের মার্জ্জনার জন্য ঐরূপ প্রার্থনা করিবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এখনও তাঁহার সেই শক্তি রহিয়াছে। 'ঈশ্বর তাহাকে ক্ষমা করুক' বা তদনুরূপ বাক্য না বলিয়া, আব্‌দুল্‌বাহা কখনও কোনো মৃত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করিতেন না। অবতারগণের অনুগামীদিগেরও সে একইরূপ প্রার্থনা করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং, আমাদের এরূপ মনে করা অন্যায় হইবে যে, কোনো আত্মা ঈশ্বরকে জানিতে পারে নাই বলিয়া ইহাকে চিরস্থায়ী দুঃখ-যন্ত্রণায়

ও সর্ব্বস্বান্তের নিশ্চল অবস্থায় দণ্ডিত হইয়াই থাকিতে হইবে; তাহার জন্য সানুনয় প্রার্থনা বলে ইষ্টফল লাভ করিবার পুণ্যশক্তি সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

"ধনাঢ্য ব্যক্তি এ জগতে যেমন নির্ধনকে সাহায্য করিতে পারে, তদ্রূপ অপর জগতেও সাহায্য করিতে সক্ষম। সকলেই সকল জগতে ঈশ্বরের সৃষ্টি; ঈশ্বরই সকলের সহায়, সম্বল। তাহারা নিয়ত ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল; কখনও স্বাবলম্বী বা স্বাধীন নহে, সেরূপ কখনও হইতেও পারে না। যখন সকলে ঈশ্বরের নিকট ভিক্ষার্থী, তাহারা যতই যাচ্ঞা করিবে, ততই ধনাঢ্য হইবে। তাহাদের ঐশ্বর্য্য, তাহাদের পণ্যদ্রব্য কি? অপর জগতে তাহাদের সহায় সম্বল কি? সানুনয় প্রার্থনা বলে ইষ্টফল লাভ করিবার ইহা সেই পুণ্যশক্তি! অপরিণত আত্মাগণ আধ্যাত্মিক ধনাঢ্য-ব্যক্তির কাতর প্রার্থনা বলে প্রথমতঃ উন্নতিলাভ করিতে থাকে, তৎপর আপন প্রার্থনাবলে উন্নতি করে।"

পুনরায় তিনি বলিয়াছেন:—

"যাহারা স্বর্গারোহণ করিয়াছে তাহাদের বিশেষত্ব, যাহারা এখনও ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে তাহাদের বিশেষত্ব হইতে বিভিন্ন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনো প্রকৃত প্রভেদ নাই; প্রার্থনা সম্বন্ধে উভয়ের একই অবস্থা। সুতরাং তোমরা তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিবে, তাহারা যেমন তোমাদের জন্য প্রার্থনা করিতেছে।"—(লণ্ডনে আব্দুল্‌বাহা, পৃঃ ৯৭)

আব্দুল্‌বাহাকে কোনো এক উপলক্ষ্যে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে যাহারা এই নব ধর্ম্মের মহান্ বাণী শ্রবণ না করিয়াই লোকান্তরিত হইয়াছে, প্রার্থনা দ্বারা অহা তাহাদের গোচরীভূত করা সম্ভব কি না। তিনি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন:—

"হাঁ, নিশ্চয়ই! একান্ত মনে প্রার্থনা করিলে তাহার প্রভাব

পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, বিশেষ করিয়া অমর্ত্ত্য-জগতে তাঁহার প্রভাব বিশেষ কার্য্যকর হইয়া থাকে। অমর্ত্ত্য-জগতে যাহারা অবস্থান করে, তাহাদের হইতে আমরা কখনও ছিন্ন নহি। প্রকৃত ও সত্য ফল-সিদ্ধি এই জগতে হয় না, কিন্তু সেই অপর জগতে।”—(মেরী হেন্‌ফোর্ড ফোর্ড’এর স্মারক-লিপি, প্যারিস, ১৯১১)

বাহাউল্লা’ বলিতেছেন ঃ—

“যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে জীবন-যাপন করে, স্বর্গীয় জনমণ্ডলী এবং যাহারা অত্যুচ্চ স্বর্গে মহত্বের অট্টালিকায় বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই সেই একান্ত প্রিয়পাত্র, সুন্দর পুরুষ ঈশ্বরের সকাশে তাহার জন্য প্রার্থনা নিবেদন করিতে থাকে।”—(আলী কুলী খাঁ কর্ত্তৃক অনুদিত)

আর এক উপলক্ষ্যে আব্‌দুল্‌বাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, অনেক সময় যে দেখা যায়, হৃদয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া মৃত বন্ধুদের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি। তিনি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন ঃ—

“ঈশ্বরের সৃষ্টির একটি নিয়ম এই যে দুর্ব্বল বলবত্তরের উপর সাহায্যের জন্য নির্ভর করিয়া থাকে। যাহাদের দিকে তোমরা আকৃষ্ট হইয়া থাক, তাহারা হয়ত ঈশ্বর এবং তোমাদিগের মধ্যে মধ্যস্থ বিশেষ, তাহারা ঈশ্বরের শক্তি তোমাদের নিকটে বহন করিয়া আনিয়া থাকে; পৃথিবীতে বাসকালে যেমন ছিল, এখানেও তাহাই, উভয়ের মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম নাই। পবিত্র পরমাত্মার পুণ্য শক্তিই সমস্ত মানবকুলকে শক্তিমান্ করিতেছে।”—(লণ্ডনে আব্‌দুল্‌বাহা, পৃঃ ৯৭)

অকল্যাণের অনস্তিত্ব

বাহাই দর্শনের যুক্তি অনুসারে একটি সিদ্ধান্ত এই যে পরিপূর্ণ অকল্যাণ বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না, কারণ ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। অনন্ত, অনাদি পুরুষ "একমেবাদ্বিতীয়ম", সেই কারণে অবিমিশ্র অমঙ্গলের অস্তিত্ব অসম্ভব। বিশ্ব-নিয়মে ঈশ্বরের শক্তির বিরোধী বা বহির্ভূত কোনো শক্তি থাকিলে ঈশ্বর "একমেবাদ্বিতীয়ম" হইতে পারিতেন না। অন্ধকার যেমন আলোকের অনস্তিত্ববাচক বা যথেষ্ট পরিমাণ আলোক না থাকার নামান্তর মাত্র, সেইরূপ অমঙ্গল, মঙ্গলের অনস্তিত্বসূচক বা যথেষ্ট পরিমাণ মঙ্গল না থাকার নামান্তর মাত্র। অপরিণত, অপরিপুষ্ট, অপূর্ণ অবস্থাকেই অমঙ্গলের অবস্থা বলা হইয়া থাকে। আত্মম্ভরী ব্যক্তির আত্মম্ভরিতাও আত্মপ্রেমের নামান্তর এবং প্রেমমাত্রই যখন সুন্দর ও স্বর্গীয়, তখন আত্মপ্রেম বা আত্মরতিকেও পরিপূর্ণরূপ অকল্যাণকর মানসিক অবস্থা বলা যায় না। ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্ট প্রাণীকুলের প্রতি প্রেমপূর্ণ না হইয়া সে ব্যক্তি আত্মরতিতেই পরিতৃপ্ত, তাহার প্রেমের গণ্ডি নিজের সঙ্কীর্ণ সত্তা অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর আবেষ্টনীতে নিহিত নহে, ইহাই অকল্যাণকর। সে নিজেকে উৎকৃষ্ট পশুসদৃশ মনে করিয়া থাকে; সে নির্বোধের মত তাহার নীচ প্রবৃত্তিকে এরূপ প্রশ্রয় দিয়া থাকে, যেমন সে তাহার পোষা কুকুরকে প্রশ্রয় দান করে,—কেবল এই মাত্র পার্থক্য যে পোষা কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে যত মন্দ ফলের সৃষ্টি হয় না, তাহার ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে তাহা হইতে অনেক অধিক মন্দ ফল ফলিয়া থাকে।

আব্দুল্‌বাহা এক ফলকলিপিতে বলিতেছেন :—

"তুমি বলিয়াছ, আব্দুল্‌বাহা তাহার কোনো কোনো বন্ধুকে বলিয়াছে যে অকল্যাণের কোনো অস্তিত্ব নাই, অকল্যাণের অস্তিত্ব অসম্ভব; এই কথা সত্য, কেননা, সত্য পথ-ভ্রষ্ট হওয়া, সত্যের আলোক হইতে প্রচ্ছাদিত হইয়া থাকা মানুষের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান পরিপূর্ণ অকল্যাণ; পথ-নির্দ্দেশের অভাবই ভ্রান্তি, আলোকের অভাবই অন্ধকার, জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞানতা, সত্যের অসদ্ভাবেই অসত্য, দৃষ্টিশক্তির অভাবকেই অন্ধতা বলে, শ্রবণশক্তির অক্ষমতাই বধিরতা। সুতরাং ভ্রান্তি, অন্ধকার, অজ্ঞানতা, অসত্য, অন্ধতা, বধিরতা সমস্তই নেতিবাচক শব্দ, অর্থাৎ অনস্তিত্বসূচক।"

তিনি অপর একস্থানে বলিয়াছেন :—

"সৃষ্টিতে অকল্যাণ নাই; সমস্তই কল্যাণময়। কোনো কোনো ব্যক্তির কোনো কোনো স্বাভাবিক গুণ বা শক্তি বাহ্যতঃ নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা সেরূপ নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে,—একটি দুগ্ধপায়ী শিশুর মধ্যে তাহার লোভ, ক্রোধ, আসক্তির লক্ষণসমূহ তাহার জীবনের প্রথম হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, ইহা বলা যাইতে পারা যায়, মানুষের ভালমন্দ তাহার সৃষ্টিতে রহিয়াছে এবং প্রকৃতি বা সৃষ্টির পরিপূর্ণ কল্যাণত্ব ইহার দ্বারা অপ্রমাণিত হয়। ইহার উত্তর এই যে, অধিক কিছু পাইবার যে ইচ্ছা, তাহা যদি উচিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, তাহা প্রশংসার্হ। যদি কোনো ব্যক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে অভিলাষী হয়, অথবা সে যদি দয়ালু, উদার ও ন্যায়পরায়ণ হইতে ইচ্ছা করে, ইহা একটি প্রশংসার যোগ্য বিশিষ্ট গুণ, আর সে যদি বন্য, হিংস্র জন্তুর ন্যায় রক্তলোলুপ উৎপীড়কদিগের বিরুদ্ধে তাহার ক্রোধ-

বহ্নি প্রজ্বালিত করে, তাহাও প্রশংসনীয়; কিন্তু সে যদি এই সমস্ত গুণাবলী উচিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না করে, তা'হইলে তাহা দোষাবহ ও নিন্দনীয়। * * * মানবের সর্ব্বপ্রকার স্বাভাবিক গুণের এই একই নিয়ম, যাহা মানব-জীবনের অত্যাবশ্যক উপাদান। যদি মানবের স্বাভাবিক গুণ বিধি-বিরুদ্ধ পথে প্রযুক্ত কি পরিচালিত হয়, তা'হইলে তাহা দোষার্হ ও নিন্দিতব্য। সুতরাং, ইহা প্রমাণিত হইল যে সৃষ্টিতে অকল্যাণ নাই, সমস্তই কল্যাণময়।"—(কতিপয় প্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ২৫০)

জীবনের অনস্তিত্বকেই অকল্যাণ বলা হইয়া থাকে। মানব-স্বভাবের নিকৃষ্ট দিক অসঙ্গতভাবে বর্দ্ধিত হইলে, সেই দিকটার শক্তি হ্রাস করা তাহার উচিত প্রতিকার নহে, বরং উৎকৃষ্ট দিকটার শক্তি বাড়ানই কর্ত্তব্য, যেন উভয় দিক সমতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেনঃ—"তোমরা যাহাতে জীবন-পথের সন্ধান পাও, যাহাতে তোমরা পরিপূর্ণতর, সমৃদ্ধতর জীবন পাইতে পার, সেই পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্যই আমি সমাগত হইয়াছি।" ইহা জীবন,—যাহা আমাদের সকলেরই প্রয়োজন, পরিপূর্ণতর সমৃদ্ধতর জীবন, যাহা বাস্তবিকই জীবন। বাহাউল্লা'র বাণী যীশুখৃষ্টের বাণী হইতে অভিন্ন। তিনি বলিয়াছেনঃ—

"পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্তই এই ভৃত্য অদ্য সমাগত হইয়াছে।"—("রই'স"এর ফলকলিপি)

এবং তাঁহার অনুগামীদিগকে তিনি বলিতেছেনঃ—

"জগৎবাসীদিগকে সঞ্জীবিত করিবার শক্তি আমি তোমাদিগকে দিব; তোমরা আমার নিকটে আসিয়া তাহা গ্রহণ কর।"—(পোপের ফলকলিপি)

দ্বাদশ অধ্যায়

ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান

"মোহাম্মদের জামাতা হজরত আলী বলিয়াছিলেন:—'বিজ্ঞানের সহিত সঙ্গতি যাহার আছে, বুঝিতে হইবে যে ধর্ম্মের সহিতও তাহার সঙ্গতি আছে'। মানবের বোধশক্তি দ্বারা যাহা বোধগম্য হয় না, ধর্ম্মের দিক হইতেও তাহা অঙ্গীকার করা উচিত নহে। ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান, যুগ্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চলিবে; বিজ্ঞানের পরিপন্থী ধর্ম্ম কখনও সত্য হইতে পারে না।"—(প্যারিসে কথাবার্ত্তা, আব্দুল্‌বাহা)

ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানে বিরোধিতার মূল কারণ ভ্রান্তি

বাহাউল্লা'র প্রচারিত একটি ভিত্তীভূত নীতি এই: প্রকৃত বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃত ধর্ম্মের ঐক্য ও সহযোগিতা থাকিবে। সত্য-বস্তু এক, অভিন্ন; সুতরাং যেখানেই উভয়ের মধ্যে বিসংবাদ উপস্থিত হয়, বুঝিতে হইবে, তাহার কারণ, সত্য-পথ হইতে বিচ্যুত হওয়া এবং ভ্রান্তি। অতীত যুগে তথাকথিত বিজ্ঞানের সঙ্গে তথাকথিত ধর্ম্মের ঘোরতর বিরোধ চলিয়াছে বটে; কিন্তু বর্ত্তমান যুগের পরিপূর্ণতর সত্যের আলোকে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, সেই সমস্ত সংগ্রামের মূল কারণ অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি, অসহিষ্ণুতা, ইত্যাদি। ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের

নিগূঢ়তম তথ্য এক, সুতরাং যাহা ধর্ম্মের বিরোধী, তাহা বিজ্ঞানেরও বিরোধী, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। মহামনস্বী হাক্‌স্‌লী বলিয়াছেন :—

"দার্শনিকগণ যে সমস্ত বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহার কারণ মুখ্যতঃ এই, যে তাঁহারা তাঁহাদের মস্তিষ্ক প্রগাঢ়-ধর্ম্ম-ভাবে প্রযুক্ত ও পরিচালিত করিয়াছেন; মাত্র মস্তিষ্কের প্রভাব নিতান্ত গৌণ। সত্যানুসন্ধানে তাঁহারা সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কুশাগ্রধীত্ব ও ন্যায়ানুমোদিত যুক্তির সাহায্যে ততটা নহে, যতটা তাহা নির্ভর করিয়াছে, তাঁহাদের ধৈর্য্য, জ্ঞানচর্চ্চার প্রতি ভালবাসা, একাগ্রতা ও আত্মরতি হইতে নিবৃত্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর উপর।"

গণিত শাস্ত্রে বিশারদ বুল স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

"জ্যামিতির সিদ্ধান্ত মূলতঃ প্রার্থনার একটি সুনির্দ্দিষ্ট বিধি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সসীম মানব-মন অসীমের নিকটে আলোক যাচ্‌ঞা করে, সসীম কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য, ইহাই জ্যামিতিক সিদ্ধান্তের স্বরূপ।"

ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের মহাপ্রভুগণ কখনও পরস্পরকে নিন্দা করেন নাই। কিন্তু এই সমস্ত বিশ্ব-শিক্ষকগণের অনুপযুক্ত অনুগামীগণ, যাহারা তাঁহাদের উপদেশবাণীর তাৎপর্য্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইয়া কেবলমাত্র বাক্য উচ্চারণেই নিরত থাকিত, তাহারাই পরবর্ত্তী মহাপ্রভুগণের উৎপীড়ক ও প্রগতির ঘোরতর শত্রু হইয়াছে। তাহারা কোনো একটি বিশেষ ধর্ম্মের বাণী যাহাকে তাহারা পবিত্র মনে করে, তাহা পাঠ করিয়া থাকে এবং আপন সঙ্কীর্ণ ধারণা অনুযায়ী তাহার সৌন্দর্য্য ও বিশেষত্ব বুঝিয়া লয় এবং তাহাকেই প্রকৃতধর্ম্মের একমাত্র আলোক বলিয়া বিবেচনা করে। ঈশ্বর যখন তাঁহার অপার করুণাবশে তদপেক্ষা বৃহত্তর আলোক ভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন এবং যখন এক

নূতন মশালধারীর হস্তে তাঁহার অনুপ্রাণনার মশাল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রোজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে, তখন তাহারা এই নব আলোককে অভ্যর্থনা করিয়া সেই সর্ব্বালোকের আধার ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্ত্তে ক্রুদ্ধ, সন্ত্রস্ত ও ভীত হইয়া পড়ে। এই নব-আলোক তাহাদের খেয়াল অনুযায়ী হয় না। ইহাতে কোনো গোঁড়ামি রং থাকে না, তাহাদের অনুমিত দেশেও ইহা দেদীপ্যমান্ হয় না। এই কারণে, তাহারা প্রাণপণে এই নব-আলোককে নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করে, পাছে তাহাদের কল্পিত ধর্ম্ম-পথ হইতে জনসাধারণ বিচ্যুত হইয়া অধর্ম্ম-পথে পরিচালিত হয়। অবতারগণের অধিকাংশ শত্রুই এই ধরণের,—তাহারাই অন্ধজনের অন্ধ-পরিচালকগণ, তাহারা আপন কল্পিত সত্যের স্বার্থরক্ষার্থে নূতন ও পূর্ণতর সত্যের ঘোরতর বিরোধী। অপরগুলি আরও নীচ ধরণের, তাহারা সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আত্মস্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়, অথবা তাহাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু বা জড়তার দরুণ প্রগতির পথ রুদ্ধ করিতে থাকে।

ঈশ্বরের অবতার ও মহামানবগণের প্রতি অত্যাচার

অবতারগণ তাঁহাদের আবির্ভাব সময়ে জনসাধারণ কর্ত্তৃক উপহসিত ও উপেক্ষিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা ও তাঁহাদের প্রথম শিষ্যগণ অত্যাচারীর হস্তে কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরের পথে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার ধন-সম্পত্তি, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। আমাদের বর্ত্তমান যুগেও তদ্রূপ ঘটিয়াছে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত পারস্য দেশে বহু সহস্র বা'বী এবং

বাহাই তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্য কঠোর মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে এবং তদোধিক সংখ্যায় কারাবরোধ, দেশান্তর, দারিদ্র্য, অপমান ভোগ করিয়াছে। প্রত্যেক ' পরবর্ত্তী ধর্ম্ম তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা অধিক পরিমাণে "রক্ত দ্বারা অভিষিক্ত" হইয়াছে, এবং ধর্ম্মমতের জন্য জীবন-বিসর্জ্জন বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিক মহা-জ্ঞানবগণের ভাগ্যেও এই একই অবস্থা ঘটিয়াছিল। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, এই এবং অন্যান্য তথ্য প্রচারিত করিবার অপরাধে জিওর্দেনো ব্রুনো ১৬০০ খৃষ্টাব্দে অপধার্ম্মিক, অবিশ্বাসী বলিয়া যূপবদ্ধভাবে দগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে, প্রধান দার্শনিক গ্যালিলিও নতজানু হইয়া বৈজ্ঞানিক অঙ্গীকারগুলি প্রত্যাহার করিয়া কোনো প্রকারে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে ডারউইন ও বর্ত্তমান ভূতত্ত্বের পূর্ব্বাচার্য্যগণ ভীষণ, নিষ্ঠুরভাবে ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন, এই কারণে যে বাইবেলে বর্ণিত ছয়দিনে পৃথিবী সৃষ্টি, কিঞ্চিন্নূন ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, এই উপাখ্যানের পরিপন্থী একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ, তাঁহারা প্রচারিত করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক নব-মতবাদের বিরুদ্ধে কেবল যে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি দাঁড়াইয়াছিল, তাহা নহে, বিজ্ঞানের গোঁড়া বিশ্বাসীগণ ঠিক গোঁড়া ধার্ম্মিকের মত উন্নতির পরিপন্থী ছিল। কলম্বাস্ তাঁহার সমসাময়িক যুগের বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়াছিলেন। তাহারা নিজেদের পরিতৃপ্তির জন্য প্রমাণ করিতে ছিল যে, যদি জাহাজ ভূমণ্ডল হইতে ভিন্ন দিকে উপনীত হইতে পারিত, তাহা হইলে ইহার পক্ষে পুনরায় ফিরিয়া আসা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত। বর্ত্তমান বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের উদ্ভাবয়িতা মহামতি গ্যালভানিকে তাঁহার সহকর্ম্মী পণ্ডিতগণ উপহাস করিত ও তাহারা তাঁহার নাম রাখিয়াছিল "দর্দ্দুরের নৃত্য-শিক্ষক"। রক্ত-চলাচল

সম্বন্ধে আবিষ্কারের জন্য প্রসিদ্ধ হার্ভী অত্যাচারিত, নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সহকর্ম্মীগণ তাঁহাকে অবজ্ঞাভাজন মনে করিত ও পরিশেষে তাঁহার অধ্যাপকত্ব পদ হইতে তিনি বিতাড়িত হইয়াছিলেন। যখন ষ্টিফেন্‌সন্ বাষ্পীয় লৌহ-শকট আবিষ্কার করিলেন, তখন সমসাময়িক য়ুরোপীয় গণিত শাস্ত্রবিৎগণ চক্ষু মেলিয়া কি ঘটিতেছিল, তাহা লক্ষ্য না করিয়া, বাস্তবের দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া নিজেদের পরিতৃপ্তির জন্য প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে মসৃণ "রেইল" এর উপর দিয়া গাড়ী চলিতে পারে না, গাড়ীর চাকা ফস্‌কাইয়া যাইবে, গাড়ী ভার বহন করিয়া, একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইতে পারিবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। একান্ত আধুনিক যুগেও, আচার্য্য জামেন্‌হফ্ তাঁহার প্রসিদ্ধ "এস্‌পেরাণ্টো" বা আন্তর্জাতিক ভাষা আবিষ্কার করিয়া প্রথমে পুরস্কারস্বরূপ মাত্র উপহাস, ব্যঙ্গোক্তি ও বিরুদ্ধাচরণই পাইয়াছিলেন। ইহা আমাদের সমসাময়িক যুগের কথা, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইহার উদ্ভাবনের তারিখ; তখনও এস্‌পেরাণ্টো ভাষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে হইয়াছিল। কলম্বাস্, গ্যাল্‌ভানি, ষ্টিফেন্‌সনের বিরুদ্ধে মূর্খগণ যেমন অভিযান করিয়াছিল, এস্‌পেরাণ্টোর ন্যায় অদ্ভুত-উপযোগী আন্তর্জাতিক ভাষার বিরুদ্ধেও সেইরূপ মূর্খগণের অভিযান হইয়াছিল।

সমন্বয়ের যুগ-প্রভাত

বিগত অর্দ্ধশতাব্দী কালের মধ্যে যুগ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, মানব-মন নূতন সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, সত্য-সূর্য্য, অবতার-রবি সমুদিত হইয়াছেন, বিগত শতাব্দীর বাদ-বিতণ্ডা, কলহ, বিসম্বাদ-সমূহ এক্ষণে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়। কোথায় এখন

সেই দাম্ভিক নিরীশ্বরবাদী এবং গর্ব্বিত জড়বাদিগণ, যাহারা মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মকে পৃথিবী হইতে বিতাড়িত করিবার ভয়প্রদর্শন করিতেছিল? এখন কই ঐ সমস্ত উপদেষ্টাগণ, যাহারা আপন ধর্ম্ম-মতের বিরুদ্ধবাদিগণকে ঘৃণিত নরক-যন্ত্রণা ও নরকাগ্নিতে সমর্পণ করিতেছিল? তাহাদের কোলাহলের প্রতিধ্বনি এখনও আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু তাহাদের সময় সত্বর শেষ হইতেছে, তাহাদের মতবাদ অবিশ্বাস্য হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, যে সমস্ত বিষয় লইয়া ঘোরতর বাদ-বিতণ্ডা, বিবাদ-বিসংবাদ চলিত, তাহা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মও নহে, বিজ্ঞানও নহে। বর্ত্তমান যুগে এমন কোন্ বৈজ্ঞানিক আছেন, যিনি আত্মাসম্বন্ধীয় আধুনিক গবেষণার আলোকে এই কথা বলিতে সাহসী হইবেন যে "যকৃত যেমন পিত্ত ক্ষরণ করে, সেইরূপ মস্তিষ্ক চিন্তা ক্ষরণ করে" বা শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িলে আত্মাও জীর্ণ হইয়া পড়ে? এখন আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে মানবের চিন্তাধারা প্রকৃত স্বাধীন হইতে হইলে, তাহাকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক অপূর্ব্বরাজ্যে উড্ডয়ন শিক্ষা করিতে হইবে, মাত্র পার্থিব বিষয়ে নিবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। বর্ত্তমান সময়ে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা নিতান্ত সামান্য, এতই সামান্য যে জ্ঞাতব্য, অদ্যাপি অজ্ঞাত সত্যসমূহের সঙ্গে তুলনা করিলে, তাহা সমুদ্রের সঙ্গে তুলিত এক বারি-বিন্দুর মত। অতএব, আমরা অলৌকিক ঘটনাবলী অসম্ভব নহে, ইহা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়া থাকি; অলৌকিক ঘটনা বলিতে আমরা বুঝি এই যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি লঙ্ঘন করা হইল, তাহা নহে, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের পরিধির বহির্দ্দেশে অবস্থিত, অদ্যাপি অজ্ঞাত, সূক্ষ্মতর প্রাকৃতিক নিয়ম প্রযুক্ত হইল; যেমন বিদ্যুৎ

বা রঞ্জন-রশ্মি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকটে অজ্ঞাত ছিল, সেইরূপ আমাদের নিকটেও অজ্ঞাত অনেক বস্তু আছে; আমরা যখন সেইগুলি দেখি, তখনই মনে করিয়া থাকি, কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। বর্ত্তমান যুগে কোনো ধর্ম্মাচার্য্যই গাম্ভীর্য্য সহকারে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন না যে মুক্তিলাভ করিতে হইলে বিশ্বাস করা প্রয়োজন যে বিশ্ব-সৃষ্টি করিতে মাত্র ছয় দিন লাগিয়াছিল, বাইবেলে "এক্‌সোডাস্" অধ্যায়ে মিশরদেশে মহামারী প্লেগের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বা সূর্য্য আকাশে স্থির, নিশ্চল হইয়া থাকিল, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সহসা নিশ্চল হইল, জোশুয়াকে তাঁহার শত্রু নিধনের সুযোগ দিবার জন্য বা সন্ত অ্যাথেনে-সিয়াস্ যে মতবাদ প্রবর্ত্তিত করিলেন, তাহা সত্য বলিয়া অঙ্গীকার না করিলে মোক্ষলাভ অসম্ভব। এইরূপ বিশ্বাস সমূহ এখনও রীত্যানুযায়ী পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু কৈ সেই ব্যক্তি যে তাহাদের অবিকল অর্থে বা আপন মনোভাব গোপন না করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে? মানুষের মনের উপর এসমস্ত ধর্ম্মমতের প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং যাহা কিছু সামান্য বাকী আছে, তাহাও বিলুপ্ত হইতেছে। ধর্ম্ম-জগৎ এক কৃতজ্ঞতার ঋণ ধারিয়া থাকে, বৈজ্ঞানিক-গণের নিকটে,—যাঁহারা এই সমস্ত জীর্ণ মতবাদ ও বিশ্বাসগুলিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিন্ন করিয়াছেন এবং সত্যের নিগূঢ়তত্ত্বকে স্বাধীনভাবে অগ্রবর্ত্তী হইতে দিয়াছেন। কিন্তু, বৈজ্ঞানিকগণ আরও অধিক ভারী ঋণ ধারিয়া থাকেন, প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ ও গূঢ়তত্ত্বের অধিকারিগণের নিকটে,—যাঁহারা ভালমন্দ, সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার জীবনদায়ক শক্তিসমূহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছিলেন এবং এই অবিশ্বাসী জগতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে কেবলমাত্র পান-ভোজনের

নাম জীবন নহে এবং অ-দৃষ্ট দৃষ্ট হইতে বৃহত্তর ও মহত্তর। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও সিদ্ধপুরুষগণ উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় উদয়মান্ সূর্য্যের প্রথম রশ্মিগুলি স্বয়ং গ্রহণ করিয়া নিম্ন জগতে প্রতিবিম্বিত করিয়াছিলেন। এখন, সূর্য্য উদিত হইয়াছেন, আকাশে জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছেন, সমস্ত জগৎ তাঁহার প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাহাউল্লা'র উপদেশাবলীতে সত্যের এক প্রভাময় স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, যাহা মানবমনের সমস্ত প্রশ্নের নিরসন করিয়া হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে। বাহাউল্লা'র উপদেশানুসারে বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম, উভয়ই অভিন্ন সত্য-বস্তুর বিভিন্নরূপ মাত্র।

সত্যান্বেষণ

সত্যান্বেষণের যে প্রণালী বাহাই উপদেশাবলীতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার সহিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়। মানুষ যদি সত্যই সত্যান্বেষণের প্রত্যাশী হয়, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বপ্রকারের কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে হইবে। আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন:—

"সত্যান্বেষণ করিতে হইলে, আমাদের কুসংস্কার সমূহ, আমাদের ছোটখাট অকিঞ্চিৎকর ধারণাগুলি আমাদের পরিত্যাগ করিতে হইবে; উন্মুক্ত স্বাধীন মনোবৃত্তি একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের আধ্যাত্মিক পান-পাত্র যদি আত্মভাবে পরিপূর্ণ থাকে, তাহাতে জীবন-বারির জন্য স্থান হয় না। আমরা নিজেকে অভ্রান্ত এবং অপর সকলকে ভ্রান্ত মনে করি, ইহাই একতার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। সত্য-বস্তু পাইতে হইলে একতা একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ, সত্য-বস্তু এক ও অভিন্ন।

"কোনো এক সত্য-তথ্য অপর এক সত্য-তথ্যকে অগ্রাহ্য করে না। আলোক যে কোনো প্রদীপে জ্বলুক না কেন, তাহা কল্যাণকর; পুষ্প যে কোনো উদ্যানে বিকশিত হউক না কেন, তাহা অতি মনোহর ও সুন্দর। একটি নক্ষত্র পূর্ব্ব-পশ্চিমে যে কোনো দিকে উদিত হউক না কেন, তাহার ঔজ্জ্বল্য একই থাকে। তোমরা কুসংস্কার পরিত্যাগ করিবে; সত্য-সূর্য্যের প্রেমিক হইবে, নভোমণ্ডলের যে কোনো দিকে তাহা উদিত হউক না কেন। তোমরা উপলব্ধি করিবে, যদি সত্যের স্বর্গীয় আলোক যীশুখৃষ্টে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইলে উহা হজরত মুসা এবং বুদ্ধদেবেও দীপ্তিমান্ হইয়াছিল; ইহাই সত্যান্বেষণের তাৎপর্য্য।

"সত্যান্বেষণের তাৎপর্য্য আরও এই যে, আমরা এযাবৎ যাহা কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সমস্তই আমাদের অন্তর হইতে অপসারিত করিতে হইবে, কেননা, সত্যের পথে তাহা আমাদের অগ্রগতির পরিপন্থী। যদি আবশ্যক হয়, পুনরায় আমরা আমাদের শিক্ষা আরম্ভ করিব, কখনও পশ্চাদপদ হইব না। কোনো বিশেষ ধর্ম্মের প্রতি আমাদের আসক্তি, কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আমাদের অনুরক্তি আমাদিগকে যেন এতদূর অন্ধ করিয়া না ফেলে, যাহার কারণে কুসংস্কারের বন্ধনে আমাদের আবদ্ধ হইয়া পড়া সম্ভব। যখন আমরা এই সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইব, তখনই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছিতে পারিব।"—(প্যারিসে কথাবর্ত্তা, পৃঃ ১২৬)

ঈশিত্বের তাৎপর্য্য

ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করা মানব-মনের পক্ষে একান্ত অসম্ভব, এই বাহাই উপদেশের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক

মতের অদ্ভুত ঐক্য বিদ্যমান্। হাক্স্‌লি এবং স্পেন্সার যেরূপ বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন যে সর্ব্বকারণের আদি-কারণ অজ্ঞেয়, সেইরূপ বাহাউল্লা'ও বলেন যে "ঈশ্বর সর্ব্ববিশ্ব-রহস্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার মহিমার উপলব্ধি সসীম মানব-শক্তির অতীত"। ঈশ্বরোপ-লব্ধির "পথ চিররুদ্ধ, রাস্তা অনতিক্রম্য"। সসীম কেমন করিয়া অসীমের উপলব্ধি লাভ করিবে? একটি বারি-বিন্দু কেমন করিয়া সমগ্র সাগরকে ধারণ করিবে? সূর্য্য-রশ্মিতে নৃত্য-পরায়ণ সামান্য ধূলিকণা কেমন করিয়া সমগ্র বিশ্বের সমগ্রত্বের অনুভূতি লাভ করিবে? অথচ, সমগ্র বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতেই ঈশ্বরের মহিমময় কীর্ত্তি উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। প্রত্যেক বারি-বিন্দুতে অসীম তাৎপর্য্য, অসীম রহস্য নিহিত রহিয়াছে, সমগ্র বিশ্ব-রহস্য প্রতি ধূলী-কণাতে লুক্কায়িত রহিয়াছে, অতি সুনিপুণ বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে। রসায়ণবিৎ ও পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত অণু-পরমাণুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে অশেষ প্রচেষ্টা সহকারে নানা স্তর অতিক্রম করিয়া অনুসন্ধান-পথে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন; পিণ্ড হইতে "মোলিকিউল", "মোলিকিউল" হইতে অণু, অণু হইতে "ইলেক্‌ট্রন" এবং "ঈথার", কিন্তু পরিশেষে চিররহস্যময় অজ্ঞেয়তার সম্মুখীন হইয়া তাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন, সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী মস্তিষ্কও নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়; অজ্ঞেয় অসীমতার সমক্ষে গভীর বিস্ময় এবং শ্রদ্ধায় তাহা আনমিত হয়।

ফুটেছিলে ফুল তুমি প্রাচীর ফাটলে,
স্বহস্তে লইনু আমি তোমায় সমূলে,
হেরিনু তোমার শ্রী, শোভা চমৎকার,
নারিনু রহস্য কিন্তু বুঝিতে তোমার।
ওহে সুকুমার ফুল, বলে দেও মোরে,

কোথা হ'তে এলে তথা, কোথা যাবে ফিরে;
তা'হ'লে হয়ত,— ঈশ্বর-মানব-তত্ত্ব
খুলে যাবে নিরন্তর আমার অন্তরে॥ — (টেনিসন্)

যদি ভগ্ন-প্রাচীর-সংলগ্ন কুসুম কি জড়বস্তুর একটি সামান্য পরমাণু এমন এক প্রহেলিকা উপস্থিত করিতে পারে, যাহা অতি শক্তিশালী মস্তিষ্কও সমাধান করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে, মানবের পক্ষে সমগ্র বিশ্বের উপলব্ধি কতই না অসম্ভব। সুতরাং, ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বিদ্বান্ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সকল কল্পনা মূর্খতাব্যঞ্জক, তাহা অসার বোধে পরিত্যক্ত হয়।

ঈশ্বরের স্বরূপের উপলব্ধি

যদিও ঈশ্বরের স্বরূপ বোধগম্য নহে, কিন্তু তাঁহার করুণার প্রকাশ সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট। যদিও সর্ব্বকারণের আদি-কারণ উপলব্ধির অতীত, কিন্তু সৃষ্টি-জগতে তাঁহার নিদর্শন বিলক্ষণ বিদ্যমান্। যেমন একটি চিত্রের জ্ঞান চিত্রের বিচারকব্যক্তিকে চিত্রকরের প্রকৃত জ্ঞান দান করে, তেমনি সৃষ্টির যে কোনো দৃশ্যের জ্ঞান, অর্থাৎ জড় প্রকৃতি কি মানব প্রকৃতির, দৃশ্য কি অদৃশ্য সর্ব্ব-বস্তুর জ্ঞানই ঈশ্বরের সৃষ্টি-নৈপুণ্যের জ্ঞান,— যাহা স্বর্গীয় সত্যের অনুসন্ধানীকে ঈশ্বরের মহিমার যথার্থ জ্ঞান দান করে।

"নভোমণ্ডল ঈশ্বরের অপার মহিমা ঘোষণা করিতেছে; সৃষ্টি-জগৎ তাঁহার সৃষ্টি নৈপুণ্যের সাক্ষী দিতেছে: দিনের পর দিন বাণী উচ্চারণ করিতেছে; রাত্রির পর রাত্রি জ্ঞান-বিজ্ঞান দিতেছে।"—(জবুর, ১৯)

ঈশ্বরের প্রকাশগণ

সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী সর্ব্বপ্রকার জড়পদার্থ যেমন সূর্য্যের আলোক অল্পাধিক পরিমাণে প্রকাশ করিয়া থাকে, তেমনি সকল বস্তুই অল্পাধিক পরিমাণে ঈশ্বরের দান প্রকাশ করে। একটি ধূম-কুণ্ডলীতে সূর্য্য-রশ্মি অতি অল্পমাত্রায় প্রকাশ পাইয়া থাকে, একটি প্রস্তর-খণ্ডে তদপেক্ষা অধিক, এক টুক্‌রা ফুল-খড়ীতে আরও অধিক, কিন্তু এই সমস্তের কোনোটিতেই আমরা সেই জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলের আকার কি বর্ণের কোনো বিশেষ সন্ধানই পাইতে পারি না। কিন্তু একটি নির্ম্মল দর্পণে সূর্য্যের আকার ও বর্ণের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং, দর্পণ দর্শন করিলে আমাদের সূর্য্য-দর্শন লাভ হয়। এমতে প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বরের গুণাবলী সম্বন্ধে আমাদিগকে বলিয়া দে'। প্রস্তর-খণ্ড সামান্য কিছু জ্ঞাপন করিতে পারে, একটি পুষ্প তাহা হইতে অধিক, একটি জন্তু তাহার বিস্ময়কর অনুভবশক্তি, বোধশক্তি, সঞ্চরণশক্তি সহকারে তাহা হইতেও অধিক। অতি সাধারণ মানবের মধ্যে আমরা অতি বিস্ময়কর শক্তি দেখিতে পাই, যাহা আমাদিগকে এক অপরূপ সৃষ্টি-কর্ত্তার সন্ধান বলিয়া দে'। কবি, সিদ্ধপুরুষ, প্রতিভা-দীপ্ত মনস্বীগণের মধ্যে আমরা আরও উচ্চতর প্রকাশ দেখিতে পাই, কিন্তু মহান্ অবতার ও ধর্ম্ম-সংস্থাপকগণই অতি পরিপূর্ণ দর্পণ, তাঁহাদের মধ্যস্থতায় সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রেম সর্ব্বমানবকুলে প্রতিফলিত হয়। সাধারণ মানবের দর্পণ স্বার্থপরতা ও কুসংস্কারের ধূলারাশিতে পরিপূর্ণ থাকে; কিন্তু, অবতার-গণের দর্পণ নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিবেদিত জীবন হইয়া পৃথিবীতে অবস্থান করেন। এই কারণে তাঁহারা সমগ্র মানবকুলের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষক ও অভিভাবক। তাঁহাদের মধ্যস্থতায়

ঈশ্বরের বাণী ও পরমাত্মার শক্তি মানবসমাজে পৌছিয়া থাকে; তাঁহারাই মানবজাতির উন্নতির কারণ, কেননা ঈশ্বর মানুষের দ্বারাই মানুষকে সাহায্য করেন। জীবনের উচ্চস্তরে অবস্থিত প্রত্যেক আত্মাই নিম্নস্তরে অবস্থিত প্রত্যেকের সাহায্যের উপায়স্বরূপ; যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করেন, তাঁহারা সমগ্র মানবকুলেরই সহায়ক। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সমগ্র মানবকুল যেন এক বিজড়নশীল সূত্রে পরস্পর সংযোগযুক্ত। তাহাদের মধ্যে কেহ যদি উচ্চস্তরে উন্নীত হয়, সূত্রগুলি কসিতে থাকে ও তাহার পূর্ব্ব-সহচরগণ তাহাকে নিম্নদিকে টানিতে আরম্ভ করে। কিন্তু, সেও সমান শক্তি সহকারে তাহাদিগকে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করে। যতই সে অধিকতর উচ্চ হইতে থাকে, ততই নিম্ন জগতের অধিক বোঝা উপলব্ধি করে — যাহা তাহাকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করে, এবং সেও তৎপরিমাণে ঈশ্বরের সাহায্যের উপর অধিক নির্ভরশীল হয়— যাহা উচ্চস্তরে অবস্থিত আত্মার মধ্যস্থতায় সে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহান্ অবতার ও ত্রাণকর্ত্তাগণ সর্ব্বোচ্চ স্তরে অবস্থিতি করেন,— তাঁহারাই ঈশ্বরের প্রকাশ, অর্থাৎ তাঁহারাই সেই পূর্ণমানবগণ যাঁহারা আপন যুগে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় ছিলেন এবং একমাত্র ঈশ্বরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই সমগ্র পৃথিবীর ভার বহন করিয়াছিলেন। "তাঁহার উপরে আমাদের পাপের বোঝা ছিল" এই কথা তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য খাটে। তাঁহাদের প্রত্যেকেই আপন অনুগামীদের জন্য "সত্য, পথ এবং জীবন"এর উপায় স্বরূপ ছিলেন এবং প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য ঈশ্বরের করুণার প্রবাহ স্বরূপ। তাঁহারা, মানবের উন্নতি-কল্পে ঈশ্বরের বিরাট-ব্যবস্থা-কার্য্যে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন।

বিশ্ব-সৃষ্টি

বাহাউল্লা'র উপদেশ অনুসারে, বিশ্ব অনাদি, অনন্তকাল মধ্যে তাহার সৃষ্টি-রহস্য পরিব্যাপ্ত। সর্ব্বকারণের আদি-কারণ হইতে শাশ্বত কাল ধরিয়া বিশ্বের উন্মেষ হইতেছে। সৃষ্টি-কর্ত্তার সকল সময়েই সৃষ্টি ছিল এবং সর্ব্বকালে থাকিবে। বিভিন্ন গোলক এবং তাহাদের শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা কৃত ও বিকৃত হইতে পারে, কিন্তু সৃষ্টি-জগৎ থাকিয়া যাইবে। উপাদান সংযোগে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই লয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহার অর্থ, পদার্থগুলি তাহার গঠনোপাদানে পরিণত হয় মাত্র। একটি গোলক কি একটি "ডেজি"র, একটি পুষ্প কি একটি মানব-দেহের সৃষ্টি-তাৎপর্য্য অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে সমাগত হওয়া নহে, বরং বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি সংযোগিত হওয়া বা অদৃশ্য-বস্তু দৃশ্যমান্ হওয়া। কালক্রমে এই সমস্ত উপাদান পুনরায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে, আকৃতি বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কিছুই নষ্ট বা ধ্বংস হইবে না; পুরাতনের ধ্বংস-স্তূপ হইতে নিত্য-নূতন সংযোগ-বিয়োগ দ্বারা নিত্য-নূতন বস্তু সৃষ্ট হইতেছে। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবী-সৃষ্টির কাল অনুমান করেন, কোটি-কোটি-বর্ষ-ব্যাপী, মাত্র ছয়সহস্রবর্ষব্যাপী নহে, বাহাউল্লা'র উপদেশাবলী তাঁহাদের মতবাদ সমর্থন করে। ক্রম-বিবর্ত্তনবাদ নামক যে মতবাদ পৃথিবীতে বিখ্যাত, তাহাতে সৃষ্টি-শক্তি অস্বীকৃত হয় নাই। তাহাতে মাত্র বিকাশ-পদ্ধতি, সৃষ্টির প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে; পদার্থ-বিজ্ঞানবিৎ, ভূতত্ত্ববিৎ, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শী মনস্বীগণ ও জৈব বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ মনীষী ব্যক্তিগণ পৃথিবী-সৃষ্টির সম্বন্ধে সে সমস্ত অতীব বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের জ্ঞান-বৃদ্ধি করিতেছেন, য়িহুদীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত পৃথিবী-সৃষ্টির

নিরাভরণ কাহিনী অপেক্ষা তাহাতেই আমাদের অধিকতর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। বাইবেলের "জেনেসিস্" নামক অধ্যায়ে যে কাহিনী আছে, তাহাতে মাত্র সহজ রূপকের সাহায্যে পৃথিবী-সৃষ্টির মর্ম্মগত আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য অতি অনায়াসে বিবৃত হইয়াছে, যেমন একজন শ্রেষ্ঠ-চিত্রকর তাহার তুলিকার স্বল্প-ঘর্ষনে এমন এক বিশেষভাব স্থাপন করে, যাহা একজন অনভিজ্ঞ, শ্রমশীল ব্যক্তি সবিশেষ যত্নসহকারে তাহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াও সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হয়। পার্থিব, জড়বিজ্ঞানের তথ্যগুলির দ্বারা যদি আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া যায়, যদি আমরা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হই, তাহা হইলে এই তথ্যগুলির দিকে দৃষ্টিপাত না করাই কল্যাণকর, কিন্তু যদি আমরা একবার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্যটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তাহা হইলে জড়বিজ্ঞানের তথ্যরাশির সাহায্যে আমরা আমাদের জ্ঞান ও কল্পনাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিতে সমর্থ হইব। তখন মাত্র একটি খসড়াতেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে না, তখন আমরা একটি পরিপূর্ণ সৌষ্ঠবশ্রীভূষিত চিত্র পাইতে পারিব। আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন :—

"জানিয়া রাখ,—একটি জটিল আধ্যাত্মিক তথ্য এই যে, এই অস্তিত্ব-জগৎ অর্থাৎ এই বিশাল বিশ্ব-সংসার অনাদি, অনন্ত। *** সৃষ্টশূন্য সৃষ্টিকর্ত্তা ধারণার অতীত, ভোক্তাবিহীন অন্নদাতা কল্পনায় আসে না, কারণ সমস্ত ঐশিক নাম ও বিশেষণ প্রাণী ও বস্তুর অস্তিত্ব দাবী করে। যদি আমরা কল্পনা করিতে পারি, এমন এক সময় ছিল, যখন কোনো প্রাণী কি বস্তুর কোনো অস্তিত্বই ছিল না, তাহা হইলে ঈশ্বরের ঈশিত্ব অস্বীকার করা হইবে। অধিকন্তু, পূর্ণ অনস্তিত্ব অস্তিত্বশীল হইতে পারে না। যদি প্রাণীকুল পূর্ণঅনস্তিত্ব হইত, অস্তিত্ব সত্য হইয়া থাকিত না। সুতরাং, একত্বের সারাৎসার অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব

যখন চিরন্তন' ও শাশ্বত, অনাদি-অনন্ত, তখন এই অস্তিত্ব-জগতেরও কোনো আদি-অন্ত হইতে পারে না। হাঁ, এই বিশ্ব সংসারের কোনো একটি অংশ, অর্থাৎ প্রাকৃতিক গোলকপুঞ্জের কোনো একটি গোলক নূতন-সৃষ্টি প্রাপ্ত হইতে পারে কিম্বা বিশ্লিষ্ট হইয়া বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু অপর গোলকগুলি থাকিয়া যাইবে, বিশ্ব-শৃঙ্খলায় কোনো গোল বাধিবে না, তাহার কিছুই ক্ষতি হইবে না, বরং অস্তিত্ব-জগৎ বিদ্যমান্ ও স্থিরতর থাকিবে; কারণ, ব্যষ্টি কি সমষ্টিগত যে কোনো সৃষ্ট বস্তুর বিশ্লেষ কি বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী; অধিক হইতে গেলে এই হয় যে, কতকগুলি বস্তু শীঘ্র শীঘ্র বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, কতকগুলি ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট হয়; কিন্তু একটি সৃষ্ট বস্তু বিশ্লিষ্ট হইবে না, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে'।"—(কতিপয় প্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ২০৯)

মানবের ক্রমবিবর্ত্তন

জৈববিজ্ঞানবিৎগণ বলিয়া থাকেন যে লক্ষ, লক্ষ বৎসর-ব্যাপী বিবর্ত্তনের ফলে মানব-দেহ বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে; বাহাউল্লা' ইঁহাদের সহিত একমত। প্রাথমিক অকিঞ্চিৎকর অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে উন্নীত হইয়া মানব-দেহ নানা স্তরের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে, কল্পান্তব্যাপী যুগের পর যুগ কাটিয়া যায়, মানব-দেহ ক্রমশঃ সরল হইতে জটিল হইতে থাকে, অবশেষে সুব্যবস্থিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ এইরূপ নানা স্তরের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত হয়; প্রথমে তাহা আঠালবৎ তরল পদার্থের একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম বিন্দুমাত্র থাকে, ক্রমে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণাবয়ব

মানব-দেহে রূপান্তরিত হয়। ব্যক্তি বা ব্যষ্টির পক্ষে যদি ইহা সত্য হয়, সমগ্র মানবজাতি সম্বন্ধে সমষ্টিগত ভাবে ইহা সত্য, বলিলে অপমান বোধ করিবার কারণ কি? মানুষ বানরের সন্ততি, ইহা এবং পূর্ব্ববর্ণিত মতবাদ এক নহে। মানব-ভ্রূণ কোনো সময়ে হয়ত লেজ-বিশিষ্ট মৎস্যের ন্যায় দেখাইতে পারে, কিন্তু সেই কারণে মৎস্য ও মানব-শিশু এক, ইহা মনে করিলে ভুল করা হইবে। সেইরূপ কোনো কোনো বিশেষ অবস্থায় মানব-ভ্রূণ আরও নানারূপ অধস্তন জীব-জন্তুর মত দেখাইতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহাতে তাহার মানবত্ব অব্যাহত থাকে। ব্যক্তি বা ব্যষ্টি সম্বন্ধে যাহা সত্য, সমগ্র মানব-জাতি বা সমষ্টি সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। সমগ্র মানব-জাতিকে আমরা বর্ত্তমান সময়ে যে অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে, দেখিতে পাইতেছি, তাহা ক্রম-বিবর্ত্তনের ফল, ভবিষ্যকালে আরও অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া মানব শ্রেষ্ঠতর জীবে পরিণত হইবে, ইহাও আশা করা যায়; কারণ, মানবের অন্তর্নিহিত বর্দ্ধমানতা-শক্তি অতীব প্রবল এবং উহা অতীব রহস্যময়। আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন:—

"ইহা সুস্পষ্ট যে এই পার্থিব গোলক তাহার বর্ত্তমান আকৃতিতে হঠাৎ, আকস্মিক ভাবে সমাগত হইয়াছিল না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে, নানা স্তর অতিক্রম করিয়া অবশেষে এই বর্ত্তমান সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়াছে। * * * মানব এই ভূমণ্ডলের গর্ভাশয়ে, মাতৃজঠরে ভ্রূণের মত, ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং এক আকৃতি হইতে অপর আকৃতিতে অতিক্রান্ত হইয়া অবশেষে বর্ত্তমান সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতায়, বর্ত্তমান শক্তি ও ক্ষমতায় উন্নীত হইয়াছে। নিঃসন্দেহ যে আদিতে তাহার এই কমনীয়তা, এই সৌন্দর্য্য, এই শোভা ছিল না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে, এই আকার, এই আকৃতি, এই সৌন্দর্য্য, এই

শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে। * * * মানব-অস্তিত্বের আরম্ভ হইতে মানবের এই বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে, *** কিন্তু তাহার সৃষ্টির আরম্ভ হইতে সে একটি স্বতন্ত্র জাত। *** যদি ইহাও মানিয়া লওয়া যায় যে মানবের কোনো কোনো লুপ্ত অঙ্গের নিদর্শন এখনও মানবদেহে বর্ত্তমান, তাহা হইলেও ইহাতে মানবের জাত-স্বাতন্ত্র্য অপ্রমাণিত হয় না; বরং ইহার দ্বারা এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে মানবের আকৃতি, গঠন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উন্নতি লাভ করিয়াছে। মানব সর্ব্বকালে স্বতন্ত্র জাত অর্থাৎ মানব রহিয়াছে, কোনো কালে পশু ছিল না।—(কতিপয় প্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ২১১—২১৪)

আদি-মানব-দম্পতী আদম্ এবং ঈভের উপাখ্যান সম্বন্ধে আব্দুল্-বাহা বলিতেছেন ঃ—

"যদি আমরা জনসাধারণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই উপাখ্যানটির বাহ্য অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে এই কথা বড়ই অসাধারণ বলিয়া মনে হয়। বোধশক্তি তাহা গ্রহণ কি সমর্থন করিতে পারে না, কল্পনা করাও অসম্ভব; কারণ, এইরূপ বন্দোবস্ত, এইরূপ মীমাংসা, এইরূপ বক্তৃতা, এইরূপ ভর্ৎসনা একজন বুদ্ধিমান্ মানবের পক্ষেও অপ্রাসঙ্গিক, সেই ঈশিত্বের পক্ষে কতই না অসম্ভব, যিনি এই অনন্ত বিশ্ব-সংসারকে একান্ত পরিপূর্ণ সৃষ্টিতে সুব্যবস্থিত করিয়াছেন এবং ইহার অসংখ্য অধিবাসীবৃন্দকে অপরিসীম শক্তিতে, অত্যুত্তম শৃঙ্খলায় ও পরিপূর্ণতম সৌন্দর্য্যে সুশোভিত করিয়াছেন। * * * সুতরাং, আদম্ এবং ঈভ্ জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইয়া স্বর্গরাজ্য হইতে নিষ্কাসিত হইয়াছিল, এই উপাখ্যানটিকে একটি রূপক মনে করাই সঙ্গত। এই উপাখ্যানটির মধ্যে ঐশ্বরিক নিগূঢ়-তত্ত্ব, বিরাট তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে, ইহার নানাবিধ বিস্ময়কর অর্থ হইতে পারে।"—(কতিপয় প্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ১৪০)

দেহ এবং আত্মা

দেহ, আত্মা এবং জন্মান্তর সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে গবেষণা, অনুসন্ধান দ্বারা যেই সমস্ত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সহিত বাহাই উপদেশাবলীর সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, মৃত্যু নবজন্মের নামান্তর মাত্র, অর্থাৎ আত্মা দেহ-কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া বৃহত্তর জীবনে অতিক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুর পরে জীবনের উন্নতি অসীম ও অনন্ত। ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহ পুঞ্জীভূত হইতেছে, যাহা ন্যায়পর, সূক্ষ্ম সমালোচকগণের মতেও মৃত্যুর পরে জীবন আছে বা দেহান্তরের পরে প্রবুদ্ধ আত্মার কার্য্যকলাপ ও জীবন অবিচ্ছিন্ন, এই সত্য নিঃসন্দেহরূপে সাব্যস্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। "মানব-ব্যক্তিত্ব" নামক গ্রন্থে এফ্ ডাব্লিউ এইচ্ মায়ার্স্ জীবাত্মা সম্বন্ধীয় গবেষণা সমিতির নির্ণীত সত্যগুলি এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"পর্য্যবেক্ষণ, গবেষণা, অনুমান-সিদ্ধান্ত আমাকে এবং আরও অনেক তথ্যানুসন্ধিৎসুকে এই বিশ্বাসে পরিচালিত করিয়াছে, যে কেবল ধরাপৃষ্ঠে-বিচরণকারী আত্মাদিগের মধ্যে মুখ্যভাবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে পরস্পরের মনোভাব বা সংবাদ বিনিময় হইতে পারে, তাহা নহে, বরং পরলোকগত এবং ধরাপৃষ্ঠে-বিচরণকারী আত্মাদিগের মধ্যেও এইরূপ সংবাদ-বিনিময় হইয়া থাকে। ঈদৃশ আধ্যাত্মিক আবিষ্কার দৈববাণী কি প্রেরণার দ্বারও উন্মুক্ত করে। *** আমরা সাব্যস্ত করিয়াছি যে নানারূপ প্রবঞ্চনা, আত্ম-প্রবঞ্চনা, শঠ্য, বিভ্রম ইত্যাদির মধ্য দিয়াও মৃত্যুর পরপার হইতে আমাদের নিকটে সত্য-প্রকাশ-সমূহ উপস্থিত হয়। সত্য-প্রকাশ ও সত্য-প্রেরণার সাহায্যে আমরা যেই সকল পরলোকগত আত্মার সম্মুখীন হইতে পারিয়াছি, তাহাদের

সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে আমি প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বাস করিয়াছি যে তাহাদের অবস্থা জ্ঞান এবং প্রেমে অনন্তকালব্যাপী ক্রম-বিবর্ত্তনশীল। তাহাদের জাগতিক প্রেম থাকিয়া যায় — তাহাদের প্রায় সমস্ত প্রেম, যাহা সর্ব্বোচ্চ, যাহা অর্চ্চনা, আরাধনাদিতে পর্য্যবসিত, তাহা সমস্তই থাকিয়া যায়। পাপকে তাহারা এত ভয়াবহ মনে করে না, যতদূর দাসোচিত মনোভাবকে মনে করিয়া থাকে; তাহারা ইহাকে কোনো পরাক্রমশালী শক্তিধরের অবয়ববিশিষ্ট মনে করে না, বরং এক বিকারগ্রস্ত আত্মার উন্মাদনা মনে করে, যেই অবস্থা হইতে উচ্চতর স্তরে অবস্থিত আত্মাগণ এই অস্থির বা বিকৃত আত্মার উদ্ধারের জন্য সতত চেষ্টায়মান থাকে। সেখানে অগ্নি সংযোগে শাস্তিবিধানের প্রয়োজন নাই; স্বজ্ঞানই মানবের শাস্তি কি পুরস্কার। স্বজ্ঞান এবং আপন প্রিয় আত্মাগণের নৈকট্য বা বিচ্ছেদই সেই জগতে অত্যন্ত সুখ কি অত্যন্ত দুঃখ; কেননা, সেখানে প্রেমেই আত্মার স্থিতি। সিদ্ধপুরুষগণের পরস্পর মিলন কেবল যে চিরস্থায়ী জীবনের শোভা বর্দ্ধন করে, তাহা নহে, বরং ইহাই চিরস্থায়ী জীবন। অধিকন্তু, আধ্যাত্মিকভাবে সংবাদ-বিনিময়-বিজ্ঞান মতে, ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, আমরা এই জগতে, এই সময়েও তাঁহাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতেছি। এখনও পরলোকগত আত্মার প্রেম আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দে'। এখনও আমরা যদি সেই দেহ-মুক্ত আত্মাগণের প্রতি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণযুক্ত হই, তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা করি—প্রেম স্বয়ংই প্রার্থনা—তাঁহারা তাঁহাদের প্রগতি-পথে শক্তি ও সহায়তা লাভ করে।"

উপরোক্ত মতবাদ, যাহা সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর

স্থাপিত, তাহার সহিত বাহাই উপদেশাবলীর ঐক্যের মাত্রা সত্য সত্যই অদ্ভুত ও অসাধারণ।

মানবজাতির একত্ব

"তোমরা সকলেই একই বনস্পতির ফল, একই শাখার পত্রনিচয়, একই বাগানের পুষ্পরাজি", ইহা বাহাউল্লা'র বিশিষ্ট বাক্যাবলীর অন্যতম। তদ্রূপ, আর একটি বিশিষ্ট বাণী: "আমার দেশকে আমি ভালবাসি, ইহা বলিয়া যেন কোনো ব্যক্তি অহঙ্কার না করে; মানবজাতিকে ভালবাসাই একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহাতেই উল্লাস করা উচিত।" একত্ব অর্থাৎ মানবকুলের একতা, ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্ট জীবের একতা, বাহাউল্লা'র উপদেশের প্রধান কথা। এস্থলেও প্রকৃত ধর্ম্ম ও প্রকৃত বিজ্ঞানের মধ্যে ঐক্য প্রতীয়মান। বিজ্ঞানের উন্নতি যতই বাড়িতেছে, সমগ্র বিশ্বের একত্ব ও তাহার বিভিন্ন অংশের পরস্পর-সম্বন্ধ ততই অধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিদের কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত পদার্থবিদের কর্ম্মক্ষেত্র, পদার্থবিদের কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত অপরসায়নবিদের, অপরসায়নবিদের কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত জীবন-বিজ্ঞানবিদের, জীবন-বিজ্ঞানবিদের কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত মনোবিজ্ঞানবিদের এবং এইরূপ অসংখ্য বিজ্ঞানবিদের কর্ম্মক্ষেত্র অপর অসংখ্য বিজ্ঞানবিদের কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত অবিচ্ছিন্নরূপে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। একটি গবেষণা ক্ষেত্রের প্রত্যেক নূতন আবিষ্কার বিভিন্ন গবেষণা ক্ষেত্রে নূতন আলোক প্রদান করে, যেমন পদার্থ-বিজ্ঞান প্রমাণিত করিয়াছে যে প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক পরমাণু প্রত্যেক অপর পরমাণুকে আকর্ষণ ও প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে,—সেই পরমাণু যতই ক্ষুদ্রাদপি

ক্ষুদ্র, যতই দূরবর্ত্তী হউক না কেন; এইরূপে মনোবিজ্ঞান আবিষ্কার করিতেছে যে বিশ্ব-জগতে প্রত্যেক আত্মা অপর আত্মাকে পরিবর্ত্তিত ও প্রভাবান্বিত করে। প্রিন্স ক্রোপাট্কিন তাঁহার "পরস্পর-সাহায্য" নামক গ্রন্থে অতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন যে নিম্নস্তরের জীবজন্তুর মধ্যেও তাহাদের আপন জীবন রক্ষার্থে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য, এবং মানব-সভ্যতার উৎকর্ষ-সাধন করিতে হইলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন না হইয়া পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইবে। "প্রত্যেকেই সকলের জন্য এবং সকলেই প্রত্যেকের জন্য"—ইহাই একমাত্র সত্য-তথ্য, যাহার উপরে প্রত্যেক সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

একতার যুগাগমন

বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ এই কথারই সাক্ষ্য দিতেছে যে মানবজাতির ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছে। অদ্যাবধি মানবজাতির ঈগলপাখী স্বার্থপরতা ও পার্থিবতার সুদৃঢ় পর্ব্বত-শিখরের পুরাতন নীড়ে দোলায়মান হইয়া অবস্থান করিতেছিল; প্রাচীন নীতি ও অন্ধবিশ্বাসের কারাগারের মধ্যে তাহার দুঃখ-যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল; উড়িবার জন্য তাহার পক্ষসমূহের পরীক্ষা করিতেছিল; অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্য তাহার চঞ্চল বাসনা জাগ্রত হইয়াছিল। এখন সেই কারাগার-যুগের অবসান হইয়াছে; এখন ইহা জ্ঞান ও বিশ্বাসের পক্ষসহকারে আধ্যাত্মিক প্রেম ও সত্যের উচ্চতর রাজ্যগুলিতে উড্ডীয়মান্ হইতে পারে; এখন তাহার পক্ষ জন্মিবার পূর্ব্বের মত ইহা মাটিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না, বরং সেই উন্নত দৃশ্য এবং গৌরবময় স্বাধীনতার রাজ্যে স্বাধীনভাবে উড়িতে থাকিবে। কিন্তু,

তাহার উড্ডয়ন স্থির, নিশ্চিত এবং অটল করিতে হইলে, তাহার একটি বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন; তাহার পক্ষগুলি শুধু বলিষ্ঠ হইলে চলিবে না, পরিপূর্ণ একতা ও সহযোগিতা সহকারে তাহাদের কর্ম্ম করিতে হইবে। যেমন আব্‌দুল্‌বাহা বলিতেছেন ঃ—

"ইহা একাকী এক পক্ষসহকারে উড়িতে পারে না; যদি ইহা কেবলমাত্র ধর্ম্মের পক্ষ সহকারে উড়িতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে কুসংস্কারের বীভৎস পঙ্কিলে পতিত হইবে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানের পক্ষ-সহকারে উড়িতে চেষ্টা করিলে, জড়বাদের নিরানন্দ জলাভূমিতে সমাধি লাভ করিবে।"—(প্যারিসে কথাবার্ত্তা, পৃঃ ১৩২)

ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের সমন্বয় ব্যতীত মানবের উন্নত জীবন সম্ভব-পর নহে। যখন সাধারণ্যে এই বিষয়ের উপলব্ধি হইবে, যখন জগতের প্রত্যেক বালক-বালিকাকে শুধু বিজ্ঞান ও শিল্পে নহে, বরং সমগ্র মানবকুলের প্রতি প্রেমে, এবং মানবের ক্রমবিবর্ত্তনের প্রগতি-পথে এবং অবতারগণের উপদেশাবলীতে প্রকাশিত ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালনে শিক্ষিত করা হইবে, তখন এবং কেবলমাত্র তখনই ঈশ্বরের রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, তেমনি মর্ত্ত্যধামেও সম্পন্ন হইবে এবং তখনি সর্ব্বব্যাপী মহান্ শান্তি পৃথিবীর উপর তাহার শুভাশীষ বর্ষণ করিবে। আব্‌দুল্‌বাহা বলিতেছেন ঃ—

"কুসংস্কার, কিংবদন্তী, অন্ধ-বিশ্বাস হইতে ধর্ম্ম যখন মুক্ত হইয়া বিজ্ঞানের সঙ্গে ঐক্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে, তখন একটি একীকারক, পবিত্রকারী মহান্-শক্তির সৃষ্টি হইবে, যাহা সর্ব্বপ্রকারের কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ পৃথিবী হইতে বিদূরিত করিবে, এবং তখনি মানবজাতি ঈশ্বরের প্রেমের শক্তিতে একতাবদ্ধ হইবে।"— (প্যারিসে কথাবার্ত্তা, পৃঃ ১৩৫)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাহাই প্রকাশ কর্ত্তৃক ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্‌যাপন

"মহীয়ান্ নামের প্রকাশ (বাহাউল্লা')ই সেই মহান্ প্রকাশ, ঈশ্বর যাহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাঁহার সমস্ত পুস্তক ও গ্রন্থাবলীতে, —যেমন বাইবেল্, গস্‌পেল্ ও কোরাণে।"—(আব্‌দুল্‌বাহা)

ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা

সকলেই জানেন যে ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা করা অতি কঠিন ব্যাপার; এসম্বন্ধে বিদ্বান্‌মণ্ডলীর মতামত যত বিভিন্ন, অন্য কোনো বিষয়ে তত নহে। কিন্তু, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, কারণ, পবিত্র পুস্তকাবলীর মর্ম্মানুযায়ীও, ভবিষ্যদ্বাণীগুলির অনেকটি এইভাবে প্রদত্ত হইয়াছিল যে তাহাদের সমাপন-সময় উপস্থিত না হইলে তাহাদের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইত না; এমন কি, সেই সময়েও, যাঁহাদের অন্তর পবিত্র এবং যাঁহারা কুসংস্কার-বিহীন, তাঁহারা ব্যতীত অপর কেহই তাহা বুঝিতে পারিত না। যেমন দানিয়েলের স্বপ্নের শেষভাগে বলা হইয়াছে:—

"কিন্তু, হে দানিয়েল! তুমি শেষকাল পর্য্যন্ত এই বাক্যসকল রুদ্ধ করিয়া রাখ, এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়া রাখ; অনেকে ইতস্ততঃ

ধাবমান্ হইবে, এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে। *** আমি এই কথা শুনিলাম বটে, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না; তখন আমি কহিলাম, হে আমার প্রভু, এই সকলের শেষফল কি হইবে? তিনি কহিলেন: 'হে দানিয়েল, তুমি প্রস্থান ক'র, কেননা শেষকাল পর্য্যন্ত এই সকল বাক্য রুদ্ধ ও মুদ্রাঙ্কিত থাকিবে।"—(দানিয়েল, ১২, ৪-১০)

ঈশ্বর যদি নির্দ্ধারিত সময় না আসা পর্য্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি মোহরাঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যেই সমস্ত অবতার ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকটেও ঐ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করেন নাই, তাহা হইলে ইহার উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট বার্ত্তাবহ ব্যতীত অপর কেহই সেই মোহর ভগ্ন করিয়া অবতারগণের উপদেশ-গল্প-ভাণ্ডারে নিহিত মর্ম্মার্থগুলি উদ্ঘাটিত করিতে সক্ষম হইবেন না। ভবিষ্যদ্বাণীর ইতিহাসের এবং পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে ও বিধানে ঐ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর গর্হিত ব্যাখ্যার সমালোচনা এবং স্বয়ং অবতারগণের গম্ভীর সতর্কীকরণ বাণী আমাদিগকে ঐ সমস্ত উচ্চারিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং তাহাদের পূর্ণ হওয়ার নিয়ম সম্বন্ধে তত্ত্বোপদেষ্টাগণের কল্পনাবলী কতদূর গ্রহণোপযোগী, তদসম্বন্ধে সবিশেষ সাবধান করিয়া দিতেছে। অপর পক্ষে, যদি কেহ উপস্থিত হ'ন এবং ঐ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিবার দাবী করেন, তখন আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, আমরা সরল অন্তরে, নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহার দাবী সম্যক পরীক্ষা করিয়া দেখিব। যদি তিনি প্রবঞ্চক হ'ন, শীঘ্রই তাঁহার প্রবঞ্চনা ধরা পড়িবে, কোনো ক্ষতি হইবে না; কিন্তু ঐ সমস্ত লোক ভারী বিপন্ন হইয়া পড়িবে, যাহারা ঈশ্বরের বার্ত্তাবহকে আপনাদের সন্নিকট হইতে হেলায় ফিরাইয়া দে',—এই কারণে যে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে অসময়েই সমাগত হইয়াছেন।

বাহাউল্লা'র বাণী এবং তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলী একথার সাক্ষ্য দিতেছে যে তিনি পবিত্র গ্রন্থাবলীর সেই প্রতিশ্রুত মহামানব, যিনি ভবিষ্যদ্বাণীর মোহর ভগ্ন করিয়া স্বর্গীয় নিগূঢ়তত্ত্বের "মোহরাঙ্কিত অভিষ্ট সুরা" পরিবেশন করিতে সক্ষম। সুতরাং, আমাদের কর্ত্তব্য, অপর সকল কার্য্য স্থগিত রাখিয়া আমরা তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিব, এবং সেই ব্যাখ্যার আলোকে পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিব, অবতারগণের সেই সুপরিচিত, চিররহস্যময় বাক্যগুলি।

ঈশ্বরের আগমন

"শেষের দিনে" ঈশ্বরের আগমন এমন এক আধ্যাত্মিক ঘটনা, যাহার সম্বন্ধে অবতারগণের প্রত্যেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রশংসা-গীতি গাহিয়াছিলেন। এখন, প্রশ্ন এই, ঈশ্বরের আগমন অর্থে কি বুঝায়। ঈশ্বর নিশ্চয়ই সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বভূতে আছেন, — তিনি সকলের মধ্যে, সকলের মাঝ দিয়া, সকলের উপরে প্রকাশমান। তিনি "গ্রীবা-ধমনী হইতে সন্নিকটবর্ত্তী, হস্তপদাদি হইতে সন্নিকট"। হাঁ, একথা সত্য বটে; কিন্তু মানুষ অতিদীপ্ত, অলৌকিক ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, তাঁহার উপস্থিতি উপলব্ধি করিতে পারে না, যে পর্য্যন্ত না তিনি প্রত্যক্ষ অবয়বের মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশ করেন এবং তাহাদের সঙ্গে মানবীয় ভাষায় কথা বলেন। ঈশ্বর সর্ব্বকালে এক এক জন মানুষকে তাঁহার সর্ব্বোচ্চ গুণাবলী প্রকাশ করিবার যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। অবতারগণের প্রত্যেকেই এক একজন মধ্যস্থ বিশেষ; ঈশ্বর তাঁহাদের মধ্যস্থতায় তাঁহার ভৃত্য-গণের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন

করিয়াছেন। যীশুখৃষ্টও একজন এইরূপ মধ্যস্থ বিশেষ; খৃষ্টানগণ তাঁহার আগমনকে ঈশ্বরের আগমন বলিয়া সঠিক বুঝিয়াছিল, তাঁহার বদনমণ্ডলে ঈশ্বরের মুখমণ্ডল দেখিয়াছিল, তাঁহার রসনার মধ্য দিয়াই ঈশ্বরের রব শুনিয়াছিল। বাহাউল্লা' বলিতেছেন, *** "গণপ্রভু", "শাশ্বত পিতা", "পৃথিবীর নির্ম্মাণকারী ও ত্রাণকর্ত্তা"র আগমন, যাহা সমস্ত অবতারগণের নির্দ্দেশ অনুযায়ী "শেষের সময়ে" সংঘটিত হইবার কথা,—তাহার তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর মানব-দেহে প্রকাশিত হইবেন, যেমন তিনি নজরেথবাসী যীশুখৃষ্টের মানবীয় দেহে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন, তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা পরিপূর্ণতর ও উজ্জ্বলতর প্রকাশের সহিত আগমন করিয়াছেন,—সেই আগমন উপলক্ষ্য করিয়া যীশুখৃষ্ট প্রমুখ অন্যান্য অবতারগণ মানবের মন ও অন্তঃকরণ প্রস্তুত করিবার জন্য ইতঃপূর্ব্বে সমাগত হইয়াছিলেন।

যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

মসীহের রাজত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ বুঝিতে না পারিয়া য়িহুদীগণ যীশুখৃষ্টকে অস্বীকার করিয়াছিল। আব্দুল্‌বাহা বলিতেছেন:—

"য়িহুদীগণ এখনও মসীহের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে ও নিশিদিন ঈশরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে: হে ঈশ্বর, মসীহের আগমন ত্বরা ক'র। যীশু আসিলেন, তাহারা তাঁহাকে দণ্ডার্হ বলিয়া নির্দ্দেশ করিল, তাঁহাকে হত্যা করিল, এবং এই বলিল: ইহা সেই-ব্যক্তি নহে, যাহার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতেছি। দেখ, যখন মসীহ্ আসিবেন, তখন যুগ-লক্ষণ ও বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনাবলী প্রমাণ করিবে যে তিনি সত্যই যীশুখৃষ্ট। মসীহ অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে আসিবেন। তিনি দাউদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবেন, এবং, আরও

দেখ, তিনি ইস্পাতের তরবারি সঙ্গে লইয়া আসিবেন এবং লৌহদণ্ড সহকারে শাসন করিবেন। তিনি অবতার সম্পর্কীয় ঈশ্বরের বিধান পূর্ণ করিবেন। তিনি পূর্ব্ব-পশ্চিম জয় করিবেন, তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি য়িহুদীগণকে যশস্বী করিবেন। তিনি এমন এক শান্তিরাজ্য সঙ্গে আনিবেন, যাহাতে পশুগণও মানবের সহিত শত্রুতা ছাড়িয়া দিবে, ব্যাঘ্র এবং ছাগশিশু একই নির্ঝর হইতে জল পান করিবে, ঈশ্বরের যাবতীয় সৃষ্টপ্রাণী পরম শান্তিতে বাস করিবে।

"য়িহুদীগণ এবম্প্রকার ভাবিত, এই কথাই বলিত, কারণ তাহারা পবিত্র গ্রন্থ ও তাহার প্রভাময় তথ্য কিছুই বুঝিয়াছিল না। বাক্য ত তাহাদের মুখস্থই ছিল, কিন্তু জীবন-প্রদ শক্তির একটি কথাও তাহারা বুঝিল না।

"তোমরা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, আমি তোমাদিগকে তাহার তাৎপর্য্য বলিয়া দিতেছি: যদিও যীশুখৃষ্ট সর্ব্বজন-বিদিত স্থান নজরেথ হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি স্বর্গ হইতেও আসিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ মেরী হইতে জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মা স্বর্গ হইতে আসিয়াছিল। তিনি যে তরবারি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রসনারই তরবারি, যাহার দ্বারা তিনি মন্দ হইতে ভাল, মিথ্যা হইতে সত্য, অবিশ্বাসী হইতে বিশ্বাসী, অন্ধকার হইতে আলোক পৃথক করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্য বাস্তবিকই তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার তরবারি সদৃশ ছিল। তিনি যে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন তাহা চিরস্থায়ী সিংহাসন, তাহার উপরে উপবেশন করিয়া তিনি চিরকাল রাজত্ব করিতেছেন,—ইহা পার্থিব সিংহাসন নহে, স্বর্গীয় সিংহাসন, কারণ পার্থিব সকল বস্তুই বিলুপ্ত হয়, কিন্তু স্বর্গীয় বস্তু চিরকাল থাকিয়া যায়। তিনি মুসার অনুশাসন-আইন নূতন অর্থে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং অবতার

সম্পর্কীয় ঈশ্বরের বিধান পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্য পূর্ব্ব-পশ্চিম জয় করিয়াছিল। তাঁহার রাজত্ব চিরস্থায়ী। তিনি ঐ সমস্ত য়িহুদীদিগকে উন্নত করিয়াছিলেন, যাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। তাহারা সকলেই নীচ-জন্মা নরনারী, কিন্তু তাঁহার সংস্পর্শে যেই আসিল, তখনি মহান্ হইল, চিরস্থায়ী মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইল। পশুগণ পরস্পর মিলিয়া থাকিবে, একথার তাৎপর্য্য, পরস্পর যুদ্ধনিরত বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়গণের প্রেম-মৈত্রী সহকারে মিলিয়া মিশিয়া থাকা, এবং তাহার উদ্দেশ্য চিরস্থায়ী নির্ঝর যীশুখৃষ্ট হইতে জীবন-বারি পান করা।"—
(প্যারিসে কথাবার্ত্তা, পৃঃ ৪৮)

অধিকাংশ খৃষ্টান মসীহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর ঐরূপ ব্যাখ্যা যাহা যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু হজরত মোহাম্মদ এবং "যুগের শেষের" মসীহ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাহার প্রতি তাঁহাদের অনেকেই য়িহুদীদিগের ন্যায় একই মনোভাব-সম্পন্ন। তাঁহারা আশা করিয়া থাকেন, এমন এক অলৌকিক দৃশ্য প্রদর্শিত হইবে, যাহার দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেক অক্ষর ধরাপৃষ্ঠে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে।

বা'ব এবং বাহাউল্লা' সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

বাহাই ব্যাখ্যা অনুসারে, "শেষের সময়", "শেষের দিন", "শাশ্বত পিতা", "গণ-প্রভুর আগমন" সম্বন্ধে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাহা সমস্তই বাহাউল্লা'র আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রযোজ্য, যীশুখৃষ্টের আগমন

সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। উদাহরণ স্বরূপ য়িশাইয়ার প্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে:—

"যে জাতি অন্ধকারে বিচরণ করিত, তাহারা একটি মহান্ জ্যোতিঃ দেখিতে পাইয়াছে; যাহারা মৃত্যুচ্ছায়ার দেশে বাস করিত, তাহাদের উপরে আলোক উদিত হইয়াছে। *** কারণ, তুমি তাহার ভারের যোঁয়ালি, তাহার স্কন্ধের বাঁক, তাহার উপদ্রবকারীর দণ্ড এভাবে ভঙ্গ করিয়াছ, যেমন মিদিয়ানের দিনে হইয়াছিল। যোদ্ধার প্রত্যেক যুদ্ধ ভীষণ কলোরোলে শেষ হইতেছে, পরিচ্ছদ রক্তরঞ্জিত হইতেছে, অগ্নির ইন্ধনে সমস্ত দগ্ধ হইতেছে। আমাদের আজ একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমাদিগকে একটি পুত্র প্রদান্ করা হইয়াছে, রাজত্ব-ভার তাহার উপর ন্যস্ত থাকিবে: এবং তাহার নাম কীর্ত্তিত হইবে — অদ্ভুত কর্ম্মা, বিজ্ঞ মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, শাশ্বত পিতা, শান্তিরাজরূপে। দায়ুদের সিংহাসন ও তাঁহার রাজ্যের উপরে কর্ত্তৃত্ব-বৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না, যেন তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়, ন্যায় বিচারে ও ধার্ম্মিকতা সহকারে, এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত। গণ-প্রভুর উদ্যোগে ইহা সম্পন্ন করিবে।"—(য়িশাইয় ৯, ২-৭)

যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী যীশুখৃষ্টের আগমন নির্দ্দেশক বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হইয়া থাকে, এই ভবিষ্যদ্বাণী তাহাদের অন্যতম। ইহার কিয়দাংশ নিঃসন্দেহরূপে যীশুখৃষ্টের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু মনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে এই ভবিষ্যদ্বাণী কতই সুস্পষ্ট, সম্যকরূপে বাহাউল্লা'র সম্বন্ধে প্রযোজ্য। সত্য বটে, যীশুখৃষ্ট পরম-আলোক আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনি মানবজাতির পরিত্রাতা; কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের দুইসহস্র বৎসর পরেও পৃথিবী-বাসী মানবকুলের অধিকাংশ অন্ধকারে বিচরণ করিতেছে, বনি য়িস্রায়েলের

সন্তানগণ এবং ঈশ্বরের অন্যান্য পুত্রগণের অনেকেই অত্যাচারীর শাসন-দণ্ডের অধীনে আর্ত্তনাদ করিতেছে। অপরপক্ষে, বাহাই যুগারম্ভের প্রথম কয়েক দশকের মধ্যেই সত্যের আলোক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছে। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব-মন্ত্রে পৃথিবীর সমস্ত দেশ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে, সামরিক স্বেচ্ছাতন্ত্র-মূলক রাজত্বগুলি বিধ্বস্ত হইয়াছে, আন্তর্জাতিক মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জগতের অত্যাচারিত, নির্য্যাতিত, পদদলিত জাতিদিগের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে মুক্তিলাভের আশা সঞ্চারিত হইয়াছে। গত মহাসমরে পৃথিবী বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, নানারূপ অজ্ঞাতপূর্ব্ব আগ্নেয়াস্ত্র, মারণাস্ত্র, দ্রবীভূত অগ্নি, বোমা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সহযোগে পৃথিবী সত্য সত্যই "অগ্নির ইন্ধনে দগ্ধ" হইয়াছিল। বাহাউল্লা' তাঁহার গ্রন্থাবলীতে রাজধর্ম্ম এবং রাজশাসন সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন। তাহাতে তিনি শাসনসম্বন্ধীয় নানা সমস্যা গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং সেই সমস্ত সমস্যা সমাধানের উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি সত্য সত্যই "পৃথিবীর শাসনভার স্বকীয় স্কন্ধে গ্রহণ" করিয়াছেন, যীশুখৃষ্ট কখনও এরূপ করেন নাই। "শাশ্বত পিতা", "শান্তিরাজ" প্রভৃতি উপাধি সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে যে বাহাউল্লা' নিজেকে "পরমপিতার প্রকাশ" বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, যাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে যীশুখৃষ্ট এবং য়িশাইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন; কিন্তু যীশুখৃষ্ট নিজেকে সর্ব্বদাই "পরমপিতার পুত্র" নামে অভিহিত করিতেন। বাহাউল্লা' ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা, কিন্তু যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন, "আমি আসিয়াছি, প্রেরণ করিয়াছি শান্তি নহে, তরবারি"। বস্তুতঃ সমগ্র খৃষ্টীয় যুগ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সাম্প্রদায়িক কলহে পরিপূর্ণ ছিল।

ঈশ্বরের প্রভা

"বাহাউল্লা'" বাক্যটির আরবি ভাষাগত অর্থ ঈশ্বরের প্রভা। য়িহুদী অবতারগণ তাঁহাদের প্রায় সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বলিয়াছিলেন, সমস্ত ধর্ম্মের সেই প্রতিশ্রুত পুরুষ এই পবিত্র নামেই "শেষের সময়ে" আবির্ভূত হইবেন। য়িশাইয়ার চত্বারিংশত্তম অধ্যায়ে আমরা পাঠ করি :—

"তোমরা সান্ত্বনা কর, আমার জনগণকে সান্ত্বনা কর, তোমাদের ঈশ্বর ইহা বলেন। যেরুজালেমকে চিত্ততোষক কথা বল; এবং তাহার নিকটে চীৎকার করিয়া বল, তাহার যুদ্ধ-বৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে, তাহার অপরাধ ক্ষমা করা হইয়াছে; কারণ, তাহার সকল পাপ সত্ত্বেও সে পরমপ্রভুর হস্ত দুইবার প্রাপ্ত হইয়াছে। বনভূমিতে যেন কাহার স্বর শুনিতে পাইতেছি, সে যেন ফুকারিয়া বলিতেছে, পরম প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, আমাদের ঈশ্বরের জন্য মরুভূমির মধ্য দিয়া সুপ্রশস্ত, ঋজু পথ নির্ম্মাণ কর। প্রত্যেকটি উপত্যকা উন্নত করা হইবে এবং প্রত্যেকটি পর্ব্বত, উপপর্ব্বত নিম্ন করা হইবে, বক্রস্থান ঋজু করা হইবে, বন্ধুর স্থান সমতল করা হইবে, 'ঈশ্বরের প্রভা' প্রকাশিত হইবে এবং সমস্ত মর্ত্ত্য একসঙ্গে তাহা দেখিবে।"

পূর্ব্ব ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় এই ভবিষ্যদ্বাণীরও মাত্র কিয়দাংশ যীশুখৃষ্ট এবং তাঁহার অগ্রদূত জন্ দি ব্যাপটিষ্টের আগমনে পূর্ণ হইয়াছে; কারণ, যীশুখৃষ্টের সময়ে যেরুজালেমের যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষ হয় নাই, তাহার পরেও অনেক শতাব্দী ধরিয়া তিক্ত পরীক্ষা ও দারুণ অসম্মান যেরুজালেমের অদৃষ্টে সঞ্চিত ছিল। কিন্তু, বা'ব এবং বাহাউল্লা'র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণরূপে উদ্‌যাপিত হইতে বসিয়াছে,

যেরুজালেমের সুদিনের প্রভাত হইয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ যতদূর বুঝা যাইতেছে উজ্জ্বল ও শান্তিপূর্ণ।

অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছিল, য়িস্রায়েলের সন্তাপহারক, ঈশ্বরের প্রভা পূর্ব্বদিক হইতে পুণ্যভূমিতে সমাগত হইবেন, তিনি সূর্য্যোদয়ের সান্নিধ্য হইতে আসিবেন। বাহাউল্লা' পারস্যদেশে আবির্ভূত হইলেন এবং পারস্যদেশ প্যালেষ্টাইনের পূর্ব্ব দিকে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের দিকে; তিনি পুণ্যভূমিতে আসিয়া সেখানেই তাঁহার জীবনের শেষ চল্লিশবৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন। যদি তিনি স্বাধীন অবস্থায় স্বেচ্ছাপরবশ হইয়া সেখানে আসিতেন, তাহা হইলে লোকে বলিতে পারিত, তিনি প্রবঞ্চক, ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিবার নিমিত্তই তিনি সেখানে আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি আসিয়াছিলেন নির্ব্বাসিত বন্দী অবস্থায়; পারস্যের শাহ্ এবং তুরস্কের সোল্‌তান্ তাঁহাকে সেখানে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা নিশ্চয়ই "ঈশ্বরের প্রভা" বলিয়া যে বাহাউল্লা'র দাবী তাহার সমর্থক যুক্তি সংগ্রহ করিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সেখানে প্রেরণ করেন নাই।

ঈশ্বরের দিন

"ঈশ্বরের দিন", "শেষ দিন" এবং ঈদৃশ অপর বাক্যাবলীর মধ্যে "দিন" শব্দটির তাৎপর্য্যার্থ কাল বা যুগ। মহান্ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতাগণের প্রত্যেকেরই এক একটি "দিন" নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকেই এক একটি সূর্য্য-সদৃশ ছিলেন। প্রত্যেকের উপদেশাবলীর উদয়ন ছিল,—তাহাদের সত্যতা ধীরে ধীরে জনসাধারণের বোধশক্তি ও হৃদয়কে আলোকিত করিত—যতদিন না তাহাদের প্রভাবের চরমসীমায় তাহারা

উপনীত হইত। তাহার পরে তাহাদের আলোক ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইত, তাহাদের ভুল ব্যাখ্যা করা হইত, তাহাদের সত্যতা লুপ্ত হইত এবং পৃথিবী অন্ধকারে ছাইয়া যাইত। অবশেষে নূতন "দিনের" অর্থাৎ নবযুগের সূর্য্য উদিত হইত।

শেষের দিনই ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশের দিন, কেননা, ইহা এমন একটি দিন, যাহার কোনো শেষ নাই এবং যাহার কোনো রাত্রি নাই। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশের সূর্য্য কখনও অস্তমিত হইবে না, বরং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, উভয় জগতের সমস্ত আত্মাগণকে আলোকিত করিবে।

বাস্তবিক পক্ষে, কোনো আধ্যাত্মিক সূর্য্যই কোনো কালে অস্তমিত হয় নাই। মুসা, যীশু, মোহাম্মদ ও অপরাপর সমস্ত অবতার-রবিগণ অদ্যাবধি স্বর্গলোকে অক্ষুণ্ণ প্রভায় দেদীপ্যমান্। কিন্তু, পৃথিবী-সৃষ্ট কুসংস্কারের মেঘরাশি পৃথিবীবাসী হইতে তাঁহাদের প্রভা লুকাইয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সূর্য্য বাহাউল্লা' এই সমস্ত মেঘরাশিকে চিরতরে বিতাড়িত করিবেন, যাহাতে সকল ধর্ম্মের জনগণ সকল অবতারের আলোক গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, সকলে মিলিয়া সেই একই ঈশ্বরের পূজা করিতে পারে,—যাঁহার আলোক অবতারগণের প্রত্যেকেই প্রতি-বিম্বিত করিয়াছিলেন।

আব্দুল্‌বাহা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

য়িশাইয়া, জেরেমিয়া, য়িজিকিয়েল, জাকারিয়া প্রমুখ অবতার-গণের ভবিষ্যদ্বাণীতে "শাখা" বলিয়া এক মহাপুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে। খৃষ্টানগণ মনে করেন, ইহাতে যীশুখৃষ্টের কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছে, কিন্তু বাহাইগণের বিশ্বাস, ইহাতে বিশিষ্টরূপে আব্দুল্‌বাহার

কথা ঘোষিত হইয়াছে। পারস্যদেশের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে "বৃহত্তম শাখা" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে; বাহাউল্লা'র জ্যেষ্ঠপুত্র আব্দুল্‌বাহাও বাহাইদিগের নিকটে সাধারণতঃ এই নামেই পরিচিত। বাহাউল্লা' তাঁহার ফলকলিপিতে নিজেকে "বৃক্ষ" এবং "বৃক্ষমূল" বলিতেছেন, এবং আব্দুল্‌বাহাকে বলিতেছেন "শাখা"। আব্দুল্‌বাহা স্বয়ং বলিতেছেন:—

"আব্দুল্‌বাহা 'ঈশ্বরের অঙ্গীকারের কেন্দ্র,' বৃক্ষের অধীনস্থ ঐ শাখা। বৃক্ষই সার, বৃক্ষই ভিত্তি, বৃক্ষই সার্ব্বজনীন মহাসত্য।"—(পশ্চিমের তারকা, ৮ম খণ্ড, নং ১৭, পৃঃ ৩২৫)

"শাখা" সম্বন্ধে বাইবেলের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ভবিষ্যদ্বাণী য়িশাইয়ার একাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে। তাহা এইরূপ:—

"আর যেশীর মূল কাণ্ড হইতে এক পল্লব নির্গত হইবে এবং তাহার শিকড় হইতে একটি শাখা উদ্ভূত হইবে; তাহাতে পরম প্রভুর প্রাণ, বিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা, পরিণামদর্শিতা, পরাক্রম, জ্ঞান ও ভয় অবস্থান করিবে। * * * ধর্ম্মশীলতা তাহার কটির বসন হইবে, বিশ্বস্ততা তাহার রশ্মির বন্ধনী হইবে। শার্দ্দূলও মেষ-শাবকের সহিত একত্রে বসবাস করিবে, ছাগ-শিশু চিতাবাঘের সহিত, সিংহ-শিশু গোবৎস ও হৃষ্টপুষ্ট পশুর সহিত; একটি ক্ষুদ্র বালক তাহাদিগকে পরিচালিত করিবে। * * * আমার পবিত্র পর্ব্বতের কোনো স্থানে তাহারা পরস্পরকে পীড়া দিবে না, পরস্পরকে বধ করিবে না; কারণ সমুদ্র যেরূপ বারিরাশিতে পরিপূর্ণ, পৃথিবীও সেইরূপ পরম প্রভুর জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। * * * আর সেই দিন এই ঘটিবে, প্রভু আপন জনগণের অবশিষ্টাংশকে মুক্ত করিয়া আনিবার জন্য দ্বিতীয়বার হস্তক্ষেপ করিবেন, অর্থাৎ এশিরিয়া হইতে, মিসর হইতে,

পথ্রোচ হইতে, কুশ হইতে, এল্‌ম হইতে, শিনিয়র হইতে, হমাৎ হইতে এবং সমুদ্রের মধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জ হইতে অবশিষ্ট লোকদিগকে আনিবেন। আর তিনি সমগ্র মানবকুলের জন্য একটি সাধারণ পতাকা উন্নীত করিবেন, য়িস্রায়েলের তাড়িত লোকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবেন, পৃথিবীর চতুষ্কোণ হইতে জুডা'র ছিন্নভিন্ন লোকদিগকে একত্রিত করিবেন।"

আব্‌দুল্‌বাহা এই ভবিষ্যদ্বাণীর এবং "শাখা" সম্বন্ধীয় অপর ভবিষ্যদ্বাণীগুলির নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—

"সেই অতুলনীয় শাখার আবির্ভাব দিনে সমগ্র জাতি-সমাজে ঈশ্বরের পতাকা উত্তোলিত হইবে, অর্থাৎ সকল জাতি, উপজাতি ঈশ্বরের এই পতাকাতলে অর্থাৎ এই বৃহত্তম শাখার-ছায়াধীনে সমবেত হইবে, সমগ্র মানবজাতি এক জাতিতে পরিণত হইবে। ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের পরস্পর-সংগ্রাম, জাতি ও উপজাতির পরস্পর-শত্রুতা এবং দেশগত বিরোধভাব সমূলে উৎপাটিত হইবে। সকলে মিলিয়া এক ধর্ম্মে, এক বিশ্বাসে, এক জাতিতে, এক সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে এবং একই জন্মভূমি পৃথিবীতে একত্রে বাস করিবে। সার্ব্বজনীন শান্তি-মৈত্রী সমগ্র জাতি-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই অতুলনীয় শাখা য়িস্রায়েলের সমস্ত বংশধরগণকে একত্রিত করিবেন; অর্থাৎ পৃথিবীর পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে ছিন্নভিন্ন য়িহুদীজাতিকে পূণ্যভূমি প্যালেষ্টাইনে একত্রিত করা হইবে।

"এখন বিবেচনা করিয়া দেখ : এই সমস্ত ঘটনা খৃষ্টান যুগে ঘটে নাই, কারণ, জাতিসমূহ একই পতাকাতলে অর্থাৎ ঈশ্বরের শাখার ছায়াধীনে সমবেত হইয়াছিল না; কিন্তু গণপ্রভুর যুগে অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগে তাহারা এই পতাকার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তদ্রূপ খৃষ্টীয়ান যুগে সমগ্র পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত য়িস্রায়েল জাতি পবিত্র ভূমিতে

একত্রিত হইয়াছিল না, কিন্তু বাহাউল্লা'র যুগারম্ভ হইতেই অবতারগণের পুস্তকাবলীতে বর্ণিত সেই স্বর্গীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে য়িহুদী জাতিগুলি পুণ্যভূমিতে আসিয়া একত্রিত হইতেছে, তাহারা গ্রাম ও নগর অধিকার করিয়া তাহাদের বসতি স্থাপন করিতেছে এবং দিন দিন তাহাদের সংখ্যা এত অধিক বর্দ্ধিত হইবে যে সমগ্র প্যালেষ্টাইন তাহাদের বাস-স্থানে পরিণত হইবে।"
—(কতিপয় প্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ৭৫)

উপরোক্ত বাক্য লিখিত হওয়ার পরেই প্যালেষ্টাইন তুর্কীদিগের হাত ছাড়া হইয়াছে এবং সম্মিলিত মিত্র-শক্তি প্যালেষ্টাইনে য়িহুদীদিগের জন্য একটি জাতীয় নিবাস প্রতিষ্টিত করিবার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া লইয়াছেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করা হইতেছে।

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে জাতিসঙ্ঘের মহাসভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং একটি আন্তর্জাতিক মহাসভাও অস্তিত্বে সমাগত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সমস্ত রাষ্ট্রের যুদ্ধোপকরণের হ্রাসসাধন করা। আন্তর্জাতিক শান্তি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার পক্ষে এই সমস্ত নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি।

কেয়ামত বা পরমবিচারের দিন

যীশুখৃষ্ট তাঁহার উপদেশ-গল্পাবলীর মধ্যে বারম্বার এক পরম-বিচারের দিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—যেই সময় "মানবপুত্র আপন পিতার প্রভায় ভূষিত হইয়া সমাগত হইবেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কর্ম্মানুসারে পুরস্কৃত করিবেন" (মথি ১৬, ২৭)। তিনি এই

দিনকে শস্য-সংগ্রহের সময়ের সঙ্গে তুলিত করিয়াছেন, যখন আগাছা পোড়ান হয় এবং গোধুম গোলায় সঞ্চিত করা হয়ঃ—

"তেমনি পৃথিবীর শেষে (যুগান্তে) হইবে। মানবপুত্র আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন, যাঁহারা তাঁহার রাজ্য হইতে সমস্ত বিঘ্ন-জনক বিষয় ও অধর্ম্মচারীদিগকে সংগ্রহ করিবেন এবং তাহাদিগকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবেন; সেইখানে রোদন ও দন্তঘর্ষন হইবে। তখন ধার্ম্মিকগণ আপনাদের পিতার রাজ্যে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইবে।"—(মথি ১৩, ৪০-৪৩)

বাইবেলের এই উদ্ধৃত বাক্যে এবং তদ্রূপ অপরাপর বাক্যাবলীতে ব্যবহৃত "পৃথিবীর শেষ", এই বাক্যাংশ হইতে অনেকে মনে করেন যে পরম বিচারের দিনে পৃথিবী সহসা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। এই বাক্যাংশের প্রকৃত অনুবাদ যুগের শেষ বা যুগের পূর্ণতাপ্রাপ্তি। যীশুখৃষ্ট বলিতেছেন, পরমপিতার রাজত্ব স্বর্গ-মর্ত্ত্য উভয়স্থলেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। তিনি আমাদিগকে এই বলিয়া প্রার্থনা-নিবেদন করিতে শিক্ষা দিতেছেনঃ— "তোমার রাজত্ব সমাগত হউক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গ-মর্ত্ত্যে পূর্ণ হউক।" দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উপদেশ গল্পে, যখন দ্রাক্ষা-ক্ষেত্রের প্রভু, পরমপিতা দুষ্ট চাষীদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য সমাগত হইবেন, তিনি দ্রাক্ষা-ক্ষেত্র (পৃথিবীকে) ধ্বংস করিবেন না; বরং তাহা অপর চাষীকে দিয়া দিবেন, যাহারা যথা সময়ে তাঁহাকে তাহার ফল প্রদান করিবে। পৃথিবী ধ্বংস হইবে না, পৃথিবী নবীভূত ও পুনর্জ্জীবিত হইবে। আর এক উপলক্ষ্যে যীশুখৃষ্ট সেই দিন সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, ইহা "পুনর্জন্মের দিন, যখন মানবপুত্র তাঁহার প্রভার সিংহাসনে উপবেশন করিবেন"। সেণ্ট পিটার এই দিনকে বলেন, "পুনঃসঞ্জীবিত হইবার দিন ও যাবতীয় বিষয়ে উন্নতি-

শৃঙ্খলা হইবার দিন,—ঈশ্বর যেই দিন সম্বন্ধে তাঁহার পুণ্য অবতারগণের রসনার মাঝ দিয়া পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে বলিয়া আসিয়াছেন"। যীশুখৃষ্ট যেই পরমবিচারের দিনের কথা বলিয়াছেন, তাহা য়িশাইয়া ও অন্যান্য ওল্ড টেষ্টামেণ্টে বর্ণিত অবতারগণের সেই প্রতিশ্রুত গণপ্রভু, পরমপিতার আবির্ভাবের দিন, যেই সময় দুরাত্মাগণ তীব্র শাস্তি ভোগ করিবে, এবং স্বর্গ-মর্ত্ত্য উভয় স্থলে ন্যায়পরতা ও ধর্ম্মের রাজত্ব তুল্য-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বাহাই ব্যাখ্যা অনুসারে, অবতারের আগমন মাত্রই পরমবিচারের দিন, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার বাহাউল্লা'র আবির্ভাবই সর্ব্বপ্রধান বিচারের দিন, যে সময় হইতে অতি বিরাট যুগ আরম্ভ হইতেছে। যীশু, মোহাম্মদ ও অন্যান্য অবতারগণ যে ভেরী-নিনাদের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা ঈশ্বরের প্রকাশের আহ্বান ধ্বনি, যাহা স্বর্গ-মর্ত্ত্যে, শরীরী, অশরীরী সকলের জন্য নিনাদিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের অবতারের মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের দর্শনলাভ ঐ সকল লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, যাহারা ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রকৃত পক্ষে প্রয়াসী হয়। এই সাক্ষাৎকারই ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রেমের স্বর্গের দ্বারপথ, এবং তাঁহার সৃষ্ট প্রাণীকুলের সঙ্গে প্রেম, মৈত্রীসহকারে জীবননির্ব্বাহ করিবার একমাত্র উপায়। অপর পক্ষে, যাহারা পুণ্য অবতারগণের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় পথ অবলম্বন করে, তাহারা স্বার্থপরতা, ভ্রান্তি ও বিদ্বেষরূপ নরকে আপনাকে সমর্পণ করে।

হাসর বা পুনরুত্থান

পরম বিচারের দিনই পুনরুত্থানের দিন, অর্থাৎ মৃতব্যক্তিদিগের

জীবিত হইবার দিন। সেণ্ট প'ল কোরিন্থিয়ানদিগের নিকটে তাঁহার প্রথম পত্রে বলিতেছেন:—

"দেখ, আমি তোমাদিগকে এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি, আমরা সকলে নিদ্রাগত হইব, তাহা নয়, কিন্তু সকলে রূপান্তরীকৃত হইব, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, শেষ তুরী-ধ্বনিতে: যখন তুরী বাজিবে, তখন মৃতেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে, এবং আমরা রূপান্তরীকৃত হইব। কারণ, এই ক্ষয়ণীয়কে অক্ষয়তা পরিধান করিতে হইবে এবং এই মর্ত্ত্যকে অমরতা পরিধান করিতে হইবে।"—(১ম করিন্থীয়, ১৫, ৫১-৫৪)

বাহাউল্লা' উপরোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে, অর্থাৎ মৃতের জীবিত হওয়া সম্বন্ধে ঈকান্ গ্রন্থে বলিতেছেন:—

" 'জীবন' এবং 'মৃত্যু' এই দুইটি বাক্য, যাহা ধর্ম্মগ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ, বিশ্বাসরূপী জীবন, অবিশ্বাসরূপী মৃত্যু। জনসাধারণ এই অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাসবান হইতে অস্বীকার করিয়াছিল, সত্য-পথে-পরিচালক সূর্য্যের আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, এবং শাশ্বত সৌন্দর্য্যের অনুগমন করিয়াছিল না। *** যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন: 'তোমাদিগকে দুইবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে', এবং আর এক উপলক্ষ্যে তিনি বলিয়াছিলেন: 'মানুষ যে পর্য্যন্ত জল ও আত্মা হইতে জন্মলাভ না করে, ততদিন তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, কেননা, যাহা মাংস হইতে উৎপন্ন, তাহা মাংসই এবং যাহা আত্মা হইতে, তাহা আত্মাই'।—(জন, ৩-৬) ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের জ্ঞানবারির দ্বারা এবং তাঁহার অবতারের পুণ্য সঞ্জীবনী শক্তির দ্বারা সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত না হয়, সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশলাভ করিবার উপযুক্ত নহে। *** ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সমস্ত ভৃত্য যাহারা প্রত্যেক প্রকাশের

সময়ে পুণ্য অবতারিগণের সঞ্জীবনীশক্তি বলে জন্মপ্রাপ্ত ও সঞ্জীবিত হয়, তাহাদিগকে জীবিত ও পুনরুত্থোলিত বলা হইয়া থাকে এবং তাহারাই ঈশ্বরের প্রেমের স্বর্গে প্রবেশ অধিকার লাভ করে; এবং অপর সকল ব্যক্তিকে জড় ও মৃত বলা হইয়া থাকে, তাহারা ঈশ্বরের ক্রোধ ও অবিশ্বাসের নরকাগ্নিতে প্রবেশ করে। *** যদি তোমরা জ্ঞানের নির্ম্মল বারি কিয়ৎপরিমাণে পান করিতে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে যে শরীরী জীবন প্রকৃত জীবন নহে, আত্মিক জীবনই প্রকৃত জীবন; কারণ, পশু ও মানব সমভাবে শরীরী জীবনের অধিকারী, কিন্তু প্রকৃত জীবন ঐ সমস্ত উজ্জ্বল আত্মার জন্য নির্দ্দিষ্ট, যাহারা বিশ্বাসের মহাসাগর হইতে পান করিয়া থাকে এবং নিশ্চয়তার ফল আস্বাদন করে। এই জীবনের পর মৃত্যু নাই এবং এই অমরত্বের বিনাশ নাই, যেমন বলা হইয়াছে: 'প্রকৃত বিশ্বাসী বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় জগতে জীবিত', যদি জীবন অর্থে বাহ্যিক শরীরী জীবনই উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে ইহাত সুস্পষ্ট যে মৃত্যু তাহাকে নাশ করিয়া থাকে।—(ঈকান্ গ্রন্থ, পৃঃ ৮০-৮৫)

বাহাই উপদেশ অনুসারে, দেহের পুনরুত্থান হয় না। দেহ একবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, শেষ হইয়া যায়, তাহার পরমাণু বিশ্লিষ্ট হয় এবং সেই একই দেহে পুনঃ সংযোগিত হয় না।

পুনরুত্থানের তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বরের অবতারের মধ্যস্থতায় মানব পবিত্র পরমাত্মার প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া আধ্যাত্মিক জীবনে জন্মলাভ করে। যে সমাধি হইতে সে পুনরুত্থিত হয়, উহা ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞানতা ও অনাবিষ্টতার সমাধি। যে নিদ্রা হইতে সে জাগরিত হয়, তাহা সুপ্ত, আধ্যাত্মিক অবস্থা,—যেই অবস্থায় থাকিয়া অনেকেই ঈশ্বরের দিনের প্রভাত প্রতীক্ষা করে। ধরাপৃষ্ঠে বিচরণকারী

শরীরী, অশরীরী সকল আত্মাকেই এই আধ্যাত্মিক প্রভাত আলোক-দান করে। কিন্তু, ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাহাদের আধ্যাত্মিক চক্ষু অন্ধ, তাহারা এই প্রভাতের দর্শন পায় না। "এই পুনরুত্থানের দিন চব্বিশ ঘণ্টার দিন নহে, বরঞ্চ একটি যুগ,—যাহা এখন আরম্ভ হইয়াছে, এবং যদবধি বর্ত্তমান বিশ্ব-চক্র চলিতে থাকিবে, তৎকাল পর্য্যন্ত ইহা স্থায়ী হইয়া থাকিবে। এই দিনের প্রভাতী তারা মহামতি বা'ব, এই দিনের সূর্য্য বাহাউল্লা'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ, এই দিনের চন্দ্র আব্‌দুল্‌বাহা,—ইহা এমন এক তারা, এমন এক সূর্য্য, এমন এক চন্দ্র,—যাহা কখনই অস্তমিত হইবে না, বরং আধ্যাত্মিক জগতে বরাবর দেদীপ্যমান্ থাকিবে,—যখন বর্ত্তমান সভ্যতার সমুদয় চিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে।

যীশুখৃষ্টের প্রত্যাবর্ত্তন

যীশুখৃষ্ট তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তায় ভাবী অবতারের উল্লেখ তৃতীয় পুরুষে করিয়াছেন, কিন্তু কোনো কোনো স্থলে উত্তম পুরুষও ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন তিনি বলিতেছেন: "আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে চলিলাম এবং যখন আমি যাইয়া তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, আমি পুনরায় আসিব এবং তোমাদিগকে আমার সঙ্গে লইয়া যাইব"।—(জ'ন, ১৪, ২)

"একৃট"এর প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে, যীশুর তিরোধানের সময় শিষ্যবর্গকে বলা হইল: 'এই একই যীশু যাহাকে তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে লইয়া যাওয়া হইল, সে এভাবে পুনরায় আসিবে, যেমন তোমরা তাহাকে স্বর্গে যাইতে দেখিয়াছ'।

এইরূপ নানা কথার দরুণ অনেক খৃষ্টীয়ান আশা করে যে যখন মানবপুত্র আসিবেন 'আকাশের মেঘের আড়ালে বিপুল প্রভার সহিত', তখন তাহারা দেখিতে পাইবে দেহধারী সেই যীশুকে, যিনি দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেরুজালামের রাস্তায় বিচরণ করিতেন এবং ক্রুশবিদ্ধ হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। তাহারা আশা করিয়া আছে যে যীশুখৃষ্টের হস্ত-পদাদিতে পেরেকের দ্বারা যে সমস্ত ছিদ্র করা হইয়াছিল, তাহারা উহার মধ্যে তাহাদের অঙ্গুলি ঢোকাইবে এবং তাঁহার শরীরের পার্শ্বদেশে বর্ষাফলকের দ্বারা যে ক্ষত করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে তাহাদের হস্ত প্রবিষ্ট করাইয়া দেখিবে। কিন্তু, স্বয়ং যীশুখৃষ্টের বাণী এইরূপ ধারণা নিরাকৃত করে।

যীশুখৃষ্টের যুগে য়িহুদীগণ য়িলিয়াসের প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিত, কিন্তু তিনি তাহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে "য়িলিয়াস প্রথমে আসিবেন" এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; যেহেতু এই ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ ইহা নহে যে পূর্ব্বকার য়িলিয়াস স্বয়ং সশরীরে য়িলিয়াসরূপেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, কিন্তু সেই য়িলিয়াসের শক্তি ও প্রেরণা লইয়া অপর একজন মহান্ পুরুষ আসিবেন, এবং দেখাইয়া দিলেন যে, জন্ দি ব্যাপটিষ্টই সেই য়িলিয়াস। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন: "এবং যদি তোমরা ইহা গ্রহণ করিবে, তবে ইনিই য়িলিয়াস্, যাহার আসিবার প্রয়োজন ছিল। যাহার শুনিবার কান আছে, সে ইহা শ্রবণ করুক।" সুতরাং য়িলিয়াসের পুনরাগমনের তাৎপর্য্য এই যে, অপর এক পিতা-মাতা হইতে জন্মপ্রাপ্ত অপর এক ব্যক্তির আবির্ভাব, যিনি য়িলিয়াসের অনুপ্রাণনা ও শক্তিতে ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরণাপ্রাপ্ত হইয়া আসিবেন। সুতরাং, যীশুখৃষ্টের এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল যে যীশুখৃষ্টের

পুনরাগমনও সেই একই ধরণে, অপর এক মাতা হইতে জন্মপ্রাপ্ত অপর এক ব্যক্তির আবির্ভাব দ্বারা সম্পন্ন হইবে, যিনি যীশুখৃষ্টের মত ঐশ্বরিক শক্তি ও অনুপ্রাণনা প্রকাশ করিবেন। বাহাউল্লা’ বলিতেছেন, য়িলিয়াস্ এবং যীশুখৃষ্টের পুনরাগমন বা’বের আবির্ভাবে এবং তাঁহার আপন আগমনে সম্পন্ন হইয়াছিল।

“যদি অদ্যকার সূর্য্য এই কথা বলে, ‘আমি গতকল্যের সূর্য্য’, ইহা সত্য বই মিথ্যা হইতে পারে না, এবং যদি দিনের ক্রমহিসাবে বলে, ‘আমি গতকল্যের সূর্য্য হইতে বিভিন্ন’, ইহাও মিথ্যা নহে। এইরূপে দিনগুলি বিবেচনা করিয়া দেখ: যদি বলা হয় যে সকল দিনই এক, ইহা সত্য বই অসত্য হইতে পারে না, এবং যদি বলা হয় যে নাম ও মর্য্যাদা হিসাবে তাহারা পরস্পর বিভিন্ন, ইহাও অসত্য নহে—যেমন তোমরা স্বচক্ষে দেখিতেছ। কারণ, যদিও তাহারা এক, তত্রাচ প্রত্যেকের জন্য এক একটি নাম, বিশেষণ ও পদবী আছে, যাহা অপর হইতে বিভিন্ন। এই একইরূপ ব্যাখ্যা ও নিয়মানুসারে তোমরা অবতারগণের স্বাতন্ত্র্য, প্রভেদ ও একত্বের পদবী বুঝিয়া লও, যেন একত্ব ও পার্থক্য সম্বন্ধে নাম ও বিশেষণের সৃষ্টিকর্ত্তার বাক্যের ব্যাখ্যা বুঝিতে পার।”—(ঈকান্ গ্রন্থ, পৃঃ ১৫)

আবৃদুল্‌বাহা বলিতেছেন:—

“জানিয়া রাখ,—যীশুখৃষ্টের দ্বিতীয় আগমনের অর্থ জনসাধারণ যাহা মনে করে, তাহা নহে, বরং ইহাতে এই কথারই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে যীশুখৃষ্টের পরে অপর এক প্রতিশ্রুত পুরুষ আবির্ভূত হইবেন, যিনি ঈশ্বরের রাজত্ব ও শক্তি সঙ্গে লইয়া আসিবেন, যাহা সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিবে। এই রাজত্বের অর্থ পার্থিব জগতে প্রভুত্ব করা নহে, আত্মা ও হৃদয়ের জগৎ অধিকার করা; কারণ, এই

পার্থিব জগৎ ঈশ্বরের সমক্ষে মক্ষিকার পক্ষতুল্যও নহে,—যদি তোমরা 'যাহারা জানে' তাহাদের মধ্যে হইতে! নিশ্চয়ই, যীশুখৃষ্ট তাঁহার রাজত্বের সহিত আসিয়াছিলেন আদি বিহীন আরম্ভ হইতে, এবং তাঁহার রাজত্বের সহিত আসিবেন অন্তশূন্য অনন্তকাল পর্য্যন্ত; যেহেতু, এই অর্থে ঈশ্বরের সত্যতাই ক্রাইষ্টের তাৎপর্য্য, যাহা অবিমিশ্র সার-বস্তু এবং স্বর্গীয় অস্তিত্বের প্রকাশ, ইহা অনাদি, অনন্ত। প্রত্যেক যুগাবর্ত্তে ইহার আবির্ভাব, উদয়, প্রকাশ ও অস্ত আছে।"— (আব্দুল্‌বাহার ফলকলিপি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৮)

শেষের সময়

যীশুখৃষ্ট এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যবর্গ, পিতার ঐশ্বর্য্য সঙ্গে লইয়া মানবপুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় নির্দ্দেশক নানা লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। যীশুখৃষ্ট বলিতেছেন:—

"আর যখন তোমরা যেরুজালেমকে সৈন্য-সামন্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখিবে, তখন জানিবে যে তাহার ধ্বংস সন্নিকট। * * * কেননা, ইহা প্রতিশোধের সময়,—যখন ঐ সমস্ত কথা যাহা লিখিত আছে তাহা সমস্তই পূর্ণ হইয়া যাইবে। * * * কেননা, দেশে বিষম দুর্গতি এবং এই জাতির প্রতি ক্রোধ বর্ত্তিবে। লোকেরা তরবারি ধারে পতিত হইবে এবং বন্দী হইয়া সকল জাতির মধ্যে নীত হইবে; আর জাতিগণের সময় সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত যেরুজালেম জাতিগণের পদদলিত হইবে।"—(লুক ২১, ২০-২৪)

তিনি আবার বলিতেছেন:—

"তোমরা সাবধান হইও, যেন কেহ তোমাদিগকে প্রতারিত করিতে না পারে; কেননা, অনেকে আমার নাম লইয়া আসিয়া

বলিবে, 'আমি যীশুখৃষ্ট', এবং অনেককে প্রতারিত করিতেও সমর্থ হইবে। আর তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনিবে; দেখিও ব্যাকুল হইও না, কেননা এই সকল অবশ্যই ঘটিবে, কিন্তু তখনও শেষ নয়। কারণ, জাতি জাতিতে, রাজত্ব রাজত্বে সংঘর্ষ হইবে; স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ভূমিকম্প হইবে। কিন্তু এই সমস্ত যাতনার আরম্ভ মাত্র। সেই সময় লোকেরা ক্লেশ দিবার জন্য তোমাদিগকে (শত্রু হস্তে) সমর্পণ করিবে, ও তোমাদিগকে বধ করিবে; আর আমার নাম বহন কর বলিয়াই সমুদয় জাতি তোমাদিগকে ঘৃণা করিবে। আর তৎকালে অনেককে পীড়া দেওয়া হইবে, একজন অন্যকে (শত্রু হস্তে) সমর্পণ করিবে, একজন অপরকে ঘৃণা করিবে। আর অনেক কৃত্রিম অবতার উঠিয়া অনেককে প্রতারিত করিবে। আর অধর্ম্মের বৃদ্ধি হওয়াতে অধিকাংশ লোকের প্রেম শীতল হইয়া যাইবে। কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে। আর সর্ব্ব-জাতির নিকটে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে।"—(মথি ২৪, ৪-১৪)

উপরোক্ত বাণী দুইটিতে যীশুখৃষ্ট অতীব সুস্পষ্ট, বিশদ ভাষায় মানবপুত্রের আগমনের পূর্ব্বে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিবে, তাহা বলিয়া দিয়াছেন। তিনি যেই সময় এই সকল বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার পরের কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তাঁহার বর্ণিত লক্ষণ সমূহের প্রত্যেকটিই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উপরোক্ত প্রত্যেক বাণীর শেষাংশে তিনি এমন এক একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা ভাবী অবতারের আগমন কাল নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রথম বাণীতে য়িহুদী জাতির নির্ব্বাসনের সমাপ্তি ও যেরুজালেমের পুনরুদ্ধারের কথা, এবং

অপরটিতে "সুসমচার" প্রচার। এই দুইটি পূর্ব্বলক্ষণ আমাদের বর্ত্তমান যুগে অক্ষরে অক্ষরে সম্পন্ন হইতেছে। এখন, যদি ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রতি আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও আস্তা থাকে, তাহা হইলে আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে আমরা সেই শেষের সময়ে উপস্থিত হইয়াছি, যাহার সম্বন্ধে যীশুখৃষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

হজরত মোহাম্মদও কতিপয় পূর্ব্বলক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত প্রকাশ হইতে থাকিবে। কোরাণে আমরা পাঠ করি:—

"যখন আল্লা' বলিলেন: হে যীশু! নিশ্চয়ই আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব এবং আমার দিকে তোমাকে উন্নীত করিব এবং অবিশ্বাসী-গণের অপবাদ হইতে তোমাকে উদ্ধার করিব এবং তোমার অনু-গামীদিগকে (অর্থাৎ খৃষ্টানগণকে) কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত অবিশ্বাসী-গণের (অর্থাৎ য়িহুদী ও অপর জাতিগণের) উপরে স্থাপিত করিব; আমার নিকটে তোমাদের পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন হইবে, তদনন্তর তোমরা যাহাতে অনৈক্য হইয়াছ, আমি তোমাদের মধ্যে তাহার মীমাংসা করিব"।—(সুঃ ৩, ৫৪)

"আর য়িহুদীরা বলে, ঈশ্বরের হাত বদ্ধ। তাহাদের হাত বদ্ধ করা হইবে, এবং তাহারা যাহা বলিয়াছে, তজ্জন্য অভিশপ্ত হইবে। বরং, প্রসারিত রহিয়াছে, ঈশ্বরের উভয় হস্ত। তিনি আপন ইচ্ছামত দান-বিতরণ করেন, এবং তোমার প্রভু হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা তাহাদের অনেকেরই অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা বৃদ্ধি করিবে, এবং আমরা তাহাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ স্থাপন করিয়াছি, যাহা কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে; তাহারা যেরূপে

যুদ্ধের কারণে আগুন জ্বালাইয়া থাকে, ঈশ্বর সেরূপেই তাহা নির্ব্বাপিত করিবেন।”—(সুঃ ৫, ৬৯)

“আর যে সমস্ত লোক নিজকে নিজে খৃষ্টান বলিয়া পরিচিত করে এবং বলিয়া থাকে, আমরা ‘অঙ্গীকার’ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদিগকে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহার অধিকাংশই তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে; সুতরাং আমরা তাহাদের মধ্যে শক্রতা ও বিদ্বেষ উত্থাপন করিয়াছি, যাহা কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকিবে; এবং অনতিবিলম্বে ঈশ্বর তাহাদের কৃত-কর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদিগকে জানাইয়া দিবেন।”—(সুঃ ৫, ১৭)

এসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীও অক্ষরে অক্ষরে সম্পন্ন হইয়াছে। য়িহুদীজাতি খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের অধীনস্থ হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে পরস্পর-কলহ ও সাম্প্রদায়িকতা উত্থাপিত হইয়াছিল, যাহা হজরত মোহাম্মদের ভবিষ্যদ্বাণীর পর হইতে বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহাদিগকে পরস্পর-বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মাত্র বাহাই যুগারম্ভ হইতে অর্থাৎ পুনরুত্থানের দিন হইতে এই অবস্থা-অপনোদনের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

স্বর্গ-মর্ত্ত্যে অবতার-আবির্ভাবের লক্ষণসমূহ

য়িহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাব কালে যে সকল লক্ষণ দেখা দিবে, সে সম্বন্ধে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যোয়েলের গ্রন্থে আমরা পাঠ করি:—

“আর, আমি আকাশে ও পৃথিবীতে অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইব,—

রক্ত, অগ্নি ও ধূমস্তম্ভ দেখাইব। পরম প্রভুর ঐ মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিনের আগমনের পূর্ব্বে সূর্য্য অন্ধকারে ও চন্দ্র রক্তে পরিণত হইবে। কারণ, দেখ, সেই কালে ও সেই সময়ে যখন আমি যুডা' এবং যেরুজালেমের বন্দীত্ব পুনঃ-আনয়ন করিব, তখন সমস্ত জাতিকে সংগ্রহ করিয়া যিহোশাফট (যিহোভা বিচার করেন)এর উপত্যকাতে আনয়ন করিব, এবং সেখানে তাহাদের সহিত বিচার করিব *** সমারোহ, সমারোহ দণ্ডাজ্ঞার তলভূমিতে ঃ কেননা দণ্ডাজ্ঞার তলভূমিতে পরমপ্রভুর দিন সন্নিকট। সূর্য্য ও চন্দ্র তমসাচ্ছন্ন হইবে, তারকাকুল আপন আপন দীপ্তি গুটাইয়া লইবে। আর পরমপ্রভু সিয়োন হইতে গর্জ্জন করিবেন, যেরুজালেম হইতে আপন রব শুনাইবেন; এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী কম্পিত হইবে; কিন্তু পরমপ্রভু আপন জনগণের আশ্রয় স্বরূপ হইবেন।"

যীশুখৃষ্ট বলিতেছেন :—

"আর সেই সময়ের ক্লেশের পরেই সূর্য্য অন্ধকারে ঢাকিয়া যাইবে, চন্দ্র আলোক ও কিরণ দানে বিরত হইবে। তারকাকুল আকাশ হইতে খসিয়া পড়িবে, সৌরমণ্ডল কাঁদিতে থাকিবে, মানবপুত্রের আবির্ভাবের লক্ষণ আকাশে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। পৃথিবীর সমস্ত জাতি, উপজাতি শোক করিবে; তাহারা দেখিবে, মানবপুত্র আকাশের মেঘরাশি বিদীর্ণ করিয়া পরম শক্তি ও বিরাট প্রভায় ভূষিত হইয়া আসিতেছেন।"—(মথি ২৪, ২৯-৩০)

কোরাণে আমরা পাঠ করি :—

"যখন সূর্য্যকে আবৃত করা হইবে, যখন তারকাকুল পতিত হইবে, যখন পর্ব্বতগুলিকে চালিত করা হইবে, *** যখন পুস্তকের

পৃষ্ঠাগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে, যখন স্বর্গকে অনাবৃত করা হইবে, যখন নরক প্রজ্জলিত করা হইবে।"—(সুঃ ৮১)

বাহাউল্লা' ঈকান্ গ্রন্থে এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, স্বর্গ, মর্ত্ত্য সম্বন্ধে বাক্যাবলী রূপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের কেবলমাত্র আক্ষরিক অর্থ করা উচিত নহে। অবতারগণের বিশেষ সম্পর্ক কোনো পার্থিব বস্তুর সহিত ছিল না, অপার্থিব, আধ্যাত্মিক বস্তুর সহিতই তাঁহাদের সম্পর্ক ছিল; পার্থিব আলোক তাঁহাদের লক্ষ্যের বিষয় ছিল না, অপার্থিব, আধ্যাত্মিক আলোকই তাঁহাদের লক্ষ্যের বিষয় ছিল। পরম-বিচারের দিন সম্পর্কে তাঁহারা যখন সূর্য্যের কথা উল্লেখ করেন, তখন বুঝিতে হইবে, তাঁহারা ধার্ম্মিকতা ও ন্যায়পরতার সূর্য্যের কথাই বলিতেছেন। সূর্য্যই আলোকের সর্ব্বপ্রধান উৎপত্তি-স্থল। এমতে, মুসা য়িহুদীদিগের জন্য সূর্য্য সদৃশ, যীশুখৃষ্ট খৃষ্টানদের জন্য এবং মোহাম্মদ মুসলমানদিগের জন্য। যখন তাঁহারা বলেন, সূর্য্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সমস্ত আধ্যাত্মিক সূর্য্যগণের পবিত্র উপদেশাবলী কুসংস্কার, ভ্রান্তি ও কদর্থের দ্বারা এতদূর সমাচ্ছন্ন হইবে যে জনসাধারণ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক অন্ধকারেই বিচরণ করিতে থাকিবে। চন্দ্র ও তারকাকুল অপেক্ষাকৃত স্বল্প আলোকের আধার,—তাহারাই ঐ সমস্ত ধর্ম্মনেতা ও প্রধান ব্যক্তি, যাহাদের কর্ত্তব্য ছিল জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়া ও ধর্ম্মপথে পরিচালিত করা। চন্দ্র কিরণ-দানে বিরত হইবে অথবা রক্ত-সাগরে ডুবিয়া যাইবে এবং তারকাকুল আকাশ হইতে খসিয়া পড়িবে—এই সমস্ত কথার তাৎপর্য্য এই যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নেতাগণ পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে ব্যাপৃত থাকিয়া জঘন্য

হইয়া যাইবে, এবং পুরোহিতগণ বিষয়াসক্ত ও স্বর্গীয় বস্তুর পরিবর্ত্তে পার্থিব বস্তুর প্রতি বিশেষ আসক্ত হইয়া পড়িবে।

এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ অন্যরূপও হইতে পারে, একটি মাত্র ব্যাখ্যাতে ইহা সম্পূর্ণ হয় না। বাহাউল্লা' বলেন, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা ইত্যাদি বাক্যাবলী প্রত্যেক ধর্ম্মের ব্যবস্থিত নিয়ম, অনুশাসনের অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মের রীতি-নীতি ও বিধি-নিষেধ পরবর্ত্তী অবতারের সময়ে, সময়ের আবশ্যকতা অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়, এই কারণে এই সমস্ত অর্থে চন্দ্র, সূর্য্য পরিবর্ত্তিত হয় এবং তারকাকুল অন্তর্হিত হয়।

অনেক স্থলে এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী তাহাদের বাহ্যিক অর্থে, অক্ষরে অক্ষরে কখনও সম্পন্ন হইতে পারে না, ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ — চন্দ্র রক্ত-সাগরে ডুবিয়া যাইবে অথবা তারকাকুল পৃথিবীপৃষ্ঠে খসিয়া পড়িবে, এ কথার বিবেচনা করা হউক। দৃশ্যমান্ তারকাকুলের অতি ক্ষুদ্রতমটিও পৃথিবী হইতে বহু সহস্র গুণ বড়; যদি তাহাদের কোনো একটি পৃথিবীর উপরে পতিত হয়, তাহাতে আর একটি পড়িবার স্থান থাকিবে কি? সে যাহা হউক, অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের পার্থিব, অপার্থিব উভয় প্রকারের পরিণতি রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, অবতারগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পুণ্যভূমি প্যালেষ্টাইন বহু শতাব্দী ধরিয়া মরুভূমি মাত্র ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে য়িশাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মৃতোত্থোলনের দিনে (অর্থাৎ বাহাই যুগে) গোলাপের ন্যায় হর্ষোৎফুল্ল ও পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যেই স্থান জনমানবশূন্য পতিতভূমি ছিল, তাহাতে অতি সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশ স্থাপন করা হইতেছে, জমিতে জলসিঞ্চন ও কৃষিকার্য্য করা হইতেছে, দ্রাক্ষা-উদ্যান, জলপাই-বাগান ও কুঞ্জকাননে তাহাকে

সুশোভিত করা হইতেছে। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে মানুষ যখন তরবারি দিয়া লাঙ্গল প্রস্তুত করিবে এবং বর্ষাফলককে কাস্তে পরিণত করিবে, তখন জগতের সমস্ত নির্জ্জন প্রান্তর মরুভূমিগুলি সংস্কৃত হইবে; দগ্ধকারী বায়ু এবং বালুকা-মেঘরাশি যাহা এই সমস্ত মরুভূমি হইতে সঞ্চালিত হয় এবং যাহার সন্নিহিত প্রদেশে জীবনধারণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠে, তাহা সমস্তই অতীতের ব্যাপার হইয়া যাইবে; সমস্ত পৃথিবীর জল-বায়ু কোমল ও সমভাবাপন্ন হইবে; নগরগুলি তাহাদের বিষাক্ত, ধূমাকীর্ণ বাষ্প দ্বারা বায়ুমণ্ডলকে আর কলুষিত করিবে না। এমন কি, বাহ্যিক, ভৌতিকভাবেও "এক অভিনব আকাশ, এক অভিনব জগতের" সৃষ্টি হইবে।

প্রতিশ্রুত মহামানবের আগমন-পদ্ধতি

যুগের শেষে প্রতিশ্রুত মহামানবের আবির্ভাব সম্বন্ধে যীশুখৃষ্ট বলিতেছেন :—

"এবং তাহারা দেখিবে, মানবপুত্র আকাশের মেঘরাশি বিদীর্ণ করিয়া পরমশক্তি ও বিরাট প্রভায় ভূষিত হইয়া আসিতেছেন। আর, তিনি মহা তুরী-ধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন * * তিনি সেই সময়ে তাঁহার প্রভার সিংহাসনে উপবেশন করিবেন এবং তাঁহার সমক্ষে সকল জাতিকে একত্রিত করা হইবে; পরে তিনি একজন হইতে অপরকে পৃথক করিবেন, যেমন পালরক্ষক ছাগ হইতে মেষ পৃথক করে।"—(মথি, ২৪-২৬)

উপরোক্ত বাক্য এবং তাদৃশ অপর বাক্যাবলী সম্বন্ধে বাহাউল্লা' ঈকান্ গ্রন্থে বলিতেছেন :—

" 'আকাশ' শব্দের তাৎপর্য্যার্থ, সেই উচ্চ মর্য্যাদা ও মাহাত্ম্যের পদ, যাহা পূর্ণ অবতার, শাশ্বত পুরুষগণের বৈশিষ্ট্য। যদিও এই সমস্ত প্রাচীন

অস্তিত্ব বাহ্যতঃ মাতৃজঠর হইতে আবির্ভূত হয়েন, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা পরম-আদেশের আকাশ হইতে অবতরণ করেন; এবং যদিও তাঁহারা ধরাপৃষ্ঠে অবস্থিতি করেন, তথাপি তাৎপর্য্যের পালঙ্কে বিশ্রাম করেন এবং ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ-কালেও পরম-সান্নিধ্যের আকাশ-মণ্ডলে উড্ডীয়মান্ থাকেন। পদ-সঞ্চালন ব্যতীত তাঁহারা আত্মা-দেশে পরিভ্রমণ করেন এবং পক্ষ বিনা একত্বের উচ্চ-শৃঙ্গে উড়িতে থাকেন। * * *

" 'মেঘ' শব্দটি মানবের অহংবুদ্ধি ও আত্মাভিলাষের বিপরীত সকল বস্তুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে: 'সুতরাং, যখনি কোনো অবতার তোমাদের আত্মবাসনার বিপরীত বস্তু সঙ্গে লইয়া তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয়, তোমরা গর্ব্বসহকারে তাহাকে প্রত্যাখ্যান কর, অনেককে প্রতারণার অপরাধে অপরাধী কর এবং অপর সকলকে হত্যা কর' (কোরাণ, সুঃ ২)। বিধি-নিষেধ, অনুশাসন আইনের পরিবর্ত্তন, প্রচলিত অনুষ্ঠানাদির পরিবর্জ্জন, অবিশ্বাসী বিদ্বান্ ব্যক্তির উপর বিশ্বাসী সাধারণ ব্যক্তির প্রাধান্যতা, এইগুলিও তাদৃশ মেঘ। এইরূপ আরও,—যেমন মানবীয় সঙ্কীর্ণতা অনুযায়ী, অর্থাৎ পান, ভোজন, দারিদ্র্য, ঐশ্বর্য্য, উন্নতি, অবনতি, নিদ্রা, জাগরণ ইত্যাদির নিয়মাধীন থাকিয়া, সাধারণ মানবরূপে শাশ্বত সৌন্দর্য্যের প্রকাশ,—যাহা জনসাধারণকে সংশয়ের আবর্ত্তে নিক্ষেপ করে এবং অবতারের উপর বিশ্বাস-স্থাপনে বাধা প্রদান করে।

"মেঘ যেমন প্রাকৃতিক সূর্য্য-দর্শনে মানব-চক্ষুর প্রতিবন্ধক হয়, তেমনি উপরোক্ত অবস্থাসমূহ জনসাধারণকে সেই আদর্শ সূর্য্যের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে। যেমন পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে: 'কাফেরগণ (অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাসীগণ) বলিয়াছে, ইহা কি প্রকারের অবতার, যে আহার করিয়া থাকে এবং আমাদের ন্যায় রাস্তা-ঘাটে চলা-ফেরা করে।

ফেরেস্তা (স্বর্গীয় দূত) কেন পাঠান হয় নাই, যে ইহার সহিত তুরী-ধ্বনি করিতে থাকিবে' (কোরাণ সুরা)। কেননা, বাহ্যিক দারিদ্র্য, দুর্দ্দশা অবতারগণের মধ্যে দেখা যাইত,—তাঁহারা শারীরিক ও স্বভাবের প্রয়োজনীয় বস্তু অর্থাৎ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, ব্যাধি, দৈব-দুর্ঘটনার অধীন ছিলেন। এই কারণে, জনসাধারণ সংশয় ও অবিশ্বাসের 'শাহারা'তে এবং কল্পনা ও দ্বিধার মরুভূমিতে বিহ্বল হইয়া থাকিত,—আশ্চর্য্য মনে করিয়া, 'কিরূপে এক ব্যক্তি ঈশ্বরের সান্নিধ্য হইতে আসিতে পারে, পৃথিবীর সকলের উপর প্রভুত্বের দাবী করিতে পারে, আপনাকে সমগ্র অস্তিত্বের সৃষ্টির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে, * * * অথচ এইরূপ সামান্য বিষয়ের জন্য উৎপীড়িত হইয়া থাকে?' কেননা, ইহা শোনা যায়, প্রত্যেক অবতার এবং তাঁহাদের সঙ্গীগণ কতই না দুর্দ্দশা— দারিদ্র্য, রোগ-শোক, অপমান সহ্য করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অনুগামিগণের মস্তক কতই না উপহার-স্বরূপ নগরে নগরে প্রেরিত হইয়াছিল; তাঁহারা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-সম্পাদনে কতই না বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই ধর্ম্মের শত্রু হস্তে কতই না নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন—এবং ইহা এই পর্য্যন্ত যে শত্রুগণের যাহা মনে লইত তাহাই তাঁহাদের প্রতি প্রয়োগ করিত। * * *

"পরম পরাক্রমের প্রভু এই সকল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা পাপাত্মাগণের প্রতিকূল এবং জনসাধারণের বাসনার বিপরীত। ইহা এমন এক কষ্টিপাথর, যাহার দ্বারা ঈশ্বর তাঁহার ভৃত্যগণকে যাচাই করিয়া থাকেন এবং অধার্ম্মিক হইতে ধার্ম্মিককে, অবিশ্বাসী হইতে বিশ্বাসীকে পৃথক করেন। * * *

"'এবং তাঁহার স্বর্গীয় দূত পাঠাইবেন * * *'— এস্থলে স্বর্গীয় দূতের তাৎপর্য্য, ঐ সমস্ত আত্মা যাঁহারা আধ্যাত্মিক শক্তিবলে স্বর্গীয়

প্রেমের অগ্নি-দাহনে মানবীয় স্বভাব ভস্মীভূত করিয়াছেন এবং দেবদূত ও অত্যুন্নত পুরুষদিগের বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। * * *

"যীশুখৃষ্টে বিশ্বাসীগণ এই সমস্ত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিল না, এই কারণে যে তাহারা ও তাহাদের পুরোহিতগণ যেরূপ বুঝিয়াছিল, তদনুযায়ী এই সমস্ত লক্ষণ বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল না; তাহারা সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত পুণ্য অবতারগণকে বিশ্বাস করে নাই। সুতরাং পবিত্র দান-উপহার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে; ঐশ্বরিক বাক্যাবলীর অলৌকিক শক্তি হইতে প্রচ্ছাদিত রহিয়াছে। এই পুনরুত্থানের দিনে ইহাই ত জনসাধারণের অবস্থা। এমন কি, তাহারা এই কথাও বুঝিতে পারে নাই যে, যদি কোনো যুগে অবতার-আবির্ভাবের লক্ষণসমূহ যেমন পুস্তকে বর্ণিত আছে, তদনুরূপ প্রত্যক্ষ জগতে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে কেই বা আপত্তি কি অস্বীকার করিতে সাহস করিতে পারিত। এতদ্ব্যতীত ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক, পাপী ও পুণ্যবানের মধ্যে কি প্রকারে পার্থক্য করা যাইতে পারিত। তোমরা মনোযোগ দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি 'গস্‌পেলে' লিখিত বর্ণনা-অনুযায়ী লক্ষণ-সমূহ বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পাইত এবং দেবদূতগণ মরিয়মের পুত্র যীশুর সহিত একটি মেঘে করিয়া প্রকাশ্য আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে কাহার কি সাধ্য ছিল তাঁহাকে অস্বীকার, অগ্রাহ্য কি প্রত্যাখ্যান করে? বরং, ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে আচম্বিতে এমন এক ব্যাকুলতার সৃষ্টি হইয়া যাইত, যে স্বীকার বা অস্বীকার করা দূরের কথা, কাহারো মুখ হইতে একটি বাক্যও নিঃসৃত হইত না।"

(ঈকান্ গ্রন্থ, পৃঃ ৪৪—৫৮)

উপরোক্ত ব্যাখ্যা হইতে ইহা সাব্যস্ত হইল যে মানবপুত্র মানবরূপেই আসিবেন, নারীর গর্ভ হইতে জন্মলাভ করিবেন, দরিদ্র, অশিক্ষিত ও

উৎপীড়িত হইবেন। জগতের প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। তাঁহার আবির্ভাবের এই পদ্ধতিই যথার্থ কষ্টিপাথর,—যাহার দ্বারা তিনি জগতের অধিবাসিগণকে যাচাই করিয়া ল'ন এবং এক হইতে অপরকে পৃথক করেন, যেমন পালরক্ষক ছাগ হইতে মেষ পৃথক করে। যাহাদের আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহারা এই সমস্ত মেঘের মধ্য দিয়া দেখিতে পায় এবং ঈশ্বরের সেই পরম শক্তি ও বিরাট প্রভার মধ্যে আনন্দে বিভোর হইয়া থাকে—যাহা প্রকাশ করিবার জন্য তিনি আসিয়া থাকেন; কিন্তু যাহাদের অন্তর-চক্ষু কুসংস্কার ও পাপে ঢাকিয়া গিয়াছে তাহারা কেবলমাত্র ঐ কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশিকেই দেখিতে পায় এবং পুণ্য আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া অন্ধকারে হাতড়াইতে থাকে।

"দেখ, আমি আপন দূতকে প্রেরণ করিব, সে আমার অগ্রে পথ প্রস্তুত করিবে; এবং তোমরা যে প্রভুর অন্বেষণ করিতেছ, তিনি অকস্মাৎ আপন মন্দিরে উপস্থিত হইবেন; এমন কি, অঙ্গীকারের বার্ত্তাবাহকও সমাগত হইবেন—যাঁহার উপরে তোমরা সন্তুষ্ট * * *। কিন্তু তাঁহার আগমনের দিন কে সহ্য করিতে পারিবে, আর তিনি উপস্থিত হইলে কে দাঁড়াইতে পারিবে? কেননা, তিনি স্বর্ণকারের অগ্নিতুল্য ও রজকের ক্ষারতুল্য। * * * কারণ, দেখ, সেই দিন আসিতেছে, তাহা হাপরের ন্যায় জ্বলিবে, এবং দর্পী ও দুষ্টাচারীরা সকলে খড়ের ন্যায় হইবে; * * * কিন্তু তোমরা যে আমার নাম ভয় করিয়া থাক, তোমাদের প্রতি ধার্ম্মিকতা-সূর্য্য রোগারোগ্যকারী পক্ষ সহকারে উদিত হইবেন।"—(মালাখি, ৩-৪)

মন্তব্য ঃ— ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্‌যাপন ব্যাপার এত সুবিস্তৃত যে ইহার সমস্ত কথা বিশদ করিয়া লিখিতে হইলে কয়েক খণ্ড গ্রন্থের প্রয়োজন

হইবে। একটি অধ্যায়ের সীমার মধ্যে যাহা করা যাইতে পারে, তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যাবলীর মূল সূত্রটি নির্দ্দেশ করা ব্যতীত আর কিছু নহে। দানিয়েল এবং সেণ্ট জ'ন কর্ত্তৃক প্রকটিত সত্য-দর্শনের বিস্তারিত বর্ণনা স্পর্শ করাও সম্ভব হইল না। যদি পাঠকবর্গ ঐ সমস্ত বর্ণনা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে "কতিপয় প্রশ্নের উত্তর' নামক পুস্তকখানি পাঠ করিবেন, তাহাতে ভবিষ্যদ্বাণীর কয়েক অধ্যায়ের সমালোচনা করা হইয়াছে। "ঈকান্" গ্রন্থে, "বাহাই প্রমাণ" নামক পুস্তকে এবং বাহাউল্লা' ও আব্দুল্‌বাহার বহু ফলকলিপিতে ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্‌যাপন সম্বন্ধে সবিশেষ বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

-: * :-

বাহাউল্লা' এবং আব্দুল্‌বাহার ভবিষ্যদ্বাণী

"আর, তুমি যদি মনে মনে বল, পরম প্রভু যে বাক্য বলেন নাই, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? (তবে শুন,) পরম প্রভুর নাম করিয়া যখন কোনো ভবিষ্যদ্বাদী পুরুষ কোনো বিষয়ে কথা বলেন, আর যদি সে কথা মতে ঘটনা না ঘটে বা তাহার ফল উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহা সেই ভবিষ্যদ্বাদী পুরুষ কর্ত্তৃক ব্যক্তিগত, উদ্ধতভাবে বলা হইয়াছিল, তুমি তাহার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হইও না।"— (ডিউট, ৪৩, ২২)

ঈশ্বরের বাক্যের সৃজনশক্তি

একমাত্র ঈশ্বরই যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন, এবং ঈশ্বরের অবতারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, তাঁহার বাক্যের সৃজনশক্তি অর্থাৎ মানবের সর্ব্বপ্রকার অবস্থার রূপান্তর ও পরিবর্ত্তন করিবার এবং তাহাদের বিরুদ্ধাচরণের উপর জয়ী হইবার ক্ষমতা। অবতারগণের মধ্যস্থতায় ঈশ্বর আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন; তাঁহাদের বাক্যের আশু বা গৌণ সিদ্ধিই তাঁহাদের অবতারত্বের দাবী ও তাঁহাদের ঐশ্বরিক প্রেরণা-প্রাপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুস্পষ্ট প্রমাণ।

"কেননা, আকাশ হইতে যেমন বৃষ্টি ও তুষার নামিয়া আসে

আর সেখানে ফিরিয়া যায় না, কিন্তু ভূমিকে আর্দ্র করিয়া অঙ্কুর ও ফল উৎপাদন করিবার শক্তি প্রদান করে, যেন 'বপন-কারীকে বীজ ও ভক্ষককে ভক্ষ্য দিতে পারে,-তদ্রূপ আমার মুখ-নিঃসৃত বাক্যও হইবে; তাহা নিষ্ফল হইয়া আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহা সম্পন্ন করিবে, এবং যে জন্য আমি তাহা প্রেরণ করি, তাহাতে ইহা সফল হইবে।"—(য়িশাইয়া ৫, ১০—১১)

জ'ন দি ব্যাপটিষ্টের শিষ্যগণ যখন যীশুর নিকটে এই প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হইল: "তুমি কি সেই ব্যক্তি যাহার আসিবার কথা ছিল, অথবা আমরা কি অপর এক ব্যক্তির জন্য প্রতীক্ষা করিব?" যীশুখৃষ্ট আপন বাক্যের ব্যাপ্তির দিকে ইঙ্গিত করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন:—

"তোমরা যাও, যাহা শুনিতেছ ও দেখিতেছ, তাহার সংবাদ জ'নকে দেও; অন্ধেরা দেখিতে পাইতেছে ও খঞ্জেরা চলিতেছে, কুষ্টীরা শুচীকৃত হইতেছে ও বধিরেরা শুনিতেছে, এবং মৃতেরা উত্থিত হইতেছে ও দরিদ্রের নিকটে সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে; আর ধন্য সে ব্যক্তি, যে আমাতে অসন্তোষের কারণ না পায়।"—(মথি ১১, ৪-৬)

এখন, আমরা দেখিব, এই সৃজন-শক্তি, যাহা ঈশ্বরের বাক্যের বিশেষত্ব, তাহা বাহাউল্লা'র বাক্যে আছে কিনা। বাহাউল্লা' আদেশ করিয়াছিলেন, সুরাপান সম্যকরূপে বর্জ্জন করিতে হইবে, তখন হইতেই সংযম-আন্দোলন পৃথিবীর সর্ব্বত্র অপূর্ব্বরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া চলিয়াছে। মদ্য-ব্যবসায়ে ন্যস্ত এবং অন্য প্রকারের সার্থকতা এখনও সাতিশয় শক্তিশালী, কিন্তু সংযমের দুর্নিবার অগ্রগতির সম্মুখে তাহা পতনোন্মুখ ও টলটলায়মান।

বাহাউল্লা' প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র নির্ব্বাচন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন হইতে এক এক করিয়া সকল দেশের ব্যবস্থাপক

ক্ষমতা জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির হস্ত উত্তরোত্তর চলিয়া যাইতেছে; সামরিক স্বেচ্ছাতান্ত্রিক রাজত্বগুলি এক অপরূপ রূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাদের পুনরাভিনয়ের সামান্য আশাও এখন আর পরিলক্ষিত হয় না।

বাহাউল্লা' আদেশ করিয়াছিলেন, সম্পদ এবং দারিদ্র্য, উভয়ের সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইবে, তখন হইতে সর্ব্বদেশে মানবের জীবনধারণের উপায়স্বরূপ পারিশ্রমিকের সীমা-নির্দ্দেশক এবং সম্পত্তির আয়ের উপর ক্রমিক ট্যাক্স বা কর নিরুপক আইন প্রণয়ন করা হইতেছে।

বাহাউল্লা' আদেশ করিয়াছিলেন, সর্ব্ব-প্রকারের অর্থ-নৈতিক দাসত্ব দূর করিতে হইবে, তখন হইতে শ্রমিকের মুক্তি এবং শ্রম-শিল্পের অংশীদাররূপে তাহাদের উন্নতি স্থিরীকৃত ও অপ্রতিরোধ্য হইতেছে।

বাহাউল্লা' আদেশ করিয়াছিলেন, নর-নারী উভয়েই সমান অধিকার, সমান সুযোগ ভোগ করিবে, তখন হইতেই নারীজাতির যুগযুগান্তরের শৃঙ্খলগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ছিন্ন হইতেছে, এবং তাহারা দিন দিন পুরুষের অংশীদাররূপে তাহাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হইতেছে।

বাহাউল্লা' আদেশ করিয়াছিলেন, সার্ব্বজনীন ভাষা অবলম্বন করিতে হইবে; ইতিমধ্যে "এস্‌পেরাণ্টো" ভাষা সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং তাহা সত্বর সার্ব্বজনীন হইতেছে।

বাহাউল্লা' আদেশ করিয়াছিলেন, জাতিসমূহের সার্ব্বজনীন মহাসভা গঠন করিতে হইবে, তখন হইতে ঐরূপ মহাসভা সংস্থাপনের পক্ষে বিস্ময়কর কার্য্যকরী উন্নতি হইতেছে, এবং তাহার উপকারিতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে জনসাধারণের আস্থাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

বাহাউল্লা' আদেশ করিয়াছিলেন, আন্তর্জাতিক সালিশী বিচারালয়ের

দ্বারা জাতিসমূহের বিবাদ মীমাংসা করিতে হইবে, তখন হইতে পুনঃ পুনঃ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করা হইতেছে, এবং তাহার কর্ত্তৃত্ব-ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত করা হইতেছে।

তিনি আদেশ করিয়াছিলেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি একমত হইয়া একই সময়ে সমরোপকরণ হ্রাস করিতে হইবে, তখন হইতে সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

তিনি আদেশ করিয়াছিলেন, শিক্ষা সার্ব্বজনীন করিতে হইবে, তখন হইতে এক এক করিয়া সর্ব্বদেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা-প্রণালী গৃহীত হইতেছে এবং দিন দিন তাহার উন্নতি বিধান করা হইতেছে।

এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে, এবং তাহাদের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে। আমরা এই কথা দাবী করিয়া বলিতে পারি যে বাহাউল্লা'র প্রত্যেক আদেশই সফল হইয়াছে, তাঁহার একটি আদেশও নিষ্ফল হইয়া থাকে নাই।

এই সমস্ত কারণে ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয় যে বাহাউল্লা' সত্যসত্যই ঈশ্বরের ব্যাপ্তিশীল আদেশের সত্য প্রকাশক ও সত্য প্রচারক।

এখন আমি বাহাউল্লা'র প্রধান প্রধান ভবিষ্যদ্বাণীর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যাহা উপরোক্ত বাক্যের নিতান্ত সমর্থক প্রমাণ হইবে, এবং দেখাইতেছি যে তাহা কিরূপে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে ও হইতেছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূর্ণ হইবার অনেক পূর্ব্বে তাহা মুদ্রিত ও সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। পৃথিবীর রাজন্যবর্গের নিকটে তিনি যে সমস্ত পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকাংশ অবতীর্ণ হইয়াছিল। অন্যান্য ফলকলিপির সহিত এইগুলিকে একত্রিত করিয়া "সুরাতুল্ হায়্কল্" নামক গ্রন্থে বোম্বাই হইতে পঞ্চাশ

বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত করা হয়। এই গ্রন্থের কয়েকটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। আব্দুল্‌বাহারও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমরা এইখানে বলিব।

তৃতীয় নেপোলিয়ন

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বাহাউল্লা' তৃতীয় নেপোলিয়নের নিকটে একখানি লিপি প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি তাঁহার যুদ্ধলিপ্সার তীব্র নিন্দা করেন, ও বাহাউল্লা'র একখানি পূর্ব্বেলিখিত পত্রের প্রতি তিনি যে অবজ্ঞা এবং ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়নকে তিরস্কার করেন। সেই পত্রে নিম্নে উদ্ধৃত তীব্র সাবধান-বাক্য লিপিবদ্ধ আছে :—

"তোমার কার্য্য-কলাপে তোমার রাজত্বে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, তোমার নিকট হইতে শাসন-দণ্ড অপরের হস্তে চলিয়া যাইবে এবং পরিশেষে তুমি বুঝিতে পারিবে, তোমার কি ঘোরতর, গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। তুমি যদি এই ধর্ম্মের সাহায্যার্থে উঠিয়া পড়িয়া না লাগ, তুমি যদি এই ঋজু-পথে পরমাত্মার অনুসরণ না কর, তাহা হইলে দারুণ বিপ্লবে অদূরবর্ত্তী প্রদেশের সমগ্র জনসাধারণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিবে। তোমার বিভব, তোমার ঐশ্বর্য্যের মোহে তুমি কি স্বাধিকারপ্রমত্ত হইয়াছ? আমার চিরস্থায়ী জীবনের দিব্য করিয়া বলিতেছি,—তোমার এই দম্ভ, তোমার এই প্রমত্ততা, তোমার এই দর্প কিছুকালের মধ্যেই ধূলিসাৎ হইবে। আমি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি, অসম্মান, শাস্তি তোমাকে অনুসরণ করিতেছে, অথচ এখনও তুমি তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছ না।"

বলা বাহুল্য, তৃতীয় নেপোলিয়ন এই সতর্কতার বাণী অগ্রাহ্য করিলেন; কারণ, তখন তিনি তাঁহার শক্তির সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত। তাহার পরের বৎসরে, তিনি প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার সৈন্যদল অনায়াসেই প্রুসিয়ার রাজধানী বার্লিন অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু বাহাউল্লা'র ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল, তিনি পর পর সারব্রুক, ভাইসেনবুর্গ ও মেৎস্‌এ পরাজিত হইলেন, পরিশেষে সিডানের সর্ব্বধ্বংসী পরাভবে বিধ্বস্ত হইলেন। তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় প্রুসিয়াতে ধরিয়া লইয়া গেল; তাহার দুই বৎসর পরে তিনি ইংলণ্ডে অতি শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

জার্ম্মানী

বাহাউল্লা' তাহার পর নেপোলিয়নের বিজয়ী শত্রুদিগের প্রতিও সতর্কীকরণ-বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু যাহাদিগের সতর্কীকরণের জন্য তিনি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার কথা শুনিল না, তাহার ফলভোগ তাহাদিগকে অতি ভীষণ-ভাবে করিতে হইল। আক্‌দাস্ গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছিল, যখন বাহাউল্লা' আদ্রিয়ানোপলে ছিলেন; যখন তিনি আক্কাতে কারাবরুদ্ধ ছিলেন, তাহার প্রথমাংশে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। এই গ্রন্থে জার্ম্মান সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত বাণী লিপিবদ্ধ আছে:—

"হে বার্লিন-রাজ, * * * তোমা অপেক্ষা যে অধিকতর শক্তি-শালী, প্রতাপবান ছিল, সেই সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের কথা তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। সেই সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এক্ষণে কোথায়? তাহার রাজত্ব, তাহার শাসন-দণ্ড, সে সমস্তই বা এখন কোথায়? এই সমস্ত চিন্তা করিয়া তোমার মন স্থির কর, সতর্ক হও; তুমি আর

ঘুমাইয়া থাকিও না। সে ঈশ্বরের ফলকলিপি পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, যখন আমরা তাহাকে জানাইলাম, অত্যাচারীর সৈন্য হইতে আমাদের উপর কী কী ঘটিয়াছিল। অতঃপর চতুর্দ্দিক হইতে দারুণ অসম্মান তাহাকে ঘেরাও করিল; অবশেষে সে গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মৃত্তিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হে রাজন্! তাহার সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা কর এবং তোমার সদৃশ যাহারা তাহাদের সম্পর্কেও,—যাহারা দেশ দেশান্তর জয় করিয়াছিল, ঈশ্বরের ভৃত্যগণের উপর শাসন চালাইয়াছিল, এবং ঈশ্বর যাহাদিগকে উচ্চ অট্টালিকা হইতে নিম্ন প্রেতভূমিতে লইয়া গেলেন। সাবধান হও, এবং যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করে তাহাদের মধ্যে হও * * *

"হে রাইন নদীর তীরসমূহ! আমরা তোমাদিগকে রুধিররঞ্জিত দেখিতেছি, কারণ, প্রতিশোধের তরবারি তোমাদের উপরে নিষ্কাসিত করা হইয়াছে; তোমরা আর একবার অনুরূপভাবে রুধিররঞ্জিত হইবে। যদিও আজ বার্লিন মহানগরী বিপুল গৌরব ও ঐশ্বর্য্য-মদে বিভোর, তথাপি আমরা বার্লিনের করুণ বিলাপ শুনিতেছি।"

বিগত ১৯১৪ ও ১৯১৮ সালের য়ুরোপীয় মহাসমরে যখন জার্ম্মানগণ সর্ব্বত্রই বিজয়ী হইতেছিল, বিশেষরূপে যখন ১৯১৮ সালের বসন্তকালে তাহারা চড়াও হইয়া শেষ-আক্রমণ করিল, তখন পারস্য দেশে বাহাই ধর্ম্মের শত্রুগণ বাহাউল্লা'র ভবিষ্যদ্বাণী মূল্যহীন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য এই প্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়া উপহাস করিত। কিন্তু পরিশেষে, যখন বিজয়োদ্ধত জার্ম্মান বাহিনীর অগ্রগতি চতুর্দ্দিকে রুদ্ধ হইয়া গেল, প্রথমাংশের বিজয়, শেষাংশে ঘোরতর পরাজয়ে পরিণত হইল, তখন বাহাই ধর্ম্মের শত্রুগণ যে ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত

করিয়া বাহাউল্লা'র যশোরাশি মলিন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাই বাহাউল্লা'র যশোবৃদ্ধির কারণ হইল।

পারস্য

যখন ঘোরতর অত্যাচারী স্বেচ্ছাতান্ত্রিক রাজা মুজাফ্‌ফরুদ্দিন শাহ্‌ পারস্যের সিংহাসনে অপ্রতিহত প্রভাবে উপবিষ্ট হইয়া রাজত্ব করিতেছেন, তখন আক্‌দাস্‌ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই গ্রন্থে বাহাউল্লা' পারস্যের রাজধানী, তাঁহার জন্মভূমি, পুণ্যনগরী তেহেরাণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন :—

"হে 'ত্বা'এর দেশ (তেহেরাণ)! কোনো কারণেই তুমি শোকে মুহ্যমান হইও না, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তুমিই পৃথিবীর আনন্দবর্দ্ধনকারী মহাপুরুষের উদয়াচল। তাঁহার ইচ্ছা হইলে, তোমার সিংহাসনে এমন একজন ব্যক্তি উপবিষ্ট হইবেন, যিনি ন্যায়পরতা সহকারে রাজত্ব করিবেন এবং শার্দ্দূল-তাড়িত ঈশ্বরের মেষকুলকে পুনরায় একত্রিত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিবেন। তিনি বাস্তবিকই বাহাইদিগকে আনন্দ এবং হর্ষোৎফুল্লতা-সহকারে নিরীক্ষণ করিবেন, তাহাদের সঙ্গে তদনুরূপ ব্যবহার করিবেন। ঐ দেখ, তিনি ঈশ্বরের সমক্ষে মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ রত্ন বিশেষ। * * * আনন্দ ক'র, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তুমিই পরম-আলোকের উদয়াচল, কেননা ঈশ্বরের আবির্ভাব তোমার পুণ্যভূমিতেই সংঘটিত হইয়াছে। * * * শীঘ্রই তোমার আভ্যন্তরীণ অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইবে, শীঘ্রই বৈরাজ্যমূলক শাসনতন্ত্র তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বাস্তবিকই, তোমার ঈশ্বর জ্ঞানবান, তিনি সর্ব্ববস্তু পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার পর্য্যবেক্ষণে আস্থা রাখিও। নিশ্চয়ই, তিনি তাঁহার অনুগ্রহ-দৃষ্টি তোমা হইতে ফিরাইবেন

না। শীঘ্রই বিশৃঙ্খলা ও তামসিক অবস্থা কাটিয়া গিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। 'আশ্চর্য্য-গ্রন্থে এইরূপই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

ইহার মধ্যেই পারস্য সেই বিশৃঙ্খল অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছে, পারস্যে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং যুগ-লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, পারস্যের সুদিন সন্নিকটবর্ত্তী।

তুরস্ক

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বাহাউল্লা' তুরস্ক-কারাগারে কারাবরুদ্ধ ছিলেন; সেখান হইতে তিনি তুরস্কের সোল্‌তান্‌ ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আলী পাশার নিকটে পত্র প্রেরণ করেন; তাহাতে তিনি দারুণ সতর্কীকরণ-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আক্কার সৈনিকাবাস হইতে, তিনি সোল্‌তান্‌কে লিখিয়াছিলেন:—

'তুমি মনে করিতেছ, তুমি মানব-জাতির মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাগ্রগণ্য; কিন্তু অচিরেই তোমার নাম পৃথিবীতে বিস্মৃত হইবে, তুমি দেখিতে পাইবে, তুমি নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ। তোমার মতানুসারে, পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনকারী এবং তাহার জীবনদাতা আমি রাজদ্রোহ অপরাধে সত্যসত্যই অপরাধী। কিন্তু নারীগণ, বালকগণ, অসহায় শিশুগণ কি অপরাধ করিয়াছে যে তাহাদিগকে তুমি তোমার ক্রোধবহ্নিতে দগ্ধ করিতেছ, তোমার ঘৃণা, তোমার অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিতেছ, তাহাদিগকে অশেষ কষ্টভোগ করাইতেছ? তুমি এমন কতকগুলি ব্যক্তিকে অকারণে নির্য্যাতিত করিয়াছ, যাহারা তোমার দেশে তোমার বিরুদ্ধে কোনোরূপ আন্দোলনে যোগ দেয় নাই, যাহারা শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনোরূপ বিপ্লব-প্রচেষ্টা করে নাই; বরঞ্চ তাহারা দিবারাত্রি শান্তভাবে ঈশ্বরের নাম করিয়াছে, এই মাত্র। তুমি তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি

কাড়িয়া লইয়াছ, তাঁহাদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছ। * * * ঈশ্বরের সমক্ষে, তোমার সমস্ত বিভব, তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, তোমার রাজত্ব, তোমার অপ্রমেয় প্রতাপ হইতে এক মুষ্টি ধূলিও শ্লাঘনীয়; পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে, তিনি তোমাকে মরুভূমির বালুকার মত ফুৎকারে উড়াইয়া দিবেন। শীঘ্রই তাঁহার ক্রোধ-বহ্নি তোমাকে দগ্ধ করিবে, তোমার রাজত্বে বিপ্লব দেখা দিবে, তোমার শাসিত দেশ খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়া পড়িবে। তখন তুমি শোকাতুর হইয়া ক্রন্দন করিবে, কিন্তু কুত্রাপি তুমি সাহায্য বা আশ্রয় পাইবে না। * * * সাবধান থাকিও, কারণ ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার ক্রোধ-বহ্নি তোমাকে দগ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, শীঘ্রই তুমি দেখিতে পাইবে 'আদেশের' লেখনী-মুখে কি ভাষা লিখিত আছে।"—(পশ্চিমের তারকা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩)

তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী আলী পাশার নিকটে তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"হে 'রই'স' (প্রধান-ব্যক্তি), তুমি এমন কার্য্য করিয়াছ, যাহা সর্ব্বোচ্চ স্বর্গে ঈশ্বরের প্রেরিত-পুরুষ মোহাম্মদকে কাঁদাইতেছে। পৃথিবী তোমাকে এতদূর গর্ব্বিত করিয়াছে যে তুমি সেই পবিত্র মুখমণ্ডল হইতে মুখ ফিরাইয়াছ, যাহার আলোক-ছটায় স্বর্গীয় সভার জনমণ্ডলী উদ্ভাসিত হইয়াছে। অচিরে তুমি আপনাকে প্রত্যক্ষ ক্ষতিতে দেখিতে পাইবে। তুমি আমার অনিষ্টসাধনার্থে পারস্য-রাজের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলে, অথচ আমি তোমার নিকটে আসিয়াছিলাম সেই বিরাট, সর্ব্বশক্তিমানের উদয়াচল হইতে, এমন এক 'আদেশ' লইয়া,— যাহা ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তিদিগের চক্ষু শীতল করিতেছে * * *

"তুমি কি মনে করিয়াছিলে, ঈশ্বর যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন, তাহা তুমি নিবাইতে পারিবে? আমি ঈশ্বরের সত্য-আত্মার দিব্য

করিয়া বলিতেছি, না, —তাহা তুমি কখনও নিবাইতে পারিবে না; বরং তুমি যাহা করিয়াছ তাহার কারণে সেই বহ্নি আরও অধিক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অচিরে ইহা সমগ্র পৃথিবী ও তাহার সমস্ত অধিবাসিগণকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে। * * * অনতিবিলম্বে রহস্যভূমি (আদ্রিয়ানোপল্) ও অন্যান্য সমস্ত প্রদেশ পরিবর্ত্তিত হইবে এবং তাহা সোল্তানের হস্ত হইতে চলিয়া যাইবে, তাহাতে বিপ্লব উপস্থিত হইবে, ক্রন্দনের রোল পড়িয়া যাইবে, অপকৃষ্টতা দেখা দিবে, সকল বিষয়-ব্যাপারে উলট-পালট হইবে, কেননা অত্যাচারীর সঙ্ঘ হইতে এই সমস্ত বন্দীগণের (বাহাউল্লা' ও তাঁহার সঙ্গীগণের) প্রতি যে অন্যায়-অত্যাচার করা হইয়াছে তাহার প্রতিদানস্বরূপ এই সমস্তই ঘটিবে। শাসন-দণ্ড পরিবর্ত্তিত হইবে, দেশের অবস্থা এতই উৎকট হইবে যে বালুকারাশি জনমানবশূন্য পর্ব্বতোপরি বিলাপ করিবে, বৃক্ষরাজি গিরিশৃঙ্গে অশ্রুপাত করিবে, সকল বস্তু হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবে, জনসাধারণকে নিদারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখা যাইবে * * *

"এমতে সেই সর্ব্বজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ-শিল্পী এই বিষয়ে স্থির-সঙ্কল্প করিয়াছেন, যাঁহার আদেশের সম্মুখে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের সেনাদল তিষ্টিতে পারে না, রাজ্যাধিপতি, শাসনকর্ত্তাগণও যাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে পারে না। দুঃখ-ক্লেশ এই বর্ত্তিকার তৈল-স্বরূপ, যাহার দ্বারা ইহার আলোক বর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়,—যদি তোমরা 'যাহারা জানে' তাহাদের মধ্যে হইতে! অত্যাচারিগণের প্রতিকুলতা বাস্তবিকই এই ব্যাপারের অগ্রদূত, তাহাদের দ্বারাই ঈশ্বরের প্রকাশ এবং ঈশ্বরের ধর্ম্ম পৃথিবীবাসিগণের মধ্যে অত্যধিকভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।"

তিনি আক্‌দাস্ গ্রন্থে বলিতেছেন ঃ—

"দুইটি সাগরতটে অবস্থিত, হে বিন্দু (অর্থাৎ কনষ্টান্টিনোপল্) !

অবিচারের সিংহাসন তোমাতে স্থাপিত করা হইয়াছে, এবং তোমার মধ্যে এরূপ বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত করা হইয়াছে যে তজ্জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয়দূতমণ্ডলী এবং যাহারা অত্যুচ্চ সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, তাহারা সকলেই বিলাপ করিতেছে। আমরা দেখিতেছি, তোমাতে জ্ঞানীগণের উপর মূঢ়ের শাসন চলিতেছে এবং অন্ধকার আলোকের উপর অহঙ্কার করিতেছে; নিশ্চয় তুমি প্রত্যক্ষ দাম্ভিকতায় অবস্থান করিতেছ। তোমার বাহ্য আড়ম্বর কি তোমাকে গর্ব্বী করিয়াছে? সৃষ্টি-জগতের প্রভুর দিব্য করিয়া বলিতেছি, শীঘ্রই তোমাকে ধ্বংস ও বিনাশ করা হইবে, তোমার কন্যাগণ, তোমার বিধবা পত্নীগণ এবং ঐ সমস্ত জনগণ যাহারা তোমার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা সকলেই আর্ত্তনাদ করিবে। এমতে সর্ব্বজ্ঞ, পরিণামদর্শী পরমেশ্বর তোমাকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিতেছেন।"

এই সতর্কীকরণবাণী অবতীর্ণ হওয়ার পর হইতে যে সমস্ত বিপর্য্যয় এক সময়ে অতি প্রতাপশালী রাজ্যের উপরে উপর্য্যুপরি ঘটিয়াছে, তাহা হইতে এই ভবিষ্যদ্বাণীর বিশদ ব্যাখ্যা বুঝিতে পারা যায়।

আমেরিকা

আক্‌দাস্ গ্রন্থ আজ হইতে একষষ্টি বৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল; তাহাতে আমেরিকাকে এই বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে:—

"হে আমেরিকার শাসকগণ, তাহার প্রজাতন্ত্র শাসনের গভর্ণর ও প্রেসিডেণ্টগণ! * * * তোমরা ঊর্দ্ধ উদয়াচল হইতে উচ্চারিত আহ্বান শুন: কেহই ঈশ্বর নহে, কিন্তু আমি বক্তার ও সর্ব্বজ্ঞ। ন্যায় বিচারের হস্তের দ্বারা এই ভগ্ন অঙ্গ বন্ধন কর এবং সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা

প্রভু, তোমার ঈশ্বরের আদেশের দণ্ড সহকারে অত্যাচারীর সবল অঙ্গ ভগ্ন কর।"

আব্‌দুল্‌বাহা আমেরিকাতে এবং অন্যত্র বক্তৃতা প্রদান কালে নিজের দৃঢ়বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন যে আন্তর্জাতিক মহা-শান্তির পতাকা প্রথমে আমেরিকাতে উড্ডীন করা যাইবে; তিনি বলিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার আশা, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে, ওহাইও, সিন্‌সিনাটিতে বক্তৃতা দিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন :—

"আমেরিকা অতি গৌরবময় দেশ, পৃথিবীতে শান্তির অগ্রদুত, তাহার জ্যোতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিকিরিত হইয়া থাকে। অন্যান্য দেশ ও জাতিগণ আমেরিকার মত সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র-রহিত নহে। সুতরাং তাহাদের দ্বারা সার্ব্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমেরিকা অন্যান্য সমস্ত দেশের সঙ্গে সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ; ইহাই তাহার আন্তর্জাতিক শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের পতাকা উত্তোলন করিবার উপযুক্ততা। যখন আমেরিকা আন্তর্জাতিক শান্তির পতাকা উত্তোলন করিবে, তখন পৃথিবীর অপর সমস্ত দেশ বলিয়া উঠিবে: 'হাঁ, আমরা সম্মত আছি'। বাহাউল্লা'র উপদেশাবলী—যাহা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল, পৃথিবীর জাতিসমূহ তাহা গ্রহণ করিবে। তিনি তাঁহার প্রেরিত পত্রে পৃথিবীর পার্লেমেণ্টগুলিকে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ব-পার্লেমেণ্টে তাহাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীগণকে প্রেরণ করিতে বলিয়াছিলেন,—যাহা জাতিসমূহের সর্ব্বপ্রকার বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিয়া শান্তি স্থাপন করিবে * * * তখনই মানবজাতির সেই বিশ্ব-পার্লেমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহার সম্বন্ধে অবতারগণ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।"— (পশ্চিমের তারকা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮১)

আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে বাহাউল্লা' এবং আব্দুল্‌বাহার উপদেশাবলী যত অধিক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে অদ্যাপি তদ্রূপ গৃহীত হয় নাই। কিন্তু, জাতিসমূহকে আন্তর্জাতিক শান্তিতে আহ্বান করিবার যে কার্য্যভার আমেরিকার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, আমেরিকা এখন পর্য্যন্ত তাহা সম্যকরূপে নির্ব্বাহ করে নাই, এবং বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীগণ নিতান্ত আগ্রহসহকারে প্রতীক্ষা করিতেছে, ভবিষ্যতে কি হয় তাহা দেখিবার জন্য।

মহাসমর

বাহাউল্লা' এবং আব্দুল্‌বাহা উভয়েই (১৯১৪—১৯১৮) মহাসমরের কথা আশ্চর্য্যরূপ সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। কালিফোর্নিয়ার সাক্রামেণ্টো নামক স্থানে, ২৬শে অক্টোবর, ১৯১২ তারিখে আব্দুল্‌বাহা বলিয়াছিলেন ঃ—

'আজ, য়ুরোপ ভূখণ্ড শুদ্ধ আয়ুধাগার সদৃশ, বিদারণশীল বস্তুর গুদাম মাত্র,—যাহা সামান্য একটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের প্রতীক্ষা করিতেছে; একটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে সমগ্র য়ুরোপ প্রজ্বলিত হইতে পারে, বিশেষতঃ এই সময়, যখন বল্‌কান্ সমস্যা পৃথিবী সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে।"

আমেরিকা এবং য়ুরোপে প্রদত্ত অনেক বক্তৃতাতে তিনি এইরূপ সতর্কীকরণ-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কালিফোর্নিয়াতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন ঃ—

"সেণ্ট জ'নের 'প্রকাশিত বাক্যের' ষোড়শ অধ্যায়ে যে আরম্যাগেডন্ মহাসমরের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, আমরা তাহার একান্ত সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। এখন হইতে দুই বৎসর পরে ক্ষুদ্র একটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে সমগ্র য়ুরোপে আগুন ধরিবে।

"সামাজিক অশান্তি ও ধর্ম্মে অনাস্থাই আধ্যাত্মিক জাগরণের পূর্ব্বাবস্থা; এক্ষণে এই অবস্থাই জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান; দানিয়েল এবং সেণ্ট জ'নের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, ইহাতেই সমগ্র য়ুরোপে আগুন জ্বলিবে।

"১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই স্বেচ্ছাতান্ত্রিক রাজত্বগুলি বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে এবং রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রকম্পন পৃথিবীকে দোলাইয়া দিবে।"—(মিসেস্ করিন্নে ট্রু নামক মহিলা কর্ত্তৃক অনুলিখিত এবং আমেরিকার সিকাগো নগরের "দি নর্থ শোর রিভিউ" পত্রিকাতে ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ তারিখে প্রকাশিত)

মহাসমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন:—

"সভ্যজাতিগুলির এক মহাসমর সন্নিকটবর্ত্তী; এক ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে। পৃথিবী এক লোমহর্ষণ সংগ্রামের সম্মুখীন হইয়াছে। * * * লক্ষ লক্ষ লোকের বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রামের জন্য সজ্জিত করিয়া সীমান্তে রক্ষিত করা হইয়াছে। ভীষণ যুদ্ধের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করা হইতেছে। অতি সামান্য সংঘর্ষণে ধ্বংসের তাণ্ডব ক্রীড়ার সৃষ্টি হইবে, এবং এমন এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড হইয়া যাইবে, অতীত যুগে যাহার সাদৃশ্য মানব-ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় নাই।" —(হাইফাতে, আগষ্ট ৩, ১৯১৪,—পশ্চিমের তারকা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩)

মহাযুদ্ধের পরে নানাবিধ বিপর্য্যয়-সৃষ্টি

বাহাউল্লা' এবং আব্দুল্‌বাহা, উভয়েই এক ভীষণ সামাজিক বিপ্লবের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে অধর্ম্ম, মূর্খতা, সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার, ভ্রমাত্মক বিশ্বাসগুলিই এই নিদারুণ বিপত্তির কারণ

হইবে,—যাহা এখন পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। য়ুরোপের মহাসমর এই ভীষণ বিপ্লবের অন্যতম কারণ। নভেম্বর, ১৯১৯এ, যেই সময় বর্ত্তমান লিখকও উপস্থিত ছিল, আব্‌দুল্‌বাহা কথোপকথন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ঃ—

"আমি আশা করি, এই যুদ্ধের পরে জনসাধারণ জাগ্রত হইয়া বুঝিতে পারিবে যে ঈশ্বরের আদেশ মান্য না করিয়া জগতের ব্যাধি উপশম করিবার অন্য কোনো উপায় নাই। কারণ, এই মহাযুদ্ধের ফলে জাতির সঙ্গে জাতির, উপজাতির সঙ্গে উপজাতির, মানবের সঙ্গে মানবের ঘোরতর ঘৃণার ভাব দাঁড়াইয়া যাইবে, তাহা সহসা বিদূরিত হইবে না, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, জার্ম্মানগণ কখনও বিস্মৃত হইবে না, অষ্ট্রিয়ানগণ কখনও বিস্মৃত হইবে না, বুল্‌গেরিয়ানগণ কখনও ভুলিবে না, তুর্কীগণও কখনও ভুলিবে না। একদিক হইতে 'সোশ্যালিষ্ট'গণ কোলাহল করিতে থাকিবে, আর একদিক হইতে বল্‌শেভিকগণ ঝটিকাবর্ত্ত সৃষ্টি করিবে, সঙ্ঘবদ্ধ মজুরতন্ত্র অধিকার দাবী করিবে, আন্তর্জাতিক কলহ যুদ্ধ-বিগ্রহে পরিণত হইবে, ধর্ম্ম-বৈষম্য ও বর্ণ-বৈষম্য লইয়া ঘোরতর বিদ্বেষ সৃষ্টি হইবে। যাহা ঘটিবে, তাহা ত সুস্পষ্ট। এ সমস্তই ডিনামাইটের মত; একদিন সমস্ত মিলিয়া ফাটিয়া উঠিবে, ধ্বংসলীলার তাণ্ডব চলিতে লাগিবে,—যদি স্বর্গীয় উপদেশ অনুসারে সার্ব্বজনীন শান্তির পতাকা উড্ডীন করা না হয়।

"কিন্তু, স্বর্গীয় উপদেশ অনুযায়ী সার্ব্বজনীন শান্তির পতাকা একমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিবলেই উত্তোলন করা যাইতে পারে, পবিত্র পরমাত্মার শক্তিসাহায্যেই মানবজাতির একত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। রাজনৈতিকগণ যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাহাদের চেষ্টা সফল হইবে না।

কেননা, ঈশ্বরের সাহায্য, সহায়তা ব্যতিরেকে কেবল মাত্র মানব-শক্তিতে কোনো কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না।"

প্রঃ—"এই যুদ্ধের পরেই কি সার্ব্বজনীন শান্তির পতাকা উত্থোলন করা হইবে?

উঃ—"না, এখন নহে। আমরা যুদ্ধ দিয়া যুদ্ধ রহিত করিতে পারি না; কেননা ইহা রক্ত দ্বারা রক্তচিহ্ন ধৌত করার মত চেষ্টা মাত্র। পৃথিবীর জাতিসমূহ যুদ্ধে-নিরত কুক্কুটের মত; তাহারা ক্লান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে থাকে; ক্লান্ত হইলে স্থগিত করে, সন্ধি করিয়া লয়; ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করে।

"প্রঃ—মজুর-তন্ত্রের পৃথিবী-ব্যাপী আন্দোলনের ফল কি হইবে?

"উঃ—আন্দোলন ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতে থাকিবে। কিছুকাল মজুরি বাড়াইয়া দিয়া, খাটুনির ঘণ্টা কমাইয়া দিয়া মজুরদিগকে সন্তুষ্ট রাখা যাইতে পারে বটে; কিন্তু তাহাতে কোনো চিরস্থায়ী ফল লাভ হইবে না; কারণ, মজুরেরা যতই সুবিধা পাইবে, ততই তাহারা আরও অধিক সুবিধা খুঁজিবে, দাবী করিবে। পরিশেষে, তাহারা কলকারখানা দখল করিয়া বসিয়া মালিকদিগকে বলিবে—'আমরা বাৎসরিক তোমাদিগকে এত টাকা দিব, বা আমরা তোমাদিগকে প্রতিবৎসর লাভের এক দশমাংশ দিব।' অবস্থা ক্রমেই কষ্টদায়ক ও বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে। ধনিক ও শ্রমিক, উভয়েরই অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে, সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনে হ্রস্বতা দেখা দিবে।"

ইহার কিছুদিন পরে তিনি অপর এক আলাপ-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন :—

"বাহাউল্লা' পুনঃ পুনঃ বলিতেন, এমন এক সময় আসিবে যখন ধর্ম্মে অনাস্থা এবং তাহার আনুষঙ্গিক অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হইবে।

অনুপযুক্ত জনসাধারণকে অত্যধিক স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে এইরূপ হইবে; সর্ব্বসাধারণের স্বার্থরক্ষার্থে এবং অরাজকতা ও অশান্তি নিবারণার্থে দমন-নীতিমূলক শাসনতন্ত্র সাময়িকভাবে প্রবর্ত্তিত হইবে।

"ইহা ত এখন সুস্পষ্ট যে জাতিসমূহের প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ আত্ম-নির্দ্ধারণের এবং পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়াসী, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইহার উপযুক্ত নহে। অধর্ম্মই বর্ত্তমান জগতের প্রচলিত অবস্থা, যাহার অনিবার্য্য ফল, অশান্তি, অরাজকতা এবং অপরিসীম দৈন্যদশা। আমি বারংবার বলিয়া আসিতেছি, য়ুরোপীয় মহাসমরের পরে শান্তির প্রস্তাব-সমূহ ভোরের মিটমিটে আলোকের ন্যায়, তাহা কখনও সূর্য্যোদয় নহে।"

ঈশ্বরের রাজত্বের প্রতিষ্ঠা

কিন্তু, এই বিষম বিপত্তির সময়েই ঈশ্বরের ধর্ম্ম উন্নতি করিবে। জনসাধারণ তাহাদের ব্যক্তিগত কি সমষ্টিগত, জাতীয় কি সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সাধনে যখন বিপদ-আপদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে, তখন বাধ্য হইয়া তাহারা সেই প্রতিকারের দিকে ঝোঁকিয়া পড়িবে, যাহা "ঈশ্বরের বাক্য" উপস্থিত করিয়াছে। যতই তাহাদের দুঃখ-ক্লেশ, বিপদ-আপদ বাড়িতে থাকিবে, ততই তাহারা সেই একমাত্র প্রতিকারের উপর নির্ভর করিতে শিখিবে। বাহাউল্লা' সোল্‌তানের (পারস্যরাজের) ফলক-লিপিতে বলিতেছেন:—

"এই হরিৎ চারণভূমির জন্য, ঈশ্বর বিপদ-আপদকে প্রভাতি বৃষ্টিপাত সদৃশ করিয়াছেন; এই সমস্ত বিপদাপদই এই প্রদীপের বর্ত্তিকা স্বরূপ, যাহার দ্বারা স্বর্গ-মর্ত্ত্য আলোকিত হইতেছে। * * * বিপদ-আপদের মধ্য দিয়াই ঈশ্বরের আলোক দীপ্তিমান হয়, এবং

তাঁহার জয়গান নিরন্তর ছাপাইয়া উঠে;—আদিকাল ও বিগতযুগে ঈশ্বরের কার্য্য-প্রণালী এরূপ হইয়াছে।"

বাহাউল্লা' এবং আব্দুল্‌বাহা, উভয়েই সুস্পষ্ট বিশদ ভাষায় পার্থিবতার উপর আধ্যাত্মিকতার জয়লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে তাহারই ফলে সর্ব্বব্যাপী মহান্‌-শান্তি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আব্দুল্‌বাহা লিখিয়াছিলেন:—

"তোমরা নিশ্চিত জানিয়া রাখ যে, দুঃখ-ক্লেশ, বিপদ-আপদ দিন-দিন বাড়িতে থাকিবে, এবং জনসাধারণ অপরিসীম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। আমোদ-প্রমোদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দ্বার-পথ চতুর্দ্দিক হইতে বন্ধ হইয়া যাইবে। ভীষণ সংগ্রাম সংঘটিত হইবে। সর্ব্ব-প্রকারের নৈরাশ্যে এবং আশার ব্যর্থতায় জনসাধারণ পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিবে, যে পর্য্যন্ত না তাহারা বাধ্য হইয়া ঈশ্বরের দিকে ফিরিবে। তৎপর, সুখ-সৌভাগ্যের পরমালোক দিগ্‌মণ্ডলগুলিকে উদ্ভাসিত করিবে, এবং 'ইয়া-বাহা-উল্‌-আবহা'র তূর্য্য-নিনাদ চতুর্দ্দিক হইতে ধ্বনিত হইবে।"—(সমর ও শান্তি, পৃঃ ১৮৭)

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন আব্দুল্‌বাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—"প্রধান রাষ্ট্রসমূহ হইতে কোনো একটি রাষ্ট্র কি এই ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইবে?" আব্দুল্‌বাহা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন:—

"পৃথিবীর সমগ্র-মানবকুল এই ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইবে। যদি তোমরা এই ধর্ম্মের প্রথম অবস্থার সহিত ইহার অদ্যকার অবস্থা তুলনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে ঈশ্বরের বাক্য কতই না দ্রুতগতিতে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ঈশ্বরের ধর্ম্ম এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। * * * নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে

পারে যে, সর্ব্বেই ঈশ্বরের ধর্ম্মের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিবে।" —(পশ্চিমের তারকা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩১)

তিনি বলিতেছিলেন, এই পরম পরিণতি-প্রাপ্তির সময় সন্নিকটবর্ত্তী, এই বর্ত্তমান শতাব্দীতেই ইহা সংঘটিত হইবে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে থিওসোফিষ্টদিগের নিকটে বক্তৃতা-প্রদান-কালে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"বর্ত্তমান শতাব্দী সত্য-সূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত শতাব্দী ; এই শতাব্দীতেই ঈশ্বরের রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।"—(পশ্চিমের তারকা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৭)

ডানিয়েলের গ্রন্থের শেষ দুই পংক্তিতে নিম্নলিখিত রহস্যময় কথাগুলি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে :—

"সেই ধন্য, যে অপেক্ষা করিয়া থাকে এবং এক সহস্র, তিন শত, পঁয়ত্রিশ (১,৩৩৫) দিনে উপস্থিত হয়। তুমি তোমার পথে চলিবে, যতদিন না শেষ উপস্থিত হয় : তুমি বিশ্রাম করিবে, এবং শেষের দিনে আপন ভাগ্যে দাঁড়াইবে।"

বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এই সমস্ত কথার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। একদা কথোপকথন-প্রসঙ্গে আব্‌দুল্‌বাহা নিম্নোক্ত কথা বলিয়াছিলেন ; সেই সময় বর্ত্তমান লিখকও সেখানে উপস্থিত ছিল :—

"এই ১,৩৩৫ দিনের অর্থ, হিজ্‌রৎ (অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদের মক্কা হইতে মদিনা পলায়নের তারিখ) হইতে ১,৩৩৫ সৌরবর্ষ।"

হিজ্‌রতের তারিখ, ৬২২ খৃষ্টাব্দ ; সুতরাং তাহার ১,৩৩৫ বৎসর পরে হইলে ১,৯৫৭ খৃষ্টাব্দই বুঝা যায় (৬২২+১৩৩৫=১৯৫৭)। তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করা হইল — "আমরা ১,৩৩৫ দিনের শেষে কি দেখিব?" আব্‌দুল্‌বাহা উত্তর দিলেনঃ—

"সার্ব্বজনীন, সমগ্র-বিশ্ব-ব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, সার্ব্বজনীন ভাষা প্রচলিত হইবে। মতভেদ-মতবিরোধ, কলহ-বিদ্বেষ অন্তহিত হইবে। বাহাই ধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, মানবজাতির ঐক্য দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে। অত্যুজ্জ্বল সময় উপস্থিত হইবে।

আক্কা এবং হাইফা

মীর্জ্জা আহ্‌মদ্ সোহ্‌রাব তাঁহার রোজনাম্‌চাতে লিখিয়াছেন যে, ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে, আব্‌দুল্‌বাহা হাইফাতে একটি বাহাই তীর্থপর্য্যটকাবাসের জানালার ধারে বসিয়াছিলেন; সেই সময় তিনি নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেনঃ—

"তীর্থ-পর্য্যটকাবাস হইতে যেই দৃশ্য দেখা যাইতেছে, তাহা অতি মনোহর। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, বাহাউল্লা'র পবিত্র সমাধি উদ্যান ইহার ঠিক সাম্‌নে পড়িয়াছে। ভাবীকালে আক্কা এবং হাইফার মধ্যবর্ত্তী দূরত্বে রাজপথ নির্ম্মিত হইবে, এই দুইটি নগরী পরস্পর মিলিয়া একটি মহা-নগরীর প্রত্যন্ত-পল্লীতে পরিণত হইবে; আমি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে ভাবীকালে এই স্থান পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-কেন্দ্র হইবে। এই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সামুদ্রিক হ্রদ অতীব চমৎকার বন্দরে পরিণত হইবে; সর্ব্বজাতির বাণিজ্য-পোত এখানে আশ্রয় লইবে। জাতি সমূহের বিরাট জাহাজগুলি এই বন্দরে আসিতে থাকিবে, তাহাদের পাটাতনে করিয়া ভূমণ্ডলের প্রত্যেক অংশ হইতে সহস্র সহস্র নরনারীকে তাহারা এখানে

আনয়ন করিবে। পর্ব্বত এবং প্রান্তর নূতনতম প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যে সমাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। নানাবিধ শিল্প-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, পরোপকার-ব্রতী নানারূপ প্রতিষ্ঠান এখানে সৃষ্ট হইবে। সকল জাতির শিক্ষা-দীক্ষা এবং সভ্যতার কুসুমগুলি এখানে আনীত হইবে, তাহাদের সৌরভ একত্রে মিলাইয়া মানব-ভ্রাতৃত্বের জন্য পথ উজ্জ্বল করা হইবে। অপরূপ উদ্যান, ফলের বাগান, কুঞ্জকানন ও বিহারভূমি চতুর্দ্দিকে নির্ম্মিত হইবে। রাত্রে এই মহানগরী বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হইবে। আক্কা হইতে হাইফা পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত থাকিবে আলোকিত রাজপথ, তাহা একটি আলোক-রেখার মত দেখাইবে। কার্ম্মেল পর্ব্বতের উভয় পার্শ্ব হইতে বাষ্পীয় নৌপোতের পথ-নির্দ্দেশের নিমিত্ত তীব্র আলোকের ব্যবস্থা করা হইবে। সমগ্র কার্ম্মেল পর্ব্বতটি আদ্যোপান্ত আলোক-সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে। কার্ম্মেল পর্ব্বতের শৃঙ্গে দণ্ডায়মান ব্যক্তি এবং জাহাজ হইতে যাত্রিকগণ এমন এক অনন্যসাধারণ মহান্ দৃশ্যের দর্শন লাভ করিবে, যাহা পৃথিবীর চক্ষে অদ্যাবধি দেখে নাই।

"পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক হইতে রব উঠিবে—'ইয়া-বাহা-উল্-আব্‌হা', এবং প্রত্যেক প্রভাতে হৃদয়মোহন সঙ্গীতের ধ্বনি-তরঙ্গ সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সিংহাসনের দিকে উত্থিত হইবে।

"বাস্তবিকই, ঈশ্বরের কার্য্যপ্রণালী নিতান্ত রহস্যময় ও দুরবগম্য। আচ্ছা, কি বাহ্যিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, সিরাজ ও তেহরাণের মধ্যে, বগ্‌দাদ্ ও কনষ্টান্টিনোপলের মধ্যে, আদ্রিয়ানোপল্, আক্কা ও হাইফার মধ্যে? ঈশ্বর এই সমস্ত বিভিন্ন নগরীর মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে ও ধৈর্য্য সহকারে আপন নির্দ্দিষ্ট, অটল নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহাতে বিগত যুগের অবতারগণের সকল প্রতিশ্রুতি ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ হইয়া যায়। সত্য-যুগে পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি সম্বন্ধে

তৌরিত, ইঞ্জিল, কোরাণ ও অন্যান্য ধর্ম্ম-গ্রন্থে ঈশ্বরের যে প্রতিশ্রুতির সুন্দর পারম্পর্য্য রহিয়াছে, ঈশ্বরের আদেশ ক্রমে আপন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহা প্রকাশ হইবে, তাহার একটি বাক্যও নিষ্ফল হইয়া থাকিবে না।"

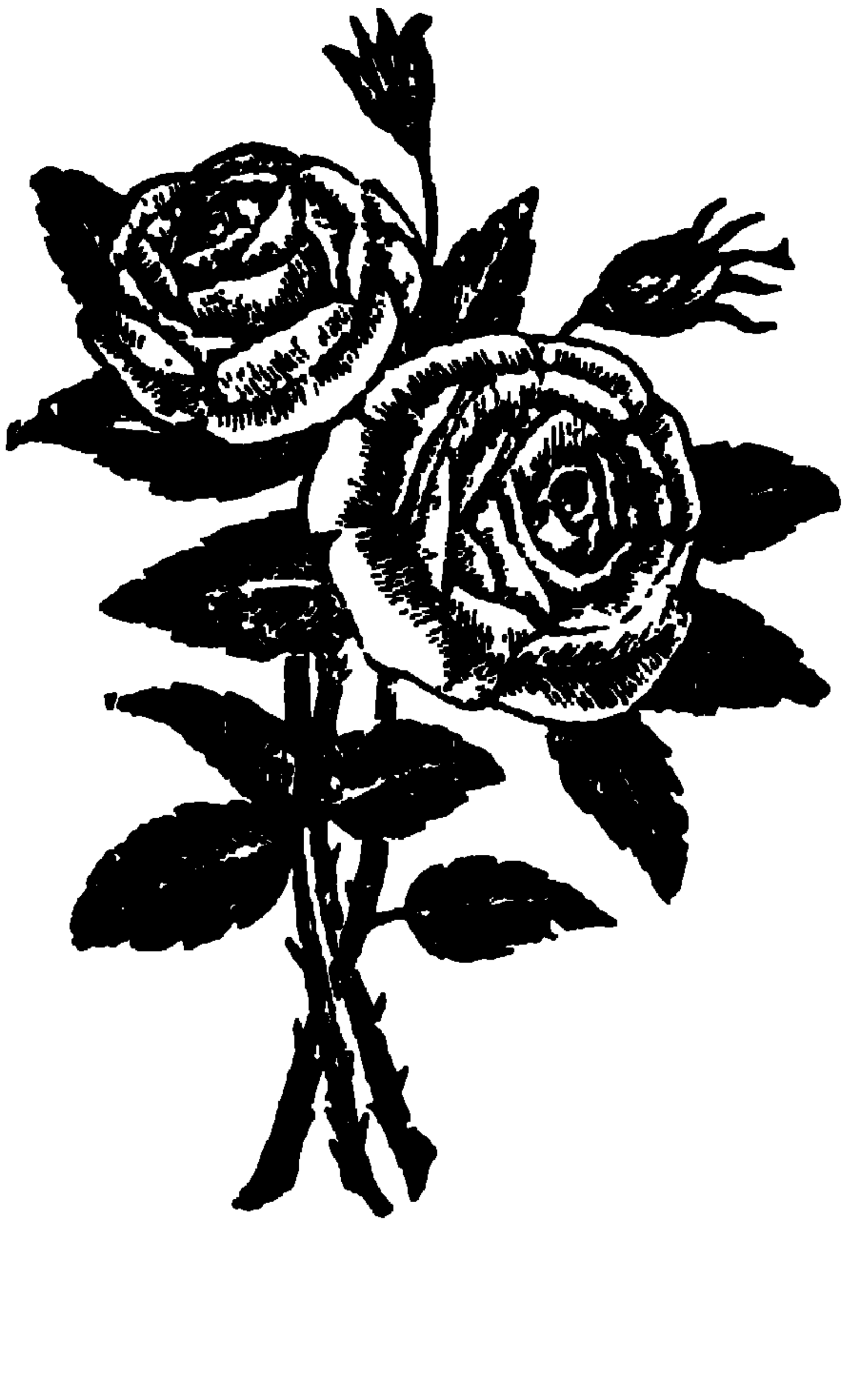

পঞ্চদশ অধ্যায়

গতানুদর্শন ও ভবিষ্য-সূচনা

"হে বন্ধুগণ, আমি এই কথার সাক্ষ্য দিতেছি যে দান-উপহার সম্পূর্ণ করা হইয়াছে, যুক্তি-তর্ক পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, প্রমাণের প্রকাশ এবং সাক্ষ্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, ত্যাগের পথে তোমাদের প্রয়াস কি প্রদর্শন করে। এইরূপে তোমাদের উপর এবং স্বর্গ-মর্ত্ত্যে সকলের উপরে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। ধন্য ঈশ্বরকে, সর্ব্বলোকের অধীশ্বর যিনি।"—(নিহিত বাক্য, বাহাউল্লা')

বাহাই ধর্ম্মের প্রসার ও অগ্রগতি

সর্ব্বব্যাপী বাহাই আন্দোলন সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকে সম্যক বর্ণনা দেওয়া কোনো প্রকারে সম্ভবপর নহে। এই মনোহর প্রসঙ্গে, অনেক অধ্যায় সমর্পণ করিতে হইবে, বাহাই ধর্ম্মমতের জন্য জীবন বিসর্জ্জনকারী, অগ্রগামী মহাপ্রাণগণের জীবন-কাহিনীর রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিতে হইবে। কিন্তু তথাপি, নিতান্ত সংক্ষেপে আমি তাহার যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

পারস্যদেশে প্রথম বাহাই বিশ্বাসীগণের প্রতি যে ঘোরতর অত্যাচার, নির্য্যাতন ও নিষ্ঠুর-আচরণ করা হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, অপরিসীম সাহস ও ধৈর্য্য সহকারে সেই সমস্তই সহ্য করিয়াছিল; তাহাদের আপন রক্তে তাহাদের ধর্ম্মাভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল; সহস্র সহস্র বাহাই ধর্ম্মের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল, সহস্র সহস্র বাহাইকে তাহাদের ধর্ম্মমতের জন্য লগুড় দ্বারা আহত করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে নিগৃহীত ও কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল; তাহাদের সমস্ত ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছিল এবং অন্য নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত করা হইয়াছিল। পারস্যদেশে যাহারা সাহস করিয়া বা'ব এবং বাহাউল্লা'র প্রতি তাহাদের বিশ্বাস ও অনুরক্তি প্রকাশ করিত, তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হইত, তাহাদিগকে সর্ব্ব-প্রকারের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা হইত, এমন কি, তাহাদের জীবনও বিপন্ন হইয়া পড়িত; এই নিদারুণ ভীষণ অবস্থা ষাইট বৎসরের অধিক কাল চলিয়াছিল। তত্রচ, এসমুদয় বর্ব্বরোচিত নিষ্ঠুর আচরণ, একখণ্ড ধূলীসমাকীর্ণ মেঘ যতদূর সূর্য্যোদয়ের প্রতিবন্ধক হইতে পারে, তদপেক্ষা অধিক কিছু বাহাই-ধর্ম্মের প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইতে পারে নাই।

পারস্যের একপ্রান্ত হইতে অপর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত, গ্রামে, নগরে, মহানগরীতে, সর্ব্বত্রই বাহাই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি লক্ষিত হয়! এমন কি, যাযাবর উপজাতির মধ্যেও অনেকে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। অনেক গ্রামের সমস্ত ব্যক্তিই বাহাই ধর্ম্মাবলম্বী, অনেক, দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি বাহাই ধর্ম্মে বিশ্বাসী। যদিও এসমস্ত ব্যক্তি পরস্পর শত্রু-ভাবাপন্ন, নানা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু এখন তাহারা মহান্ বন্ধু-সমবায়ে সম্মিলিত হইয়াছে। তাহারা শুধু তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করে না, বরং পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল মানবের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকে। সমগ্র মানবকুলের একতা ও

উন্নতি সাধনের নিমিত্ত, সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার, মতভেদ-মতবিরোধ দূরীকরণার্থে এবং ঈশ্বরের রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহারা সতত যত্নবান।

ইহা হইতে মহত্তর অলৌকিককার্য্য আর কি হইতে পারে? কেবলমাত্র এই এক কার্য্যই, যাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছে; তাহা সম্পন্ন হওয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক কার্য্য হইবে। যুগলক্ষণ দেখিয়া ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে এই মহান্ অলৌকিককার্য্যও ধীরে ধীরে ও সুনিশ্চিতরূপে এই লৌকিক জগতে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

তুর্কীস্থান, আমেরিকা, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ এবং অন্যান্য দেশে সহস্র সহস্র বাহাই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি আছেন; জার্ম্মানী, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশে বাহাই ধর্ম্মের প্রচার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক কর্ম্ম-তৎপরতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। অনেক দেশে বাহাই ধর্ম্মের প্রচারের জন্য একাধিক মাসিক পত্রিকা মুদ্রিত হইয়া থাকে, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে বার্ষিক মহাসভার অধিবেশন হইয়া থাকে, তাহাতে সমস্ত দেশের বাহাইগণের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়া থাকেন। জাপানে একটি মাসিক পত্রিকা আছে; তাহা জাপানী ভাষা এবং এস্পেরাণ্টো ভাষাতে মুদ্রিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় সকল দেশেই বাহাই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; যদিও পৃথিবীর অধিবাসিগণের সংখ্যা অনুপাতে তাহারা এখনও মুষ্টিমেয় মাত্র, কিন্তু তথাপি তাহারা অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করিতেছে। বাহাই ধর্ম্ম ধীরে ধীরে প্রবল শক্তিসম্পন্ন হইতেছে এবং পরিবর্ত্তনকারী খমিরের ন্যায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া

পড়িতেছে এবং তাহার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই মানবজাতির রূপান্তর ঘটাইতেছে।

কোনো ব্যক্তি বাহাই কিনা বুঝিতে হইলে, দেখিতে হইবে সেই ব্যক্তি বাহাউল্লা' এবং "অঙ্গীকারের কেন্দ্র" আব্‌দুল্‌বাহার উপদেশ অনুসারে জীবনযাপন করিতেছে কিনা, এবং ধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি উপলব্ধি করিতে হইলে, শুধু বিশ্বাসীগণের সংখ্যার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, বরং ধর্ম্মের মৌলিক তথ্যগুলি পৃথিবীতে কিরূপ কার্য্য করিতেছে এবং পৃথিবীর কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে, তাহাও দেখিতে হইবে। এই কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে বাহাউল্লা'র আবির্ভাবের পর হইতে পৃথিবী এক অভাবনীয় দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং আমি বিবেচনা করি, পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ের নিরপেক্ষ পাঠকগণের নিকটে ইহাও সুস্পষ্ট হইবে যে, এই অসাধারণ উন্নতি এক অলৌকিক উপায়ে ঐ সমস্ত নিয়মানুযায়ী সংঘটিত হইতেছে, যাহা অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বাহাউল্লা' নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। অতএব, যে মহামানব এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের কথা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এক অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতা সহকারে তাহা প্রচারিত করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহার মহান্ ব্যক্তিত্বের ফলেই এই সমস্তের পূর্ণতাপ্রাপ্তিও সংঘটিত হইবে, ইহাও সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত। আমার পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা আধ্যাত্মিক কথোপকথন বা ভাব-বিনিময় সম্পর্কে, কিম্বা প্রার্থনার অপরিসীম শক্তি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন যে বাহাউল্লা'র মত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে ঐ সমস্ত লোককে অনুপ্রাণিত করিতে সক্ষম, যাহাদের অন্তর প্রেম ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ, —তাহারা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে অবস্থান করুক, তাহারা

বাহাউল্লা'র নাম শুনিয়া থাকুক আর না শুনিয়াই থাকুক না কেন। (১)

বা'ব এবং বাহাউল্লা'র অবতারত্বের প্রমাণ

বা'ব এবং বাহাউল্লা'র জীবন-ইতিহাস এবং তাঁহাদের উপদেশাবলী আমরা যতই পাঠ করিতে থাকি, আমাদের নিকটে এই কথা ততই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় যে, ঐশ্বরিক প্রেরণা ব্যতীত তাঁহাদের মহত্বের অন্য কোনো কারণ ছিল না। ধর্ম্মান্ধতায় ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাঁহারা লালিত ও পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিতান্ত সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতার সহিত তাঁহাদের কোনো সংস্পর্শই ছিল না।

---

(১) লর্ড কার্জ্জন প্রণীত "পারস্য এবং পারস্য সম্বন্ধীয় সমস্যা" নামক গ্রন্থ বাহাউল্লা'র স্বর্গারোহণ বৎসর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন :—

"পারস্যদেশে বা'বীগণের সংখ্যা সম্বন্ধে খুব কম করিয়া বলিলেও পাঁচ লক্ষ ; ইহা অপেক্ষা অল্প সংখ্যা কিছুতেও বলা যাইতে পারে না। কিন্তু এই সম্বন্ধে যাঁহাদের মতামতের মূল্য আছে, এমন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিয়া আমার ধারণা, পারস্যে বা'বীগণের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই বা'বী ধর্ম্মাবলম্বী আছে ; রাজমন্ত্রী এবং রাজ-সভাসদ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্যতম মজুর, পথ-পরিষ্কারক, আস্তাবলের শইস্, প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে বা'বী ধর্ম্মাবলম্বী লক্ষিত হইয়া থাকে। এমন কি, মুসলমান পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে বা'বীধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। ***

কোনো রাষ্ট্রীয় বা আর্থিক শক্তি তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিল না। মানুষ হইতে তাঁহারা কোনো সাহায্যই চাহিয়াছিলেন না। অথচ মানুষের দ্বারাই তাঁহারা অত্যাচারিত, উৎপীড়িত ও নিপীড়িত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে গ্রাহ্য করিয়াছিল না, বরং তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণই করিয়াছিল। তাঁহাদের কর্ত্তব্য-সম্পাদনে তাঁহারা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, অসহনীয় দুঃখ-ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে কশাঘাত করা হইয়াছিল ও নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত করা হইয়াছিল। তাঁহারা একাকী সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান এবং ঈশ্বর ব্যতীত সকল সাহায্য হইতে বঞ্চিত ছিলেন, অথচ ইতিমধ্যেই তাঁহাদের যথার্থ জয়লাভ সম্যক সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

তাঁহাদের আদর্শের মাহাত্ম্য, তাঁহাদের জীবনের ঔন্নত্য, তাঁহাদের আত্মোৎসর্গ, তাঁহাদের অসীম সাহসিকতা ও দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁহাদের বিস্ময়কর জ্ঞান ও পরিণামদর্শিতা, তাঁহাদের প্রাচী-প্রতীচী সমগ্র জন-সাধারণের অভাব-উপলব্ধি করিবার শক্তি, তাঁহাদের উপদেশাবলীর ব্যাপ্তি

"বা'বীধর্ম্ম এই অত্যল্পকালের মধ্যেই যেরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে, সেইরূপ দ্রুতগতিতে ইহার প্রসার চলিতে থাকিলে, শীঘ্রই এমন সময় আসিবে, যখন পারস্য হইতে মুসলমান ধর্ম্মের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত হইবে। যদি অমুসলমান দেশে এই নূতন ধর্ম্ম উৎপত্তি লাভ করিত, তাহা হইলে ইহা যে এতদূর সফল হইত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু এই ধর্ম্ম মুসলমান প্রধান দেশ পারস্যেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই অনেক ব্যক্তি বাহাই ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং ভাবীকালে বাহাই ধর্ম্মই পারস্যদেশে প্রাধান্য লাভ করিবে, ইহা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।"—(প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৯—৫০২)

ও উপযোগিতা, তাঁহাদের অনুগামীদিগকে একান্তভক্তিভাবে অনুপ্রাণিত করিবার তাঁহাদের ক্ষমতা,: তাঁহাদের প্রভাবের সাফল্য ও কৃতকার্য্যতা, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের প্রসার ও অগ্রগতি — নিশ্চয়ই, এই সমস্ত তাঁহাদের সত্যতার এমন এক অকাট্য, সন্তোষজনক প্রমাণ, যাহা একমাত্র ধর্ম্মের ইতিহাসই উপস্থিত করিতে সক্ষম।

বিপুল গৌরবময় ভবিষ্যৎ

বাহাই আনন্দবার্ত্তা ঈশ্বরের দান-উপহার এবং মানবজাতির ভবিষ্য উন্নতির এক চিত্তাকর্ষক দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। অদ্যাবধি মানবজাতিকে যে সমস্ত ধর্ম্ম দেওয়া হইয়াছে, বাহাই ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোত্তম; অথবা এরূপ বলা যাইতে পারে, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ধর্ম্মের ক্রম-বিকাশ বা পরিণতি। ইহার উদ্দেশ্য মানবজাতিকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করা, "এক নূতন স্বর্গ ও নূতন মর্ত্ত্য" সৃষ্টি করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহাই সেই মহান্ কার্য্য, যাহা সম্পন্ন করিবার জন্য যীশুখৃষ্ট প্রমুখ পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত অবতার তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; এই সমস্ত বিশ্ব-শিক্ষক অবতার-গণের মধ্যে কখনও কোনো প্রকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি শত্রুভাব ছিল না, এখনও নাই। এই মহান্ কার্য্য অবতার বিশেষ দ্বারা সম্পন্ন হইবে না, বরং একত্রে সমস্তের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে। যেমন আব্দুল্-বাহা বলিতেছেন:—

"যীশুকে বড় করিবার জন্য এব্রাহামকে ছোট করিতে হয় না; বাহাউল্লা'কে প্রসিদ্ধ করিতে যীশুকে খাট করিবার আবশ্যকতা নাই। সত্য এবং সত্যতা যেখানেই থাকুক না কেন, তাহাই আমাদিগকে

গ্রহণ করিতে হইবে। এই কথার তাৎপর্য্য এই "যে, এই সমস্ত মহান্ অবতারগণের প্রত্যেকেই পরম পরিপূর্ণতার ঐশিক পতাকা উত্তোলন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরের আদেশের একই নভোমণ্ডলে দেদীপ্যমান্ সূর্য্যস্বরূপ; তাঁহারাই পৃথিবীকে আলোক দান করিতেছেন।"—(পশ্চিমের তারকা, ৩য় খণ্ড, নং ৮, পৃঃ ৮)

ইহা ঈশ্বরের কার্য্য; ঈশ্বর তাঁহার সৃজন-কার্য্যে সহকর্ম্মী হইবার জন্য কেবলমাত্র অবতারগণকে আহ্বান করিতেছেন না, বরং সমগ্র মানবকুলকে আহ্বান করিতেছেন। আমরা ঈশ্বরের আহ্বান অগ্রাহ্য করিলেও, তাঁহার ধর্ম্মের অগ্রগতি রোধ করিতে পারিব না, কারণ যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রায় তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকিবেই। যদি আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালনে অসমর্থ হই, তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অপর বস্তুকে তাঁহার সৃজন-কার্য্যের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু আমরা আমাদের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সার্থক করিবার সুযোগ হারাইব।

ঈশ্বরে বিলীন হওয়া—অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেমিক ও সেবক হওয়া, স্বেচ্ছায় তাঁহার সৃষ্টির যন্ত্রস্বরূপ ও মধ্যস্থবিশেষ হওয়া, এবং এই পর্য্যন্ত যে আমাদের মধ্যে ঈশ্বর ভিন্ন অপর কাহাকেও দেখিতে না পাওয়া—ইহাই বাহাই উপদেশ অনুসারে মানবজীবনের প্রকৃত গৌরবময় চরম-উদ্দেশ্য, পরিপূর্ণতম পরমপরিণতি।

মানুষ অতি পরিপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী, কেননা, ঈশ্বর তাহাকে আপন অবয়বে, আপন সাদৃশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কারণে, মানুষ যখন সত্য-বস্তু প্রাপ্ত হয়, মূর্খতার পথে বিচরণ করে না। বাহাউল্লা' নিশ্চিত করিয়া বলিতেছেন যে অচিরেই ঈশ্বরের আহ্বান পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাধারণভাবে গৃহীত হইবে এবং সমগ্র মানবকুল ধার্ম্মিকতা ও সেবা

কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া পড়িবে। "তখন, সর্ব্বপ্রকারের দুঃখ-ক্লেশ আনন্দ-উৎসবে পরিবর্ত্তিত হইবে এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি স্বাস্থ্যে পরিণতি লাভ করিবে" এবং পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ "আমাদের প্রভু এবং তাঁহার ক্রাইষ্টের রাজত্বে" পরিণত হইবে, "এবং তিনি অনন্তকাল ধরিয়া রাজত্ব করিবেন"—(জ'নের প্রকাশিত বাক্য, ১১, ১৫)। শুধু ধরাপৃষ্ঠে বিচরণকারী মানব নহে, বরং স্বর্গ-মর্ত্ত্য, উভয় স্থলের সকল আত্মাই ঈশ্বরে বিলীন হইয়া অনন্তকাল ধরিয়া আনন্দ-উৎসব করিবে।

ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান

পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা এই কথারই সাক্ষ্য দিতেছে যে প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রায় সকল ব্যক্তিই তাহাদের আপন ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থে পুনর্জ্জাগরিত হইবার আবশ্যকতা অনুভব করে; এই পুনর্জ্জাগরণই বাহাউল্লা'র জীবন-ব্রতের সর্ব্বপ্রধান বিষয়। তিনি খৃষ্টানদিগকে প্রকৃত খৃষ্টান এবং মুসলমানদিগকে প্রকৃত মুসলমান করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে সমাগত হইয়াছেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের আপন আপন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতাগণের প্রকৃত প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিতেছেন। এবং পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারগণ যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন—সময় পূর্ণ হইলেই ঈশ্বরের পরম প্রকাশ আবির্ভূত হইবেন, যিনি তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্যের পূর্ণতা সম্পাদন করিবেন,—তিনি সেই প্রতিশ্রুতিও সম্পন্ন করিতেছেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণ অপেক্ষা অনেক অধিক আধ্যাত্মিক তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান জগতে সমুপস্থিত সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি এমন এক সার্ব্বজনীন শিক্ষাদান করিয়াছেন, যাহাকে ভিত্তি

করিয়া এক অভিনব, শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা সৃষ্ট হইতেছে এবং যাহা বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রকার অভাব নিরাকরণের উপযোগী।

নব প্রকাশের আবশ্যকতা

মানবকুলের একতাসম্পাদন, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মের একীকরণ, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সমন্বয়সাধন, সার্ব্বজনীন শান্তি, আন্তর্জাতিক মহাসভা, আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও আন্তর্জাতিক ভাষার প্রতিষ্ঠা, নারীজাতির মুক্তিসাধন, সার্ব্বজনীন শিক্ষাপ্রচার, পুরাকালীন দাসত্ব-প্রথা এবং বর্ত্তমান কলকারখানাজনিত দাসত্বের বিলোপসাধন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ন্যায়াধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একই পরিবার-রূপে সমগ্র মানবজাতির শৃঙ্খলা বিধান — এই সকল বিষয় অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বিপত্তিময় সমস্যা, — যাহার সম্বন্ধে খৃষ্টিয়ান, মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের মতামত সবিশেষ বিভিন্ন এবং প্রায়শঃ শত্রুভাবাপন্ন ছিল, এখনও রহিয়াছে। বাহাউল্লা'র মধ্যস্থতায় ঈশ্বর সত্য-তথ্যগুলি অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন,, যাহার সাধারণ প্রয়োগে এই পার্থিব জগৎ প্রত্যক্ষ স্বর্গধামে পরিণত হইবে।

সত্য সকলেরই জন্য

অনেকে পারস্যদেশ ও প্রাচ্যের জন্য বাহাই উপদেশাবলী অত্যাবশ্যক বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত, কিন্তু মনে করেন যে, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের জন্য ইহা অনাবশ্যক ও অনুপযোগী। কোনো এক ব্যক্তি আবদুল্‌বাহার নিকটে ঐরূপ মত ব্যক্ত করিলে, আবদুল্‌-বাহা তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন ঃ—

"বাহাউল্লা'র ধর্ম্মের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ইহা মনে রাখিতে হইবে,

যে সার্ব্বজনীন হিতসাধন কল্পে যাহা কিছু করা হয়, তাহাই ঐশ্বরিক এবং যাহা ঐশ্বরিক, তাহাই সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্য। যদি বাহাউল্লা'র ধর্ম্ম সত্য হয়, তাহা হইলে তাহা সকলেরই জন্য; যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে তাহা ত কাহারও জন্যই সত্য নহে। সুতরাং সার্ব্বজনীন কল্যাণের ঐশ্বরিক ধর্ম্ম কেবল পূর্ব্বে, কি কেবল পশ্চিমে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না; কারণ, সত্য-সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় কিরণ পূর্ব্ব-পশ্চিম উভয় দিক আলোকিত করে এবং ইহার উত্তাপ উত্তর দক্ষিণে অনুভূত হয়,—উত্তাপ প্রদানে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যে ইহার কোনো বিভেদ-বিচার থাকে না। যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের সময় রোমকগণ ও গ্রীকগণ মনে করিয়াছিল, যীশুখৃষ্টের ধর্ম্ম মাত্র য়িহুদীদিগের জন্য, তাহাদের জন্য নহে। তাহারা মনে করিত, তাহাদের পূর্ণ-সভ্যতা রহিয়াছে, যীশুখৃষ্টের উপদেশাবলী হইতে তাহাদিগের কিছুই শিখিবার ছিল না। এই ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই তাঁহার করুণাধারা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। এমতে তোমরা জানিয়া রাখ, খৃষ্টধর্ম্মের মৌলিক তথ্য এবং বাহাউল্লা'র আদেশবাণী এক ও অভিন্ন এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথগুলিও ভিন্ন নহে। প্রত্যেক ধর্ম্মের উন্নতি-প্রণালী বিভিন্ন; এমন এক সময় ছিল, যখন এই উন্নতিশীল ধর্ম্মের ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান ভ্রূণ জগতে ছিল, তৎপর সদ্যজাত শিশু, তৎপর বালক, তৎপর বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন নবযুবকে উন্নীত হইয়াছিল; কিন্তু অদ্যকার দিনে ইহা বিপুল সৌষ্ঠবশ্রীতে দেদীপ্যমান।

"সেই ব্যক্তিই পরম ভাগ্যবান্, যে এই রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছে এবং জ্যোতির্ম্ময় জগতে তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।"

আব্দুল্‌বাহার "শেষ বাণী"

নব অধ্যায়ের সূচনা

প্রিয়প্রভু আব্দুল্‌বাহা স্বর্গারোহণ করিলেন; বাহাই ধর্ম্মের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আরব্ধ হইল। বাহাই ধর্ম্মের প্রসার এতই সুবিস্তৃত হইয়াছিল যে পৃথিবীর নানা বিভিন্ন দেশের বাহাইগণের কার্য্য-কলাপ নিয়মিত করিবার জন্য এবং সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার নিমিত্ত সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইল। ধর্ম্মকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বাহাউল্লা' যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তদনুসারেই আব্দুল্‌বাহা অধিকতর ব্যাপকভাবে নিয়ম-অনুশাসন-বিধি প্রভৃতি প্রণয়ন করিলেন। তাহাই তাঁহার শেষবাণী, তাঁহার শেষদান।

এই নিয়ম-অনুশাসনের প্রধান কথা তিনটি। তাহা যথাক্রমে এই ঃ—

(১) "ঈশ্বরের ধর্ম্মের অভিভাবক,"

(২) "ঈশ্বরের ধর্ম্মের হস্তগণ," এবং

(৩) "আধ্যাত্মিক সভাসমূহ — স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক"।

ঈশ্বরের ধর্ম্মের অভিভাবক

আব্দুল্‌বাহা তাঁহার জ্যেষ্ঠদৌহিত্র শোঘি এফেন্‌দিকে ধর্ম্মের অভিভাবক ('ওলিয়ে-আম্‌রুল্লা')এর দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিলেন। শোঘি এফেন্‌দি আব্‌দুল্‌বাহার জ্যেষ্ঠাকন্যা জিয়াই খানুমের জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁহার পিতা মীর্জ্জা হাদী মহামতি বা'বের দূরসম্পর্কিত আত্মীয়। আব্‌দুল্‌বাহার তিরোধানের সময় শোঘি এফেন্‌দি অক্‌স্‌ফোর্ডের বেলিয়ল্‌ কলেজে পাঠাভ্যাসে রত ছিলেন। তাঁহার বয়স তখন পচিশ বৎসর।

আব্‌দুল্‌বাহা তাঁহার "শেষ বাণী"তে এই নিয়োগের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণী এইরূপ :—

"হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! এই উৎপীড়িত ব্যক্তির তিরোধানের পর, পবিত্র বৃক্ষের শাখা, উপশাখাগণ (অর্থাৎ বা'ব এবং বাহাউল্লা'র আত্মীয় স্বজনগণ), ঈশ্বরের ধর্ম্মের হস্তগণ এবং আব্‌হা সৌন্দর্য্যের প্রেমিকগণের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য এই যে তাহারা সকলে শোঘি এফেন্‌দির দিকে ফিরিবে; শোঘি এফেন্‌দি বা'ব এবং বাহাউল্লা'রূপী দুইটি পবিত্র 'লোতে' বনস্পতি হইতে উদ্ভূত; তিনি পবিত্রতা বৃক্ষের দুইটি শাখার মিলনের ফলস্বরূপ। তিনি ঈশ্বরের নিদর্শন, নির্ব্বাচিত শাখা, ঈশ্বরের ধর্ম্মের অভিভাবক; তিনি সমস্ত শাখার, উপশাখার, ঈশ্বরের ধর্ম্মের হস্তগণের, ঈশ্বরের বন্ধুগণের সকলেরই আশ্রয়স্থল। তিনি ঈশ্বরের বাক্যের ব্যাখ্যাতা; তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার বংশজ সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ সন্তানই পর পর তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

"এই পবিত্র তরুণ শাখা—ধর্ম্মের অভিভাবক এবং সার্ব্বজনীন মহাসভা (বায়তুল্‌-আদ্‌ল্‌)—যাহা সার্ব্বজনীন নির্ব্বাচনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে, উভয়ই 'আব্‌হা' সৌন্দর্য্যের (বাহাউল্লা'র) তত্ত্বাবধানে এবং আশ্রয়াধীনে, অত্যুন্নত পুরুষ (বা'ব)এর সংরক্ষণে এবং অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শনে থাকিবে—এই উভয়ের উদ্দেশে আমার জীবন উৎসর্গিত হউক! এবং তাঁহারা যাহা কিছু নির্দ্ধারিত করিবেন, বুঝিতে হইবে, তাহাই ঈশ্বরের একান্ত অভিপ্রেত। ***

"হে ঈশ্বরের বন্ধুগণ! ধর্ম্মের অভিভাবকের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য এই যে তিনি আপন জীবদ্দশায় তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিবেন, যেন তাঁহার তিরোধানের পরে বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত না হইতে পারে। যাঁহাকে নিযুক্ত করা হইবে, তিনি সমস্ত পার্থিব আসক্তি

হইতে সন্তর্পণে নিজেকে দূরে রাখিবেন, তিনি পবিত্রতার পরমসারস্বরূপ পবিত্র হইবেন। তিনি, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে ধর্ম্মভীরুতা, জ্ঞান, অনুভূতি, উপলব্ধি এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবেন। যদি ধর্ম্মের অভিভাবকের জ্যেষ্ঠপুত্রের মধ্যে, 'পুত্র পিতারই প্রতিভু, তাঁহারই সারীভূত নির্য্যাস', এই বাক্যের সত্যতা পরিলক্ষিত না হয়, অর্থাৎ যদি সে ধর্ম্মের অভিভাবকের ন্যায় আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন না হয়, এবং ধর্ম্মের অভিভাবকের গৌরবময় বংশধর যদি তাঁহার তুল্য চরিত্র-সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের অভিভাবক অপর কোনো 'শাখা'কে তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে নির্ব্বাচিত করিবেন।

"ঈশ্বরের ধর্ম্মের হস্তগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে নয়জন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিবেন, তাঁহারা ধর্ম্মের অভিভাবক-নির্দ্দিষ্ট যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা রত থাকিবেন। সকলে একমত হইয়াই হউক আর সংখ্যা-গরিষ্ঠ ব্যক্তিগণের মত লইয়াই হউক, এই নয়জন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে; ইঁহারাই, সর্ব্বসম্মতিক্রমে বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতানুসারে, ঈশ্বরের ধর্ম্মের অভিভাবক যাঁহাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিবেন, তাঁহার নির্ব্বাচনে সম্মতি প্রদান করিবেন। এই সম্মতিপ্রদান ব্যাপার এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে, যেন কোন্ ব্যক্তি অসম্মত হইলেন এবং কোন্ ব্যক্তি সম্মত হইলেন তাহা জানিতে পারা না যায়।"

ঈশ্বরের ধর্ম্মের হস্তগণ

বাহাউল্লা' তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার চা'রজন বিশ্বাসী বন্ধুকে তাঁহার ধর্ম্মান্দোলনের সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহ করিবার জন্য এবং ধর্ম্মের উন্নতিবিধানার্থে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তিনি ইঁহাদিগকে "আয়্যাদী-এ-

আম্‌রুল্লা' " (অর্থাৎ ঈশ্বরের ধর্ম্মের হস্তগণ) উপাধি দান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনজন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, একজন অদ্যাপি জীবিত আছেন। আব্‌দুল্‌বাহা তাঁহার "শেষ বাণী"তে ঐইরূপ একটি সমিতি-নিয়োগের কথা আদেশ করিয়া গিয়াছেন; ইঁহারা ধর্ম্মের অভিভাবকের সহায়ক সমিতিরূপে কার্য্য করিবেন। তিনি লিখিতেছেনঃ—

"হে বন্ধুগণ! ঈশ্বরের ধর্ম্মের হস্তগণ ধর্ম্মের অভিভাবক দ্বারাই নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হইবেন। *** ঈশ্বরের ধর্ম্মের সৌরভ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দেওয়া, মানবাত্মার উন্নতি বিধান করা এবং সর্ব্বাবস্থায় ও সকল সময়ে সর্ব্বপ্রকার পার্থিব আসক্তি হইতে মুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকা, তাঁহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য। তাঁহারা তাঁহাদের চরিত্রে, তাঁহাদের আচরণে, তাঁহাদের কর্ম্মে এবং তাঁহাদের বাক্যে ঈশ্বরভীরুতার পরিচয় দিবেন।

" 'ঈশ্বরের ধর্ম্মের হস্ত' সমিতি ধর্ম্মের অভিভাবকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হইবে, যিনি তাহাদিগকে ধর্ম্মের সৌরভ সর্ব্বত্র ছড়াইবার জন্য এবং পৃথিবীর সমগ্র মানবকুলকে পথপ্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সকল সময় উৎসাহিত করিবেন, কেননা স্বর্গীয় পথ-প্রদর্শনের আলোকেই সমগ্র বিশ্ব-সংসার আলোকিত হইয়া থাকে।"

বাহাই আধ্যাত্মিক সভা-সমিতি

বাহাই আধ্যাত্মিক সভার কথা পূর্ব্ববর্ত্তী এক অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে; এই সমস্ত সভা পৃথিবীর নানা অংশে কর্ম্মেনিরত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক মহাসভা প্রতিষ্ঠিত

করিবার কথাও বাহাউল্লা’ এবং আব্দুল্‌বাহা বলিয়াছেন। আব্দুল্‌বাহা তাঁহার ‘শেষ বাণী’তে লিখিতেছেন ঃ—

“আর, এখন এই মহাসভা (বায়তুল্‌-আদল্‌),— ঈশ্বর যাহাকে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের আকর এবং সর্ব্বপ্রকার ভ্রান্তি-প্রমাদ হইতে মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার-মতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমস্ত ঈশ্বর-বিশ্বাসীগণ এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে ভোট দিবেন। এই সভার সদস্যগণ ধর্ম্মভীরুতা এবং জ্ঞান বুদ্ধির উৎস স্বরূপ হইবেন, ঈশ্বর বিশ্বাসে অটল থাকিবেন এবং সমগ্র মানবকুলের হিতাকাঙ্ক্ষী হইবেন। এই সভা অর্থে সার্ব্বজনীন মহাসভা বুঝায় ঃ প্রত্যেক দেশে এই মহাসভার শাখা গঠিত করিতে হইবে এবং এই শাখা-সভাগুলি সার্ব্বজনীন মহাসভার সদস্য নির্ব্বাচন করিবে।

“এই সার্ব্বজনীন মহাসভার সমক্ষে সর্ব্বপ্রকারের সমস্যা উপস্থিত করিতে হইবে। যে যে বিষয়ে পবিত্রগ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে কিছু লিখিত হয় নাই, সেই সমস্ত বিষয়ে এই সভা আইন প্রণয়ন করিবেন। সর্ব্বপ্রকার কঠিন সমস্যার সমাধান কার্য্য এই সভার হস্তেই অর্পিত থাকিবে। ধর্ম্মের অভিভাবক এই সভার শীর্ষস্থানীয়; তিনি যাবজ্জীবন এই সভার সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। তিনি যদি কোনো উপলক্ষ্যে স্বয়ং এই সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি উপস্থিত থাকিবার জন্য অপর কাহাকেও নিযুক্ত করিবেন। *** এই সভা আইন-অনুশাসন প্রণয়ন করিবেন, এবং শাসন-পরিষদ সেই আইন কার্য্যে প্রয়োগ করিবেন। ব্যবস্থাপক সভা শাসন-পরিষদকে ক্ষমতা প্রদান করিবেন, এবং শাসন-পরিষদও ব্যবস্থাপক সভাকে সাহায্য করিবেন, যেন এই উভয় শক্তির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ও মিলনের ফলে

ন্যায়পরতা এবং সুবিচারের ভিত্তি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয়, এবং এই ধরাধাম স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইতে পারে।

"কিতাবুল্ আক্‌দাসই সকলের আশ্রয়স্থল। ইহাতে যে সমস্ত বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয় নাই, তাহা সার্ব্বজনীন মহাসভার সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইবে। সর্ব্বসম্মতিক্রমেই হউক আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের বলেই হউক, এই সার্ব্বজনীন মহাসভা যে ব্যবস্থা করিবেন, বুঝিতে হইবে, তাহা সত্যই সত্য এবং স্বয়ং ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়। যে ব্যক্তি এই ব্যবস্থা অমান্য করিবে, সে নিশ্চয়ই কলহ-প্রিয়, অহিতেচ্ছুক, 'অঙ্গীকারের প্রভু' হইতে বিমুখ।

"যে সমস্ত ব্যাপার দুর্জ্জেয়, রহস্যাবৃত, যে সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনো বাণী নাই, যে সমস্ত বিষয় লইয়া বিবাদ বা মতদ্বৈধ ঘটিবার সম্ভাবনা, সে সমস্ত সমস্যা সমাধান করিবার জন্য সার্ব্বজনীন মহাসভার সদস্যবৃন্দ কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হইবেন, এবং ঐ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিবেন। যাহা তাঁহারা ব্যবস্থা করিবেন, তাহা মূলগ্রন্থের ব্যবস্থা তুল্য মনে করিতে হইবে। এই মহাসভা যেমন মূলগ্রন্থের অস্পষ্ট বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন, তেমনি ঐ সমস্ত আইন রদ বা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতাও এই মহাসভার থাকিবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারেঃ আজ বর্ত্তমান মহাসভা একটি আইন প্রণয়ন করিয়া কার্য্যে প্রয়োগ করিলেন, এবং আজ হইতে একশত বৎসর পরে সম্পর্কিত অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহা হইলে যে মহাসভা তখন সংগঠিত হইবে, তাহা এই আইন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে। এই মহাসভা এরূপ আইন পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, কেননা ইহা মূল গ্রন্থের কোনো

বিশিষ্ট মৌলিক অংশ নহে। এই সভা এইরূপ আইন প্রণয়ন ও রহিত করিবেন।"

আব্দুলবাহার 'শেষবাণী' হইতে উদ্ধৃত আরও

আমরা বর্ত্তমান সময়ে আব্দুলবাহার "শেষ বাণী" সম্বন্ধে এবং ইহাতে তিনি যে সমস্ত বিষয় উপস্থাপিত করিয়াছেন, যে সমস্ত অনুশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার সমালোচনা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি না। সুতরাং, বাহাই ধর্ম্মের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপির উপযুক্ত সমাপ্তি হিসাবে যদ্সামান্ত উদ্ধৃত বাক্য আরও সন্নিবেশিত করিতেছি, যাহাতে সেই সঞ্জীবনী-শক্তি ও মৌলিক তথ্যগুলির জীবন্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যাহা আব্দুলবাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল ও তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়াছিল,— তাঁহার বিশ্বাসী-অনুগামীগণ যাহা অতি মূল্যবান সম্পত্তিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে :—

"হে প্রভুর প্রিয়পাত্রগণ! এই পবিত্র ধর্ম্মবিধানে বিবাদ-বিসম্বাদের কোনই স্থান নাই। প্রত্যেক বিবাদকারী ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করে। পৃথিবীর সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে গভীর প্রেম, ন্যায় ব্যবহার, সরলতা এবং অকপট অনুকম্পা প্রদর্শন সকলের অবশ্য-কর্ত্তব্য। এই প্রেমভাব এবং করুণা এরূপ গভীর হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে অপরিচিত মনে করে তাহার বন্ধুলাভ হইল, শত্রু মনে করে তাহার সহোদর লাভ হইল, উভয়ের মধ্যে আদৌ কোনও পার্থক্য না থাকে। "কারণ, সার্ব্বজনীনতা ঈশ্বরের নিয়ম, সসীমতা মাত্রই পার্থিব।"

"অতএব হে প্রিয় বন্ধুগণ! জগতের সমস্ত জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম্মের সহিত একান্ত সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, করুণা, সদিচ্ছা এবং মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হও; যাহাতে ইহলোকের সর্ব্বত্র 'বাহা'র অনুগ্রহের পুণ্য উল্লাসে পূর্ণ হয়; যাহাতে অজ্ঞতা, বৈরিতা, ঘৃণা এবং বিদ্বেষ ধরাতল হইতে বিলুপ্ত হয়; যাহাতে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের অন্ধকার দূরীভূত হইয়া একতার আলোক-রশ্মি দেখা দেয়। যদি অন্যান্য জাতি, সম্প্রদায় তোমাদিগের সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করে, তোমরা তথাপি তাহাদিগের নিকট বিশ্বস্ত থাকিবে; যদি তাহারা তোমাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করে, তোমরা তথাপি তাহাদিগের সহিত ন্যায় ব্যবহার করিবে; যদি তাহারা তোমাদিগের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকে, তোমরা তবুও তাহাদিগকে নিকটে আকৃষ্ট করিবে; যদি তাহারা বৈরিভাব প্রদর্শন করে, তাহাদিগের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইও; যদি তাহারা তোমাদের জীবন কলুষিত করিয়া তোলে, তাহাদের আত্মার পবিত্রতা সম্পাদন করিও; যদি তাহারা তোমাদিগকে আঘাত করে, তোমরা তাহাদের ক্ষতের প্রলেপ স্বরূপ হইও। এ সমস্তই সরলের লক্ষণ! এই সমস্তই সত্যবাদীর বিশেষণ!"

"হে প্রভুর প্রিয়পাত্রগণ! ন্যায়বান্ নরপতিগণের আনুগত্য তোমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য, ন্যায়পরায়ণ প্রত্যেক রাজন্যের প্রতি বিশ্বস্ত-চিত্ত হইও। সত্যবাদিতা ও আনুগত্য দ্বারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণের সেবা করিও। তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইও, তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হইও। তাঁহাদিগের অজানিতে বা বিনানুমতিতে রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিও না; যেহেতু ন্যায়নিষ্ঠ ভূপতির অনুরক্ত না হওয়া, স্বয়ং ঈশ্বরেরই আনুগত্য অস্বীকার। তোমাদিগের নিকট আমার

উপদেশ এবং ঈশ্বরের আদেশ এইরূপ। যাহারা এই ভাবে কাজ করিবে, তাহাদের মঙ্গল হইবে।"

"প্রভু, তুমি ত দেখিতেছ, সকল কিছুই আমার জন্য অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, কেবল আমার আত্মীয়গণ আমার দুঃখে আনন্দমগ্ন। তোমার দয়ায় হে প্রভু, আমার শত্রুগণের মধ্যেও কেহ কেহ আমার কষ্ট, আমার দুর্গতি দেখিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছে, ঈর্ষান্বিতদের মধ্যেও কেহ কেহ আমার দুঃখে, আমার নির্ব্বাসনে এবং আমার যন্ত্রণায় অশ্রুপাত করিয়াছে। তাহাদের এইরূপ করিবার কারণ তাহারা আমার মধ্যে স্নেহ যত্ন ভিন্ন আর কিছুর সন্ধান পায় নাই করুণা বা অনুকম্পা ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য করে নাই। তাহারা যখন আমাকে তীব্র দুঃখ-যন্ত্রণার প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে দেখিল, নিয়তির শর-সম্মুখে শরব্যের ন্যায় অসহায় দেখিল, তখন তাহাদের অন্তর করুণায় বিচলিত হইল, নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাহারা এই বলিয়া সাক্ষ্য দিল: 'স্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষী; ইঁহার অন্তরে আমরা বিশ্বস্ততা, দয়ার্দ্রতা ও প্রবল অনুকম্পা ভিন্ন আর কিছু দেখি নাই।' পাপের অগ্রদূত স্বরূপ 'অঙ্গীকার-ভঙ্গ-কারিগণ' বিদ্বেষে ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিল, আমাকে কঠোরতম অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে দেখিয়া জয়ধ্বনি করিল, আমার বিপক্ষে সকলে সমবেত হইয়া, আমার চতুর্দ্দিকে হৃদয়-বিদারক ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দোৎসব করিল।"

"হে প্রভু! তোমাকে অনুরোধ করি, মুখে এবং অন্তরে অন্তরে এই অনুরোধ করি যে তাহাদের নিষ্ঠুরতা এবং পাপের জন্য, তাহাদের শঠতা এবং দুষ্কর্ম্মের জন্য তুমি তাহাদিগের শাস্তিবিধান করিও না; কারণ তাহারা মূর্খ, ইতর ব্যক্তি, তাহারা কি করিতেছে জানে না। তাহাদের সদসৎ জ্ঞান নাই, ভাল মন্দের বিবেচনা নাই, তাহারা ন্যায়-

ন্যায়ের তারতম্য জানে না। তাহারা নিজ নিজ কামনার অনুগামী, যে তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্ত এবং মূর্খ, তাহারা তাহারি পদাঙ্ক অনুসরণ করে। হে প্রভু! তুমি তাহাদিগের প্রতি দয়াবান হও, এই দুর্দ্দিনে তাহাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা কর, আর অনুমতি দাও যেন এই যে তোমার দাস অন্ধকার গহ্বরে পতিত হইয়াছে, সকল দুঃখ-দৈন্য একমাত্র তাহারি ভাগ্যে ঘটুক। সকল আর্ত্তিভোগের জন্য একমাত্র আমাকেই নির্ব্বাচিত করিয়া লও, তোমার প্রিয়পাত্রগণের কল্যাণে আমাকে উৎসর্গ কর। হে প্রভু, হে গরিষ্ঠ! আমার আত্মা, আমার জীবন, আমার সত্তা, আমার প্রাণ, আমার সর্ব্বস্ব তাহাদিগের জন্যই অর্পিত হউক। হে বিধাতঃ, নতভাবে, অনুগত-চিত্তে, অধোমুখে মাটিতে পতিত হইয়া, আমার আহ্বানের সমস্ত একাগ্রতা লইয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, যাহারা আমাকে আঘাত করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা কর, যাহারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে কষ্ট দিয়াছে তাহাদিগকে মার্জ্জনা কর, যাহারা আমার প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াছে তাহাদিগের পাপ ধুইয়া দাও। তাহাদিগকে তোমার উৎকৃষ্ট উপহার বিতরণ কর, তাহাদিগকে আনন্দ দান কর, তাহাদিগের দুঃখমোচন কর, তাহাদিগকে সুখশান্তি প্রদান কর; তাহাদিগকে তোমার আশীর্ব্বাদ দাও, তাহাদিগের উপর তোমার দয়া বর্ষণ কর। তুমি শক্তিমান, দয়াবান, তুমি বিপন্নের সহায়, আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ।"

"যীশুখৃষ্টের শিষ্যগণ আত্মভোলা হইয়া, পার্থিব বস্তুর কথা বিস্মৃত হইয়া, সংসারের সমস্ত সম্পদ পরিত্যাগ করতঃ, অহংবোধ ও ইন্দ্রিয়াসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া, একান্ত নির্লিপ্তভাবে জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া পৃথিবীর সকলকে ঈশ্বরের পথে আহ্বান করিতেছিলেন, যে

পর্য্যন্ত না পৃথিবীকে অপর জগতে পরিণত করিলেন, ধরাবক্ষকে আলোকিত করিলেন, এবং শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সেই প্রিয়পাত্রের পথে আত্মদান করিয়াছিলেন। অবশেষে বিভিন্ন জনপদে 'শহীদের' গৌরবময় মৃত্যুকে বরণ করেন। কর্ম্মিষ্ঠ যাহারা তাহারা ইঁহাদের পদানুসরণ করুক।

"হে প্রভু, হে বিধাতঃ! তোমাকে, তোমার অবতারগণকে, তোমার দূতগণকে, তোমার সিদ্ধপুরুষগণকে, সাধু পবিত্রাত্মাগণকে আমি আহ্বান করিতেছি — দেখ তোমার প্রিয়পাত্রগণের নিকটে আমি তোমার প্রমাণসমূহ পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাপন করিয়াছি, সমস্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে তাহাদের সম্মুখীন করিয়াছি, যাহাতে তাহারা তোমার ধর্ম্ম, তোমার সরল-পথ, তোমার উজ্জ্বল বিধান রক্ষা করিতে পারে। তুমি একান্তই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানী।"

সমাপ্ত

কিশলয়, আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া
বই নং ৩১৭৫২

কতিপয় ভুল সংশোধন

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বৈশিষ্ট্য	বৈশিষ্ট	২০	৭
ভ্রাম্যমাণের	ভ্রাম্যমানের	২২	৫
খৃষ্টাব্দের	থৃষ্টাব্দের	২৪	২০
তাঁহার	ভাঁহার	২৯	১২
আস্থা	আস্তা	৩০	৬
বা	ও	৩৬	৩
ঈকান	ইকান	৪৭	২১
স্বেচ্ছাবৃত	সেচ্ছাবৃত	৪৮	১০
লেখনী	লেখনা	৫১	৪
অনুগামীদের	অনুগামাদের	৫১	৫
অবতীর্ণ	অবতার্ণ	৫১	৭
পৃথিবীতে	পৃথিবাতে	৫১	১৫
পক্ষীয়	পক্ষায়	৫১	১৬
জীবনের	জাবনের	৫১	২০
বন্দীবৎ	বন্দাবৎ	৫৩	১৩
জীবন	জাবন	৫৩	১৩
খৃষ্টাব্দের	থৃষ্টাব্দের	৫৪	১৮
বর্ষা	বর্ষা	৫৭	২৩
সৈনিকাবাস	সৈনিকবাস	৬০	৩
দৌহিত্র	পৌত্র	৬১	১১
পল্লীর	পল্লার	৬১	১২
বন্দী	বন্দা	৬৪	৭

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
য়িশূরাকাং	ইশূরকাত	৭৬	২২
পুণ্যাত্মা	পুণ্যাত্মা	৭৮	৩
বিদ্বেষের	বিদ্বেশের	৭৯	২১
সত্য	সত	৮০	১০
কারাবরোধের	করাবরোধের	৮২	১৫
য়িশাইয়া	য়িশাইয়	৮৩	১৭
তাঁহার	তাহার	৯১	১
অধ্যক্ষ	প্রভু	৯৫	২
মাত্রই	মাত্র	৯৭	১৩
চিঁঠি	চিটি	৯৭	১৮
প্রত্যেককেই	প্রত্যেককে	৯৮	৭
তাঁহার	তাহার	১০৫	১৯
যোহন	যোহেন	১৩৩	২২
কর্ত্তৃক	কত্তৃক	১৪৯	২৩
কর	কব	১৫৫	২
বিহীন	বিহান	১৫৭	৭
নিগূঢ়তা	নিগূঢতা	১৬৪	১৪
উদ্ধৃত	উদ্ধত	১৬৪	২১
মানুষ	মানব	১৭৫	২২
বহির্ভূত	বর্হিভূত	১৭৬	১৬
প্রকারের	প্রকারে	১৮১	৭
করায়	কবায়	২০৩	৫
স্বরূপ	সরূপ	২০৪	১৮
হইয়াছে	হইয়োছে	২১২	২

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
মীমাংসা	মিমাংসা	২১৩	২০
মীমাংসা	মিমাংসা	২১৪	১৭
মহাসভা	ম[illegible]াসভা	২২৩	১
মধ্য	মধ্যে	২৩৫	১৬
শাসন	শানস	২৩৬	২০
তাঁহারা	তাহারা	২৫৪	১
কারণে	কাবণে	২৬০	২
সাধনের	সাধণের	২৬৫	১১
সাধনের	সাধণের	২৭২	১৬
জুন	মে	২৯২	৮
৪ঠা	৪টা	২৯২	১৬
সকলেই	সকলে	৩১৪	৮
নির্দ্দেশ	নিদ্দেশ	৩৪৫	৬
য়িশাইয়া	য়িশাইয়	৩৪৮	১৬
কিয়দংশ	কিয়দাংশ	৩৫০	১৯
উদ্ধৃত	উদ্ধত	৩৫৬	৯
আস্থা	আস্তা	৩৬৫	৩
যিয়োন	সিয়োন	৩৬৭	৯
মালাখি	মালাথি	৩৭৪	২২
সাতিশয়	সাতিশর	৩৭৭	২১
শার্দ্দূল	শাদ্দূল	৩৮৩	১৩
উঠিতে	উঠিতে	৩৮৪	৩
হইতে	হহতে	৩৮৯	১৫

আব্দুল-মোত্তী, হাও
৬৯৫২